ভারতের সামন্ত রাজ্য

*   *   *   *

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

*   *   *   *

এ, মুখাৰ্জ্জী এণ্ড কোং : কলিকাতা

জীবনের প্রতি স্তরে যাঁর উৎসাহ ও সহানুভূতি
আমাকে অনুপ্রাণিত ক'রেছে—

পূজনীয় পিতৃদেব—

শ্রীশ্রীমন্ত চক্রবর্ত্তীর

চরণে অর্পিত।

মনু

মুখবন্ধ

বছর দুয়েক পূর্ব্বে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই সামন্ত ভারতের প্রশ্ন আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এ সম্বন্ধে তথ্যাদি জানবার জন্য সন্ধান করে দেখ্‌লাম বাংলায় সামন্ত ভারত সম্পর্কে কোন ইতিহাস নেই—অন্ততঃ আমি খুঁজে পেলাম না। এই সময়ে "স্বরাজ" পত্রিকায় আমি "আর্থিক জগৎ" পত্রিকার সম্পাদক, অগ্রজপ্রতিম শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহকর্ম্মী ছিলাম। তিনি আমাকে সামন্ত ভারত সম্পর্কে একখানা বই লিখ্‌বার জন্য উৎসাহিত করেন। বস্তুতঃ তাঁর সাহায্যের উপর ভরসা করেই আমি এ কাজে হাত দিতে উৎসাহিত হয়েছি।

আমি এই প্রচেষ্টায় কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি বল্‌তে পারি না। তবে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে সামন্ত রাজ্যের রাজনৈতিক সমস্যা উপলব্ধি করবার জন্য মোটামুটিভাবে যতটুকু জানা একান্ত আবশ্যক বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তার মালমসলা সংগ্রহ করে সন্নিবিষ্ট করবার সাধ্যায়ত্ত চেষ্টার ক্রটি করিনি। আমার এই প্রচেষ্টার সীমাও আমি জানি। অল্পপরিসরের মধ্যে সামন্ত ভারতের রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস লিখ্‌বার চেষ্টা ক'রলে তা যে এই সম্পর্কে এক বিস্তারিত ভূমিকার পর্য্যায় অতিক্রম ক'রতে পারে না—এ বিষয়ে আমার কোন ভ্রান্ত ধারণা নেই। তবে এইটুকু মাত্র বলতে পারি যে, সামন্ত ভারতের নয়া-বিবর্ত্তন সম্পর্কে প্রাত্যহিক সংবাদপত্রে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি পরখ্‌ করে নেবার মত তথ্য সংক্ষেপে হ'লেও এ'র মধ্যে আছে।

কয়েকটি বিষয়ে বইখানি অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। সামন্ত রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস আজও অসমাপ্ত। হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান এখনও হয়নি'। এই সব সমস্যা সম্পর্কে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত যত কিছু ঘটেছে, বইখানিতে তার বেশী কিছু সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয়নি'।

সামন্ত রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, সেই ঘোষণাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেই আমি প্রসঙ্গটি আলোচনা করেছি। এখন বরোদা ও কোলাপুরকে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট করবার কথা উঠ্‌ছে। রাজস্থান ইউনিয়ন যখন প্রথমে গঠন করা হয় তখন জয়পুর, যশল্মীর, বিকানীর ও যোধপুর রাজ্য এই যুক্তরাজ্যে যোগদান করেনি। বর্ত্তমানে সমস্ত রাজপুত রাজ্য নিয়ে, এমনকি মাৎস্য যুক্তরাজ্যসহ "বৃহত্তর রাজস্থান" গঠনের চেষ্টা তদ্বির চল্‌ছে। এ ছাড়া ভূপালের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিরুদ্ধেও জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে।

এই প্রচেষ্টা ফলবতী করবার জন্য ভারত সরকারের পুনর্ব্বিন্যাস নীতির কোন মৌলিক পরিবর্ত্তন করা হবে বলে মনে হয় না। অন্যান্য রাজ্য যে সর্ত্তে প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে বরোদা এবং কোলাপুরের অন্তর্নিবেশও হয়ত সেই সর্ত্তেই হবে। "বৃহত্তর রাজস্থান" গঠনের জন্য বিভিন্ন সামন্ত স্বার্থের সংঘাতকে নূতন এক ফরমূলার মারফতে হয়ত সর্ব্ব-সামন্ত-গ্রাহ্য করা হতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে এই সম্পর্কিত চুক্তি যে অন্যান্য যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তির অনুরূপ হবে তা বলাই বাহুল্য।

ভূপালকে মধ্যভারত যুক্তরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করবার জন্য যে আন্দোলন দেখা দিচ্ছে ঐ আন্দোলন খুব সহজে সার্থক হবে বলে ভরসা করতে পারি না। এই আন্দোলনের সফলতার পথে প্রধান

বাধা ভারত সরকারের নীতি। শাসক ও শাসিতের স্বয়ংপ্রণোদিত যুক্তসম্মতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভারত সরকার স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেছেন তার জন্যই এই শঙ্কা হচ্ছে। সুচতুর নবাব সাহেব এই নীতির দোহাই দিয়ে মধ্যভারতে যোগদানে আপত্তি জানালে ভূপালের এই আন্দোলন অসুবিধার সম্মুখীন হবে এবং সে অবস্থায় আপোষপন্থী ভারত সরকার ভূপাল সম্পর্কে হয়ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জে অনুসৃত নীতি প্রয়োগ করতে পারেন; অর্থাৎ কেন্দ্রায়ত্ত অঞ্চল হিসাবে আপাততঃ হয়ত ভূপালের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা হতে পারে।

যা' হোক্, এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা'তে ভবিষ্যতের নূতনতর ঘটনার তাৎপর্য্য বুঝতে বিশেষ অসুবিধা ঘটবে না বলেই আমার বিশ্বাস। দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে যে ব্যবস্থাই অতঃপর গৃহীত হউক, তা'তে নেহরু সরকারের পূর্ব্বানুসৃত আপোষধর্ম্মী নীতির মৌলিক ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা কম।

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখার্জ্জি এই বই প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁর কাছেও আমি বিশেষ ঋণী। তাঁর সাহায্য ব্যতীত এই বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

৩১শে জানুয়ারী
১৯৪৯

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা

একাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট ঃ

ঐতিহাসিক ভূমিকা

বিগত এক বৎসরের সংহতিসাধন ও গণতন্ত্রীকরণের যুগ্ম পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনার সাফল্যে দেশীয় রাজ্যের সাম্রাজ্যবাদ-লালিত দুই শতাব্দীব্যাপী কাঠামোর এক চমকপ্রদ রূপান্তর ঘটিয়াছে। উনিশশ' সাত চল্লিশ সালের আগষ্ট মাসের পূর্ব্বে দেশীয় রাজ্য বলিতে যাহা বুঝাইত এক বৎসরের "নিঃশব্দ বিপ্লবে" আজ তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা এবং সর্ব্ব ভারতের সহিত তাহাদের সংযোগ ও সম্পর্ক উভয়তঃ এই রূপান্তরের প্রভাব প্রতিফলিত।

বৃটিশ আমলে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতীয় উপদ্বীপের মেরুদণ্ড বরাবর ৫৬২টি ছোট বড় দেশীয় রাজ্য ছিল। ইহাদের মোট আয়তন ছিল ৫৯৮,১৩৮ বর্গ মাইল (বাটলার কমিটির রিপোর্ট) ; আর জনসংখ্যা ছিল ৯,১১,৮৯,২৩৩ (১৯৪১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্ট)। ইহার মধ্যে হায়দরাবাদের মত বিস্তৃত জনবহুল ও সম্পদশালী রাজ্যও যেমন আছে, তেমনি ছিল বিলবাড়ীর মত অতি নগণ্য নামসর্ব্বস্ব রাজ্য—যাহার জনসংখ্যা মাত্র ৮২ এবং বাৎসরিক আয় মাত্র আশী টাকা। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে দেশীয় রাজ্যের যে আয় ছিল, তাহার হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ১৭১টি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব একুনে ছিল মাত্র সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা অর্থাৎ গড়পড়তা প্রতি রাজ্যের বাৎসরিক আয় ৩৮১৩ টাকা মাত্র। এই রাজস্ব দ্বারাই শাসন ব্যবস্থা, রাজপরিবারের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিতে হইত। অপর এক হিসাবে দেখা যায় যে, ৪১৫টি রাজ্যের একুন বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ১২৬ লক্ষ টাকা

এবং ৫১৭টি রাজ্যের সম্মিলিত বাৎসরিক রাজস্ব মাত্র ৬ কোটি টাকা।[১] এই সাড়ে পাঁচ শতাধিক রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী মাত্র আটটি রাজ্যের অধিবাসী—প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক মাত্র পনরটি রাজ্যে বসবাস করিত।

আয়তনের দিক হইতেও এই রাজ্যসমূহ ছিল অদ্ভুত। কাথিয়াবাড়ের ২৮৩টি রাজ্যের মোট আয়তন মাত্র ৩২ হাজার বর্গ মাইল; অর্থাৎ কাথিয়াবাড়ের দশটি বৃহদাকার রাজ্য ব্যতীত প্রতি ২৫ বর্গমাইল এলাকায় এক একটি রাজ্য ছিল এবং উহার গড়পড়তা জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০ (১৯৩১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)। ভারতের ২০২টি রাজ্যের গড়পড়তা আয়তন ছিল দশ বর্গমাইলের কম। ১৩৯টি রাজ্যের গড়পড়তা আয়তন দশ বর্গমাইলও নহে; আর ৭০টি রাজ্যের আয়তন এক বর্গমাইল হইবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রাদেশিক ভারতের এক একটি জিলার গড়পড়তা আয়তন ছিল চারি হাজার বর্গমাইল।[২]

দেশীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশ শাসনের সৃষ্টি—এই মতবাদ ইতিহাস সমর্থিত নহে। বৃটিশ শাসন কায়েম হইবার পূর্ব্বেও অনেক রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং তৎকালীন ইতিহাসে ইহাদের মধ্যে কতগুলি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। প্রাক্ মুঘল ও মুঘল যুগের ইতিহাস রাজপুতানার রাজন্যসমাজের কীর্ত্তিকলাপে সমৃদ্ধ। স্যার বেঞ্জামিন লিগুসের ভাষায় অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই "প্রাক্তন রাজ্যের শেষ চিহ্ন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলে পরবর্ত্তীযুগে যে প্রভুত্বের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং

(১) দেশীয় রাজ্যের প্রজামণ্ডলের গবেষণা বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—হোয়াট্ আর দি ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স—৭-৮ পৃঃ।

(২) ঐ—৮ পৃঃ।

যাহার ফলে গোটা ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সংগ্রামের যুগে ইহারা কোন প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখে।"

ভারতের ইতিহাসে একাদশ শতাব্দীর পর হইতে রাজ্য ও সাম্রাজ্যের যে নিরবচ্ছিন্ন ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে সেই শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কতগুলি রাজ্য কোনক্রমে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জল দিনে বা তাহার পূর্ব্বেও কতগুলি রাজ্য নামেমাত্র দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিত। কতগুলি রাজপুত শক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রথমে মুঘল পরে মারাঠা শক্তির সহিত অমিতবিক্রমে লড়াই করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহারা যদি বৃটিশ শক্তির আশ্রয় লাভ না করিত তবে এই রাজবংশ শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহাদের অবশিষ্ট রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিতে পারিত না। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মুখে ভাগ্যান্বেষী কিছু সেনানী ও সুবাদারও কয়েকটি রাজ্য গঠন করে এবং কোম্পানীর আশ্রয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখে। ডেভিডসন কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "বৃটিশ শক্তির উত্থানে ভারতের বহু প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে। এমন সব বহু রাজ্য ছিল বৃটিশ শক্তির সমর্থন ব্যতীত যাহাদের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব হইত না। আবার একথাও সত্য যে, বৃটিশ শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বহু রাজ্য ভারতের মানচিত্র হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বা দুর্নীতি কিম্বা নিজেদের শক্তিহীনতার জন্য লোপ পাইয়াছে। স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে এবং কোম্পানী কর্ত্তৃপক্ষের স্বত্বভ্রংশ নীতির ফলেও (**Doctrine of Lapse**) কাহারও কাহারও অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।[১]

কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপেও এইরূপ ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। মধ্য ইয়োরোপের তৎকালীন স্বাধীন নগর, ডাচী,

---

(১) ডেভিডসন কমিটির রিপোর্ট—৮ পৃঃ।

কিশপরিক্, ব্যারনি প্রভৃতি ক্ষুদে রাজ্যসমূহ পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রথিত ছিল। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার রূপান্তরের ফলে সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক এই ক্ষুদে রাজ্যগুলি সমষ্টিগত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপন্থী হইয়া পড়ে। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির পর ইয়োরোপে যখন 'জাতীয় রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই ক্ষুদে সামন্ত সমাজের অস্তিত্বও লোপ পায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের সামন্ত রাজব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে নাই। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকরূপে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। কোন দেশে সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখিতে হইলে সেই দেশের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এবং তাহারই করুণাপ্রার্থী শ্রেণীস্বার্থ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই কারণেই দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করে নাই—নির্ব্বিষ ও নির্ভরশীল করিয়া সাম্রাজ্যনীতির বাহকহিসাবে সামন্ত সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

ভারতের মানচিত্রে দেশীয় রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান লক্ষ্য করিলেই সাম্রাজ্যিক বন্ধনের তাৎপর্য্য খানিকটা উপলব্ধি করা যায়। প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যই ভূখণ্ড পরিবেষ্টিত। ক্ষমতা অর্জ্জনের কালে বৃটিশ শক্তি ভারতীয় উপদ্বীপের প্রায় সমগ্র উপকূল ভাগ দখল করিয়া সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে আনিয়াছে। অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতীয় উপদ্বীপের "অনুর্ব্বর এবং অপেক্ষাকৃত দুর্গম" অংশ। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি প্রথমে বাণিজ্য বিস্তারের দিকেই বেশী ছিল। সুতরাং প্রথমেই তাহারা "সমুদ্রোপকূল এবং পোত চলাচলের উপযোগী নদীর মোহানা বিধৌত অঞ্চল" করায়ত্ত করে। এই সমস্ত অঞ্চল যেমন কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ তেমনি ঘনবসতিপূর্ণ, অধিবাসীরাও অপেক্ষাকৃত নিরীহ

প্রকৃতির। ইহাদের নিকট ইয়োরোপের পণ্যসম্ভার বিক্রয় করা যেমন ছিল সুবিধাজনক, তেমনি লাভজনকও বটে। তাই প্রথমাবস্থায় “ভারতের দরিদ্র অংশ, দুর্দ্দম পাহাড়িয়া অধ্যুষিত অঞ্চল কোম্পানীর শ্যেনদৃষ্টি হইতে ত্রাণ পাইল। এখানকার দুর্দ্দম পাহাড়িয়াদের কোম্পানী ঘাঁটাঘাটি করিল না।” স্যার সিডনী লো’র ভাষায়—“দেশীয় রাজন্যবর্গের হস্তে ইহাদের শাসনভার অর্পিত রাখিয়া ইংরাজ বণিক নিশ্চিন্ত ছিল।” অতঃপর ক্রমান্বয়ে ইহাদের সাম্রাজ্যিক রথচক্রে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুরের সাবেক দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে (৭-২-৪০) বলিয়াছেন,—“কতগুলি দেশীয় রাজ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুরসহ অধিকাংশ রাজপুত রাজ্য কোন কালেই বিজিত হয় নাই। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহারা কোম্পানীর সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির অপ্রতিরোধ্য সর্ব্বাত্মিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ইহাদের ‘বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার’ চুক্তি উত্তরকালে অধীনতা বা অধীন সহযোগিতায় (**Sub-ordinate Co-operation**) রূপান্তরিত হয়।

বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তী সামন্তসমাজকে পরস্পর-বিশ্লিষ্ট, নির্ব্বিষ এবং সাম্রাজ্যবাদের মুখাপেক্ষী হিসাবে গোটা বৃটিশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীয়াইয়া রাখিয়াছে সাম্রাজ্যিকস্বার্থে—জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের মিত্রতাচরণের জন্য। সাম্রাজ্যিক ভেদবাদের ক্রীড়নকরূপে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথমাবধি রাজ-চক্রবর্ত্তী ইহাদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছে। সামন্ত সমাজও একান্ত বশম্বদের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর অনুজ্ঞা পালন করিয়াছে। তাহাদের এই জাতীয় স্বার্থবিরোধী প্রজাপীড়ক স্বেচ্ছাচারী

ভূমিকা বৃটিশ শাসনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এবং এই রাজসেবার পুরস্কারেই হয়ত বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় রাজ্যের শাসক-সম্প্রদায়কে স্বাধীন হইবার অধিকার দিয়া যান। এই রোয়েদাদ ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি সাম্রাজ্যবাদের বিদায়কালীন পদাঘাত।

ভারতীয় গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের এই আঘাত এবং তাহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অনতিবিলম্বেই কাটাইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদলালিত কৃত্রিম রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ভারতীয় জনগণের মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্য বিনষ্ট করিতে পারে নাই। একমাত্র হায়দরাবাদের প্রশ্ন বাদ দিলে দেশীয় রাজ্যসহ গোটা ভারত আজ এমন এক রাজনৈতিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে যাহা ইতিপূর্ব্বে কোন কালেই তাহার ছিল না। এই পরিবর্ত্তনের ফলে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যাও বিস্ময়কর ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। বৃটিশ যুগের ৫৬২টি রাজ্যের মধ্যে ২১৯টি রাজ্যের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইয়াছে, ৩১২টি রাজ্য মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়াছে। বাকী ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের সংহতি সাধনও অদূরবর্ত্তী। এই পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গ হইলে পূর্ত্ত সচিব শ্রীযুক্ত গ্যাডগিলের ভাষায়—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বেকার দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা প্রায় ত্রিশটির মত হইবে। এই সংখ্যা আরও হ্রাস পাইবে; কেন না ভারত সরকারের মানদণ্ড অনুসারে তখনও এমন কয়েকটি রাজ্য থাকিবে যাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা অর্থহীন। (দেশীয় রাজ্যসচিবের পক্ষে ডোমিনিয়ন পার্লিয়ামেণ্টে প্রদত্ত বক্তৃতা—১৫-৩-৪৮)

দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা হ্রাস পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলেও উহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। এই নয়া ব্যবস্থাপনা দেশীয় রাজ্যের যুগযুগাতিক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান ঘটাইয়াছে। রূপান্তরিত দেশীয় রাজ্যের শাসন পরিচালনার ভার

যাহাতে জনগণের প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পিত হয় সর্ব্বত্রই তাহার বুনিয়াদ রচনা করা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ত ব্যবস্থার যুগ্ম ও যুগপৎ শোষণক্লিষ্ট রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকে নিতান্ত পশ্চাৎপদ দেশীয় রাজ্যের জনগণ এতদিনে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের এবং সমষ্টিগত সমুন্নতি সাধনের অধিকার লাভ করিল মাত্র। যুগ যুগ সঞ্চিত পুঞ্জীভূত সামন্ততান্ত্রিক ক্লেদপঙ্ক অপসারিত করিয়া সমষ্টি জীবন পরিচ্ছন্ন, সুস্থ এবং সবল করিবার পথ এখনও বহু বিঘ্নকণ্টকিত। তাছাড়া দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণ এই রূপান্তরকে কোন দিনই চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই। তাহারা চাহিয়াছে—দেশীয় রাজ্যরূপী কৃত্রিম রাজনৈতিক ভেদ রেখা অবলুপ্ত করিয়া সম ভাষাভাষী এবং একই সংস্কৃতিবান ভারতবাসীর সহিত একাত্ম হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অন্যান্যের সহিত মিলিত হইতে। সেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছিতে এখনও বাকী আছে। কিন্তু উহাই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত গণতান্ত্রিক লক্ষ্য।

দেশীয় রাজ্য আজ নব-পরিবর্ত্তনের চৌমাথায় দণ্ডায়মান। তাহাদের অগ্রগতির পথ যেমন সমষ্টিগত সমুন্নতির সম্ভাবনায় প্রোজ্জ্বল, তেমনি নূতন বন্ধনের শঙ্কায় কণ্টকিত। দুই শতাধিক বৎসরের ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাতে দেশীয় রাজ্যসমূহ বর্ত্তমান পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছে। অতীতের এই ইতিহাস একদিকে যেমন শাঠ্য, কূটচক্র, শোষণ ও পীড়নের কাহিনীতে পঙ্কিল, অপর পক্ষে তেমনি ত্যাগ, লাঞ্ছনা ও দৃঢ়পণ সংগ্রামের ঐতিহ্যে মহীয়ান। আজিকার দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল ঘটনাবলীকে অতীতের এই ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না।

প্রথম অধ্যায়

কোম্পানীর প্রভুত্ব

ভারতের মাটিতে সাম্রাজ্যিক প্রভুত্ব বিস্তারের কল্পনা প্রথমে ইংরাজ বণিকের মাথায় আসে নাই। ফরাসীরাই এ বিষয়ে তাহাদের অগ্রণী। "যে মোহ ইয়োরোপীয়দের দেশীয় শক্তির অধীন করিয়া রাখিয়াছিল ফরাসীরাই সর্ব্বপ্রথম তাহা ছিন্ন করে।" উচ্চাভিলাষী ডুপ্লে ভারত জয়ের যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার স্বদেশবাসী তাহা সমর্থন করিলে ভারতের উত্তরকালের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লিখিত হইত।

ফরাসীরা এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিলেও, চতুর ইংরাজ বণিক প্রতিনিধিগণ বাণিজ্যিক স্বার্থের অজুহাতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পূরাপূরিভাবে গ্রহণ করেন। লর্ড ক্যাসেলরীগ ১৮০৪ সালে বলিয়াছেন,—"ভারতে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বণিকের পরিবর্ত্তে রাজ্যেশ্বর হইবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। আমরা যদি গড়িমসি করিতাম কিম্বা পশ্চাদপদ হইতাম তবে ফরাসীরা আমাদের ঠেলিয়া ফেলিয়া বহু পূর্ব্বেই এ বিষয়ে অগ্রণী হইত।"[১] ইংরাজ বণিকের রাজ্যেশ্বর হইবার অর্থ সে দেশীয় রাজ্যশক্তির পরাধীনতা স্যার জর্জ্জ বার্লোর উক্তিই তাহার সাক্ষী। "আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটানই ফরাসীদের একমাত্র লক্ষ্য। অচিরেই তাঁহারা এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিবে। এই চাল যদি ব্যর্থ করিতে হয় তবে ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে

(১) শাস্ত্রী—ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স—১৫ পৃঃ

বৃটিশ রক্ষণাধীনে আনিতে হইবে। এমন একটি রাজ্যের অস্তিত্বও রাখা চলিবে না, যাহা বৃটিশ শক্তির আশ্রিত বা তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়; অথবা যে রাজ্যের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ বৃটিশ শক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন নহে।"

ভারতে ইংরাজ শক্তির অভ্যুত্থান সবলের বিজয় অভিযান নহে। যুগধর্ম্মের সহিত সমান তালে চলিবার মত কূটনীতিজ্ঞান তাহাদের জানা ছিল বলিয়াই তাহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে। স্যার জর্জ্জ ম্যালকম বলিয়াছেন—"সৈন্যবাহিনী লইয়া ভারতের উপকূলে নোঙ্গর করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু নম্র ও শিষ্টাচারী বণিকের পক্ষে কোন সাহায্য বা সহানুভূতিরই অভাব ঘটে নাই।"

কিঞ্চিদধিক একশত বৎসরে ভারতের মাটিতে কোম্পানীর অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৪৪ সালে কর্ণাটকের উপকূলে যে শক্তির দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়, ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব বিজয়ে তাহার অবসান ঘটে। পলাশী প্রান্তরে ক্লাইভ যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে লর্ড ওয়েলেসলী ও লর্ড হেষ্টিংস সাম্রাজ্যিক মানচিত্রের যে ছক অঙ্কন করেন, ১৮৫৬ সালের মধ্যে লর্ড ডালহৌসীর হস্তে কার্য্যতঃ তাহা পূর্ণতা লাভ করে। বণিকের এই রূপান্তরকে স্যার উইলিয়ম হাউইট অপূর্ব্ব ভাষার ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিয়াছেন,—"অধিকার ও বাস্তব প্রয়োজনের পবিত্র যুক্তি দেখাইয়া রাজন্যবর্গকে রাজ্যচ্যুত করিবার যে কর্ম্মনীতি মন্থরগতিতে একশত বৎসরের বেশী অনুসৃত হইয়াছে, তাহা নিছক উৎপীড়ন বই কিছুই নহে। রাজশক্তি বা পৌরোহিত্য-শক্তি ইতিপূর্ব্বে যতপ্রকার জুলুম ও উৎপীড়নের ছল আবিষ্কার করিয়াছে এই পদ্ধতি তাহার সব কয়টির চাইতে অভিনব। দুনিয়ার ইতিহাসে কুত্রাপি ইহার তুলনা নাই।" ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় অজ্ঞাতনামা জনৈক ইংরাজ লেখক অকপটে

স্বীকার করিয়াছেন—'ভারতের সহিত আমাদের প্রাথমিক সম্বন্ধের মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যাহার কথা শুনিলে নীতি-বাগীশেরা শিহরিয়া উঠিবেন,—নিষ্ঠাবান খৃষ্টানগণ লজ্জায় ও ঘৃণায় প্রবল প্রতিবাদ জানাইবেন'।[১]

অধ্যাপক রত্নস্বামী বলিয়াছেন, ভারতের তৎকালীন "আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি" এমন অবস্থায় ছিল যে, ইংরাজ বণিকের পক্ষে "হস্তক্ষেপ না করার নীতি" অনুসরণ করা সম্ভবপর ছিল না।[২] ইহা বিতর্কমূলক অভিমত। তবে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুঘলের সহিত সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত রাজপুত শক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীতে হীনবল—নবীন মারাঠা শক্তির আঘাতে প্রকম্পিত। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর (১৭০৭) সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীশ্বরের বন্ধনমুক্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই কার্য্যতঃ স্বাধীন হইয়া পড়িল। নিজাম-উল-মুলক্ হায়দরাবাদে রাজধানী স্থাপন করিয়া এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর্কটের নবাব কর্ণাটকের অধীশ্বর। ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোরে হিন্দু রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত। মহীশুরের হিন্দু শক্তি ক্রমেই অধিকতর প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতেছে। বিজয়নগর রাজ্যের সামন্তগণ প্রতিটি জনপদ ও শৈলদুর্গে আধা স্বাধীন নরপতি হিসাবে অধিষ্ঠিত। সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যভারতে নবীন মহারাষ্ট্র শক্তির অপ্রতিদ্বন্দ্বী কর্ত্তৃত্ব। পেশবা, গায়কোবাড়, সিন্ধিয়া, হোলকার ও ভোঁসলা প্রত্যেকেই বিস্তীর্ণ রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি। দিল্লীশ্বর সিন্ধিয়ার করতলগত। এই মারাঠা প্রভুত্বের অধীনে ছিল অসংখ্য ক্ষুদে সামন্ত। উত্তর ও পূর্ব্ব ভারত আধা-স্বাধীন অযোধ্যা ও মুর্শিদাবাদের নবাবের শাসনাধীন।

(১) কস্তুরী—হিষ্টরী অফ বৃটিশ অকুপেশন ইন ইণ্ডিয়া—১০ পৃঃ।
(২) রত্নস্বামী—বৃটিশ এডমিনিষ্ট্রেটিভ্ সিস্টেম ইন ইণ্ডিয়া—৫৯৪ পৃঃ।

পঞ্জাবে শিখ শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালী কর্তৃত্ব। দাক্ষিণাত্যে ও মারাঠা সাম্রাজ্যে ফরাসী সেনানীদের বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তি। এছাড়া সারা আর্য্যাবর্ত্তের বুকে ছড়ান রহিয়াছে হীনবীর্য্য অসংখ্য সামন্ত রাজশক্তি।

ভারতের এই রাজনৈতিক পটভূমিকাতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং বিদেশী কোম্পানীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় পরিণতি লাভ করে। দেশীয় রাজন্য মহলের পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, কলহ-কোন্দল, সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এবং তাহার সঙ্গে বিদেশী শাঠ্যের ফলে বণিকশক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ কোনকালেই সম্ভব হয় নাই। দুই একজন ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কোন উল্লেখযোগ্য ভারতীয় রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না যিনি এই স্বার্থান্ধ মূঢ়তার পরিণতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নানা ফর্ণাবিশের সতর্কবাণী রাজন্যসমাজের বধির কর্ণে প্রবেশ করে নাই। টিপুর আবেদন স্বার্থান্ধ নিজামের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই। জাতির ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে ম্লান হাসি হাসিয়াছেন।

রাজচক্রবর্ত্তিত্বের প্রতিষ্ঠা

বৃটিশ শক্তির কোন যুগান্তকারী ঘোষণার ফলে দেশীয় রাজ্যসমূহ তাহাদের স্বাধীনতা হারায় নাই। কোম্পানীর ক্রমিক নীতি পরিবর্ত্তনের দরুণ ভারতের রাজনীতিতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলেই বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—ভারতের স্বাধীন নরপতিগণ "অধীন সহযোগীর" পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছেন।[১]

ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজ বণিককে বিদেশীর মধ্যে ফরাসী এবং দেশীয় শক্তির মধ্যে মুসলিম, মারাঠা, জাঠ, গুর্খা ও শিখ

(১) শাস্ত্রী—ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স—১৯ পৃঃ (ওয়েষ্টলেকের—কলেক্টেড্ পেপার্স ২০৫ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত)

রাজশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে হায়দার-টিপুর মহীশুরই ছিল ইংরাজের প্রধান প্রতিপক্ষ। ১৭৭৬ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯৯ সালের মধ্যে এই পরাক্রান্ত দেশীয় শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া ওয়েলিংটনের ডিউক বলেন, মহীশুর বিজয়ের পরই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে রাজচক্রবর্ত্তী হন। কিন্তু স্যার চার্লস্ এটকিসনের মতে ১৮০৩ সালে মারাঠা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ১৮০৫ সালে হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলেই চূড়ান্তভাবে বৃটিশ শক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ভারতের অধিকাংশ স্থানের উপর বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম হইল। ১৮১৮ সালে পাঞ্জাব-কেশরীর শিখ রাজ্য ছাড়া এমন একটি রাজ্যও ছিল না যে স্বাধীন বলিয়া দাবী করিতে পারিত। নিজাম ১৮৪২-৪৩ সাল পর্য্যন্ত 'মিত্র' বলিয়া অভিহিত হইলেও নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিলেন। লর্ড এলেনবরোর সময় নিজামের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন মিত্রত্বের শেষ লৌকিক চিহ্নটুকুও অবলুপ্ত হয়। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে (১৮৪৮-৪৯) পাঞ্জাবকেশরীর রাজ্য অবলুপ্ত হইলে ভারতীয় রাজন্য শাসিত সমস্ত অঞ্চলে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) দমনের পর বৃটিশ রাজশক্তি লর্ড ক্যানিংয়ের ভাষায় "সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক এবং রাজচক্রবর্ত্তী" হিসাবে সরাসরি শাসন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের "রিংফেন্স পলিসি" (**Ringfence Policy**), ওয়েলেসলীর বশ্যতামূলক মৈত্রী, লর্ড হেষ্টিংসের আমলের অধীন সহযোগিতার নীতি, ডালহৌসীর স্বত্বভ্রংশনীতি, লর্ড কার্জ্জনের পৃষ্ঠপোষকতা, এবং "অনাহুতভাবে তত্ত্বাবধানের" নীতি এবং ১৯০৫ সালের পর অনুসৃত আন্তরিক সহযোগিতার নীতি দেশীয় রাজ্য

সম্পর্কে বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর বিভিন্ন সময়ে অনুসৃত নীতির বিশিষ্ট পর্য্যায়।

বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী (১৭৬৫) লাভ করিয়া ক্লাইভ বাঙ্গলায় এক অভিনব দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। কোম্পানী রাজস্ব আদায় করিত, নবাবকে কর দিত, দিল্লীশ্বরকে নজরানা দিত কিন্তু দেশরক্ষা বা শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তাহার ছিল না। সে দায়িত্ব নবাবের। ক্লাইভ বলিয়াছেন—"পদমর্য্যাদাসঙ্গত ভাতাসহ এখনও একজন নবাব রাখা প্রয়োজন। দেশের শাসনভার এখনও দেশীয় রাজারাজরার উপর রাখিতে হইবে। প্রেসীডেন্সীর অধীনে তাঁহার উপর শান্তিরক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিবে। তবে রাজস্বটা করায়ত্ত থাকিবে কোম্পানীর"।[১] ক্লাইভের এই নীতির অর্থ সুস্পষ্ট। সরাসরি দেশের অসামরিক শাসনভার গ্রহণ করিতে তিনি সাহস করেন নাই। দেশীয় শিখণ্ডীর মারফতে তিনি আসল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছেন। হেষ্টিংসের আমলে এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়। বাঙ্গলার পরবর্ত্তী ইতিহাস ইংরাজ গবর্ণরদের নামের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বাঙ্গালা ও অযোধ্যায় কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বের বুনিয়াদ পোক্ত করার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে নীতি অনুসরণ করেন তাহা তাঁহার পররাষ্ট্র নীতির দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবিত। চারি বৎসরের মধ্যেই মারাঠা শক্তি পাণিপথের (১৭৬১) আঘাত বিস্ময়করভাবে সামলাইয়া উঠে। মারাঠাদের বিপর্য্যয় সাময়িকভাবে ইংরাজ বণিককে খানিকটা নিরুপদ্রব করিয়াছিল। কিন্তু গোটা ভারতের প্রভুত্বের জন্য মারাঠাদের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য্য। এইজন্য হেষ্টিংস পূর্ব্ব-ভারতে বণিক প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ করেন এবং দক্ষিণ ভারতে কূটনীতির

(১) কস্তুরী—হিষ্টরী অব বৃটিশ অকুপেশন ইন ইণ্ডিয়া—৪৬ পৃঃ।

জাল বিস্তার করেন। দেশীয় রাজশক্তির আড়ালে থাকিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেই নীতি পরিহার করেন। মিত্রভাবাপন্ন দেশীয় রাজ্যের বেড়া তুলিয়া ইংরাজের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য নিরুদ্বেগ করাই ছিল তাহার পররাষ্ট্রনীতি।

হেষ্টিংস-কর্ণওয়ালিসের আমলে নিজামের সহিত ইংরাজের মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়—শ্রীরঙ্গপত্তনমের সন্ধিতে টিপু অর্দ্ধেক রাজ্য হারান। পেশবাকে কেন্দ্র করিয়া মারাঠা শক্তির আত্মকলহও তখন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মারাঠা শক্তির এই আত্মঘাতী কলহের সময়েই ওয়েলেসলী ভারতে পদার্পণ করেন।

ভারতে তিনি কি নীতি অনুসরণ করিতে চাহেন বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে তিনি তাহার খানিকটা আভাষ দিয়াছেন। "আমি রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিব, জয়মাল্যের পর জয়মাল্য পরিব, রাজস্বের পর রাজস্ব আদায় করিয়া পুঞ্জীভূত করিব। যতদিন আমার প্রভুদের উচ্চাশা ও লোভ ক্ষান্ত হও বলিয়া সকরুণ আর্ত্তনাদ করিয়া না উঠিবে, ততদিন অব্যাহতভাবে গৌরব, ধনসম্পদ ও ক্ষমতা অর্জ্জনের অভিযান চালাইয়া যাইব।[১]

কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে আক্রমণাত্মক নীতি পরিহার করুক, ইহাই ছিল তৎকালীন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে চোখঠার দিয়া ভারতীয় রাজশক্তির স্বাধীনতা হরণের জন্য ওয়েলেসলী "বশ্যতামূলক মৈত্রী" নামে এক অভিনব "কূটনীতিক ফাঁস" আবিষ্কার করেন। বাহ্যতঃ কোন দেশ জয় করা হইত না। দেশীয় রাজাকেও সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখা হইত। রাজার রাজকীয় জাঁকজমকেরও কোন অপহ্নব হইত না। কেবল "আসল ক্ষমতা" ভারতীয় রাজার হাত হইতে পলিটিক্যাল এজেণ্টের হাতে চলিয়া

---

(১) কস্তুরী—বৃটিশ অকুপেশন ইন ইণ্ডিয়া—৮৪ পৃঃ।

যাইত। সুতরাং বৃটিশ জনমতের বিবেকের দংশন অনুভব করিবার কোন কারণই ছিল না। অথচ হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট মিঃ রাসেল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—যে রাজ্য এই বশ্যতামূলক মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য।

মিঃ রাসেলের এই উক্তিতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে আসিবে ইংরাজ রেসিডেণ্ট। সঙ্গে আসিত ইংরাজ সেনা। সৈনিক ইংরাজের কিন্তু খরচপত্র বহনের দায় মিত্র রাজ্যের। এই সৈন্যদল পুষিবার জন্য হয় রাজ্যের সম্পদশালী অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে, না হয় সৈন্য পুষিবার যাবতীয় খরচের জন্য মোটা টাকা দিবার অঙ্গীকার করিতে হইবে। সৈন্য মোতায়ন করিয়াও ইংরাজ নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। আশ্রয়দান ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বণিক শক্তি প্রতিবেশীর সহিত আশ্রিতের সমস্ত সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার কাড়িয়া নিত। রাজসরকারে ইংরাজ ছাড়া অপর কোন বিদেশীর নিয়োগ নিষিদ্ধ করিত।

একমাত্র হীনবল নৃপতিদের পক্ষেই এই ভাবে "মৃত্যুর পরোয়ানা" সহি করা সম্ভব। হইয়াছেও তাহাই। ওয়েলেসলী প্রথমে নিজামের পরই এই নীতি পরখ করেন। টিপু ও মারাঠাদের ভয়ে তটস্থ নিজাম ১৭৯৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর স্বহস্তে নিজের স্বাধীনতাকে জবেহ করিয়া বশ্যতার ফাঁস পরেন। এই প্রসঙ্গে মিস্ গ্রাহাম বাজীরাও পেশবাকে লিখিয়াছিলেন,—যাহারা নিজামকে বন্দী করিয়া রাখিবে, তিনি তাহাদেরই মাহিনা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

নিজামের সহিত এই চুক্তি এবং ১৭৯৯ সালে টিপুর পরাজয় দক্ষিণভারতে বণিক প্রভুত্ব নিরঙ্কুশ করিল। মহীশুরে হিন্দুরাজ বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া ওয়েলেসলী তাহাকেও বশ্যতামূলক মৈত্রীর ফাঁস

পরাইয়া দিলেন। অতঃপর তাহার দৃষ্টি পড়িল পেশবা, সিন্ধিয়া এবং হোলকার এই মারাঠা শক্তি ত্রয়ের উপর।

লর্ড মর্ণিংটন যখন ভারতে পদার্পণ করেন দৌলত রাও সিন্ধিয়ার সমর্থনে বাজীরাও তখন পেশবা পদে অধিষ্ঠিত। নানা বন্দী। ইংরাজ বড়লাট পেশবা-সিন্ধিয়া বিচ্ছেদের জন্য কূটকৌশল অবলম্বন করিলেন। ইংরাজ রেসিডেণ্টের চাতুর্য্যে পেশবা ক্রমেই দৌলতরাও সম্পর্কে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পড়িতে ছিলেন। নানাকে কারামুক্ত করিয়া ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করায় সাময়িক ভাবে এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই নানার মৃত্যু হয় এবং পেশবা-সিন্ধিয়া-হোলকার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়। অতঃপর যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলতরাও সিন্ধিয়ার মধ্যে যুদ্ধ; এবং পেশবা-হোলকার যুদ্ধের ফলে পলায়িত বাজীরাও ১৮০২ সালে বশ্যতা মূলক মৈত্রীর ফাঁস পরিয়া পেশবার গদী বজায় রাখেন। ১৮০৩ সালে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সহিত ইংরেজের যুদ্ধারম্ভ হয় এবং কঠোর সংগ্রামের পর ১৮০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার প্রতিনিধিগণ সন্ধিপত্রে সহি করেন। ওয়েলেসলী তাহাদের গলাতেও বশ্যতামূলক মৈত্রীর ফাঁস পরাইয়া দিলেন। কোম্পানী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার রাজ্যের সমস্ত উর্ব্বর অংশ গ্রাস করিল। উড়িষ্যার কিছু অংশের দেওয়ানী কোম্পানী আগেই পাইয়াছিল, এবারে ভোঁসলার নিকট হইতে বাকীটুকু গ্রাস করা হইল। গুজরাটস্থ সিন্ধিয়ার রাজ্যও কোম্পানীর করায়ত্ত হইল। সিন্ধিয়া রক্ষিত শাহ আলম বৃটিশ রক্ষণাধীনে আসিলেন। যমুনা নদীর উত্তরে সিন্ধিয়ার কর্ত্তৃত্ব লোপ পাইল। ইংরাজ সেবার জন্য নিজাম এবারেও পুরস্কৃত হইলেন। ভোঁসলার বেরার তাহাকে দান করা হইল, যদিও প্রদেশটির ধন দৌলত বেশীদিন তাহার ভোগে আসে নাই।

সিন্ধিয়া ভোঁসলা বনাম ইংরাজের যুদ্ধে যশোবন্ত রাও নিরপেক্ষ ছিলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি চৌথ আদায়ের অনুমতি চাহিলেন, স্বত্ব রাজ্য দাবী করিলেন এবং সর্ব্বোপরি তাহার রাজ্যের সীমানা সম্পর্কে ইংরাজের নিকট যথাবিহিত গ্যারান্টি দাবী করিলেন। বিপদ কাটিয়া যাওয়ায় ওয়েলেসলী টালবাহনা আরম্ভ করিলেন। তাহার মতে—"ভারতে পূরাপূরি ভাবে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইলে যশোবন্ত রাও হোলকারের ন্যায় উচ্চাভিলাষী ও দুঃসাহসী সমর-নায়কের ক্ষমতা খর্ব্ব করা নিতান্ত প্রয়োজন।" সুতরাং অনতিবিলম্বেই যশোবন্ত রাওয়ের চক্রান্তের খবর প্রকাশিত হইল। এক "গোপন পত্রে" হোলকার নাকি "অত্যাচারী বিদেশী কাফের-দের" নিধন করার জন্য হিন্দু ও মুসলমানদের আহ্বান জানাইয়া-ছেন। "প্রথম সুযোগেই যশোবন্ত রাও হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার" নির্দ্দেশ জারী করা হইল। কিন্তু যশোবন্ত রাওকে "শায়েস্তা" করার পূর্ব্বেই মর্ণিংটনকে ভারত ছাড়িতে হয়।

জেনারেল লেক বলিয়াছেন—যশোবন্ত রাও নিহত বা বন্দী না হইলে ইংরাজের শান্তি নাই। ওয়েলেসলী ইহার কোনটি নিষ্পন্ন করিতে না পারিলেও হোলকারের রাজ্যকে তিনি চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। যশোবন্ত রাওয়ের পক্ষে এই বিপর্য্যয় সামলাইয়া উঠা কোন কালেই সম্ভব হয় নাই।

লর্ড ওয়েলেসলীর ছয় বৎসরের বড়লাট-গিরির সময় কেবল যে দাক্ষিণাত্য ও মারাঠা সাম্রাজ্যেই বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা নহে। উড়িষ্যার নীলগিরি, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি সামন্ত রাজ্যও ইংরাজের প্রভুত্ব মানিয়া নেয়। বেসিনের সন্ধি সর্ত্তে ওয়েলেসলী পেশবার নিকট হইতে বুন্দেলখণ্ড কাড়িয়া নেন এবং সামান্য সংঘর্ষের পর বুন্দেলা সামন্তদের বশীভূত করেন। এক কথায়

বলিতে গেলে রাজপুতানা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত অঞ্চল ছাড়া ভারতের সাম্রাজ্যিক মানচিত্র মর্ণিংটনের হাতেই রূপ পায়। ওয়েলেসলীর পরবর্ত্তী বড়লাটগণ দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত মর্ণিটনের নীতি অনুসরণ করিয়াই সাম্রাজ্যিক বুনিয়াদ পোক্ত করিয়াছেন।

ওয়েলেসলীর বিজয় অভিযান রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য করিয়াছিল। সৈন্যদলের বেতন পর্য্যন্ত বাকী। ভারতে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হইলে আর্থিক সঙ্কট এড়ান সম্ভব নয়। কাজেই কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয় বড়লাট-গিরির সময় বিজয় অভিযানে ভাঁটা পড়ে। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে মারাঠা রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। কর্ণওয়ালিস্ মারাঠাদের সহিত শান্তি স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলীর দরুণ দেশীয় রাজ্যে কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে যে অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর করার জন্য ভারতের দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে একটা সাধারণ নীতি ঘোষণা করার অভিপ্রায়ও তাহার ছিল। কিন্তু ওয়েলেসলীর বহু মন্ত্রশিষ্য তখনও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। কর্ণওয়ালিস্ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—রাজ্য জয়ের উন্মত্ত নেশা সকলকেই যেন পাইয়া বসিয়াছে। যাহা হউক, কর্ণওয়ালিসের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ওয়েলেসলীর আর এক মন্ত্রশিষ্য, স্যার জর্জ্জ বার্লো সাময়িক ভাবে বড়লাটপদ অলঙ্কৃত করেন।

বার্লো সরাসরি ওয়েলেসলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের জনমত ও গবর্ণমেণ্ট তখনও যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধী। রাজকোষ শূন্য। এ সত্ত্বেও বার্লো দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে যে মনোভাব অবলম্বন করেন তাহার ফলে ইংরাজ রাজের শক্তি বৃদ্ধি হয়। স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ বলিয়াছেন—'দেশীয় রাজন্যবর্গের

বিবাদ বিসম্বাদের ফলে ইংরাজ শক্তির আরও শক্তিবৃদ্ধি হইবে বলিয়াই বার্লো মনে করিতেন; বস্তুতঃ তাহার কয়েকটি প্লান সরাসরি এই বিসম্বাদ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত।' ম্যালকম তাহার 'পলিটিক্যাল হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া' বইয়ে মেটকাফের মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "তাহার নীতি সরাসরি যুদ্ধের উস্কানি না দিলেও এই নীতি দুর্ব্বল রাজ্যের মধ্যে এমন রাজনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করিত যাহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত।"[১]

বার্লো সিন্ধিয়াকে জানাইয়াছিলেন যে, হোলকারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিলে ওয়েলেসলী তাহার যে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করা হইবে। সিন্ধিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ১৮০৫ সালে অঞ্জন গাঁও সন্ধিতে সিন্ধিয়া বশ্যতামূলক মৈত্রীর ফাঁস মুক্ত হইলেন এবং গোয়ালিয়র ফিরিয়া পাইলেন। সিন্ধিয়া এবং ইংরাজের এই নূতন সম্পর্কের ফলে হোলকারকেও ইংরাজের সহিত শান্তি স্থাপনে রাজী হইতে হইল। পেশবা ছাড়া সমস্ত মারাঠা শক্তি বশ্যতামূলক মৈত্রীর বন্ধনমুক্ত হইল। ওয়েলেসলী রাজপুত শক্তির সহিত যে আত্মরক্ষা মূলক চুক্তি করিয়া ছিলেন বার্লো তাহাও বাতিল করিয়া দেন।

বার্লো বেশীদিন এই নীতি অনুসরণ করিতে পারিলেন না। কোম্পানীর রাজস্বের অবস্থা তখনও সঙ্কটাপন্ন। বিলাতী কর্ত্তারা লর্ড মিণ্টোকে নিরপেক্ষতা নীতি অনুসরণের নির্দ্দেশ দিয়া ভারতে পাঠাইলেন।

শূন্য রাজকোষের দরুণ কোম্পানীর সাম্রাজ্যিক অভিযানে যে ছেদ পড়িয়াছিল লর্ড হেষ্টিংসের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবসান হয়। ভারতে পদার্পণের অব্যবহিত পরেই হেষ্টিংস নেপালীদের

(১) কস্তুরী—বৃটিশ অকুপেশন ইন ইণ্ডিয়া ১৪৫ পৃঃ।

সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সগৌলীর সন্ধিতে কুমায়ুন ও গাড়োয়াল অধিকার করেন। নেপাল সিকিমের উপর দাবী ত্যাগ করে। কাঠমুণ্ডুতে বৃটিশ রেসিডেন্ট অধিষ্ঠিত হইল। গুর্খা যুদ্ধের সমাপ্তির পরই তিনি পিণ্ডারী দমনের নামে ওয়েলেসলীর অসমাপ্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হন। মারাঠা শিবিরের এই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধ, দলের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া হেষ্টিংস মারাঠা শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

মধ্য ও পশ্চিম ভারত এতকাল ইংরাজদের পক্ষে রহস্যময় দেশ ছিল। কর্ণেল টডের চেষ্টায় ১৮১৫ সালে হেষ্টিংসের হাতে রাজপুতানা ও মধ্যভারতের এক নিখুঁত মানচিত্র পৌছিল। ১৮১৭ সালে যে তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া তিনি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেন কর্ণেল টডের মানচিত্র তাহার অন্যতম। টড্ সাহেব রাজপুত, মারাঠা ও মুসলিমদের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিতেও বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। সুতরাং অজানা দেশের মানচিত্র এবং রাজপুত শক্তির সুনিশ্চিত নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াই হেষ্টিংস রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন।

প্রথম আঘাত পড়িল সিন্ধিয়ার উপর। অঞ্জন গাঁও সন্ধিসর্ত্তে ইংরাজ শক্তি রাজপুত শক্তির সহিত সরাসরি আলোচনা করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল। হেষ্টিংস সর্ত্তটি বাতিল করিয়া দিলেন। মারাঠা শক্তির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত, পিণ্ডারী দলের উৎপাতে বিধ্বস্ত এবং পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে হীনবল রাজপুত শক্তি অতঃপর ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিল (১৮১৭-২৩)। সিন্ধিয়া এই নয়া ব্যবস্থা মানিতে বাধ্য হইলেন। গোয়ালিয়র এবারেও বশ্যতার ফাঁস হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

সিন্ধিয়ার পরই আসিল পেশবার পালা। মারাঠা শক্তির এই কেন্দ্রীয় বন্ধন ছিন্ন করিয়া হেষ্টিংস পেশবাকে বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া বিঠুরে নির্ব্বাসিত করিলেন। রেসিডেন্ট জেঙ্কিন্সের চেষ্টায় ১৮১৬ সালে ভোঁসলাও বশ্যতার ফাঁস পরিলেন। নাগপুর, নর্ম্মদার উত্তরের সমস্ত রাজ্য এবং বেরারের উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করিয়া দাসত্বের বিনিময়ে ভোঁসলা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। বাকী রহিল মাত্র হোলকার। মন্দীশুরের সন্ধিতে স্যার ম্যালকম হোলকারকে ইংরাজ রাজের সামন্তে পরিণত করেন। হোলকার বাহিনীর "ঘৃণ্য পিণ্ডারী সেনানী" আমীর খাঁ বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কারে টঙ্কের নবাবী পাইলেন—পাঠান সেনানী গফুর খাঁ পাইলেন জাওরা। মারাঠা সাম্রাজ্যের বশ্যতা সম্পূর্ণ হইল।

সাম্রাজ্য বিস্তারই হেষ্টিংসের একমাত্র কৃতিত্ব নয়। ইংরাজ রাজশক্তির সহিত দেশীয় রাজশক্তির সম্পর্কের তিনি এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সাধন করেন। ওয়েলেসলীর বশ্যতামূলক মৈত্রীর নীতি তাহার হাতে পূর্ণতা লাভ করে। ১৮২৩ সালে হেষ্টিংস যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন একমাত্র রণজিৎ সিংহের রাজ্য ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতার দাবী করিতে পারে এমন একটি রাজ্যও অবশিষ্ট ছিল না। ভারতে পদার্পণ করিবার চারিমাস পরে হেষ্টিংস তাঁহার রোজ-নামচায় লিখিয়াছেন—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা না করিলেও কার্য্যতঃ উহাকে রাজচক্রবর্ত্তী করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মারকুইস লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তাহার আমলেই ভারতীয় রাজনীতি আন্তর্জ্জাতিক পটভূমি হইতে সাম্রাজ্যিক স্তরে নামিয়া আসে। ডাঃ মেহতার ভাষায়, হেষ্টিংস দেশীয় রাজ্যের সমস্যাকে আন্তর্জ্জাতিক আইনের একতেয়ার হইতে

সরাইয়া বাস্তব রাজনীতির পর্য্যায়ে লইয়া আসেন। দেশীয় রাজ্যের সমস্যা অদ্যাপি এই স্তরেই আছে।*

দেশীয় রাজশক্তির সহিত বৃটিশের এই পরিবর্ত্তিত সম্পর্কে আভাষ সন্ধি চুক্তির সর্ত্তের মধ্যেই সুস্পষ্ট। অষ্টাদশ শতাব্দী এব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরাজশক্তি নিজাম (১৭৬৬), বরোদা (১৮০২), ত্রিবাঙ্কুর (১৮০৫), গোয়ালিয়র (১৮০৩) প্রভৃতির সহিত যে সন্ধি করেন উহাতে ইহাদের সমমর্য্যাদা সম্পন্ন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই সমস্ত সন্ধি সর্ত্তে "পারস্পরিক সম্প্রীতি, বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, পারস্পরিক বাধ্য-বাধকতা, মৈত্রী, প্রকৃত বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, চিরন্তন বন্ধুত্ব, দৃঢ় মৈত্রী" প্রভৃতি বাক্য সংযোজিত আছে। ১৮১৩ সালের পূর্ব্বে এই সব রাজ্য কি ধরণের স্বাধীনতা ভোগ করিত গোয়ালিয়রের সহিত নিষ্পন্ন সন্ধির চতুর্দ্দশ ধারায় তাহা সুস্পষ্ট,— "এতদ্বারা উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা দৃঢ়মূল ও বর্দ্ধিত করার জন্য প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেকের ক্ষমতাবান দূত অন্যের দরবারে থাকিবে।"

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উদয়পুর (১৮১৮), যোধপুর (১৮১৮), বিকানীর (১৮১৮) প্রভৃতি রাজপুত শক্তির সহিত যে সন্ধি করা হয় তাহাতে "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ইহার সহিত অধীন সহযোগীর ন্যায় কাজ করিবার" বাধ্য-বাধকতা আরোপ করা হয়। ১৮২৭ সালে কোলাপুরের সহিত যে সন্ধি করা হয় তাহাতে রাজ্যটির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার সর্ত্ত আরোপিত হয়।

১৮১৮ হইতে ১৮৫৬ সালের মধ্যে "সাম্রাজ্যিক কল্পনা বর্দ্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত" হয়। ১৮৩৪ সালের পর কোম্পানী এই দাবী করিতে থাকে যে তাহাদের বিনা অনুমোদনে উত্তরাধিকারী গদীতে বসিতে

(১) ডাঃ মেহতা—হেংষ্টিস এণ্ড দি ইণ্ডিয়ান্ ষ্টেট্‌স্ ২৬২ পৃঃ।

পারিবে না। অতঃপর মন্ত্রী নিয়োগেও কোম্পানী রাজন্য-সমাজকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করে। উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোম্পানীর এই নীতি ডালহৌসীর হস্তে পূর্ণতা লাভ করে।

লর্ড হেষ্টিংসের পর আমহার্ষ্ট, বেন্টিঙ্ক, মেটকাফ, অকল্যাণ্ড, এলেনবরো ও হার্ডিঞ্জ তাহাদের শাসনকালে মোটামুটিভাবে ওয়েলেসলী-হেষ্টিংসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। আমহার্ষ্টের সময় ইংরাজশক্তি ব্রহ্ম অভিযান করে এবং ইয়ানদাবোর সন্ধিতে আসাম, মণিপুর, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া লাভ করে। ব্রহ্ম অভিযান কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাকে আবার সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলে। কাজেই শান্তিপ্রিয় বেন্টিঙ্কের পক্ষে যুদ্ধের বিলাসে মাতিয়া ওঠা সম্ভব ছিল না। তবে রুচির দিক হইতে তিনিও যে কোম্পানীর জঙ্গী বড়লাটদের সমপর্য্যায়ভুক্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ১৮৩১ সালে বেন্টিঙ্ক মহীশুরের রাজাকে রাজ্য শাসনের সর্ব্ব অধিকারবঞ্চিত করেন এবং মহীশুরে সরাসরি বৃটিশ শাসন কায়েম হয়। জয়পুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং সম্বর জিলা দখল করিয়া জয়পুরের বাকী করের জামিন হিসাবে লবণ হ্রদের একটা অংশ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনেন। কাছাড় সম্পর্কে বেন্টিঙ্ক যে নীতি অনুসরণ করেন ডালহৌসীর সময়ে তাহাই স্বত্বভ্রংশনীতি বলিয়া কু-খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কাছাড়ের রাজা-গোবিন্দ চন্দ্র অপুত্রক মারা গেলে বেন্টিঙ্ক কাছাড় রাজ্য দখল করেন।

এলেনবরোর প্রধান কীর্ত্তি সিন্ধুজয় ও সিন্ধিয়ার পরাজয়। মারাঠা শক্তির মধ্যে একমাত্র গোয়ালিয়রই তখনও বণিকরাজের বশ্যতামূলক মৈত্রীর ফাঁস পরে নাই। শক্তিধর ও সম্পদশালী গোয়ালিয়র তখনও ইংরাজের সমমর্য্যাদাসম্পন্ন, স্বাধীন। সুতরাং গোয়ালিয়রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই বণিকরাজের ছিল না। কিন্তু শিখদের সহিত সংগ্রামের সময় দক্ষিণ প্রান্তের এই

শক্তিধর রাজ্যটি যাহাতে কোন বিপদ সৃষ্টি করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। এলেনবরো নিজেই বলিয়াছেন—গোয়ালিয়র বাহিনীর অসন্তুষ্ট (!) অংশকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং নিরস্ত্র করিতে হইবে; কেননা "এইরূপ শক্তিধর বাহিনী থাকিলে শতদ্রু নদীর দিক হইতে যে বিপদের শঙ্কা করা হইতেছে তাহার সম্মুখীন হইবার জন্য উপযুক্ত সেনা সন্নিবেশ করিতে বিশেষ অসুবিধা দেখা দিবে।"[১] অপুত্রক জানকীজী সিন্ধিয়ার মৃত্যুর পর নাবালক দত্তক পুত্রের অভিভাবকত্ব লইয়া যে গোলমাল সৃষ্টি হয় তাহার সুযোগে এলেনবরো গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন এবং গোয়ালিয়রকে সামন্ত রাজ্যে পরিণত করেন। সিন্ধিয়ার রাজ্য এতকাল যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল ১৮৪৪ সালে তাহার অবসান হইল। শতদ্রু অঞ্চলের কাইথুল নামে বৃটিশ রক্ষণাধীন রাজ্যের রাজা অপুত্রক মারা গেলে এলেনবরো অপবর্ত্তনের যুক্তি দেখাইয়া রাজ্যটি দখল করেন।

শিখ শক্তির পরাজয় এবং কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের সৃষ্টি হার্ডিঞ্জের আমলের বিশিষ্ট ঘটনা। জম্মুর রাজা গোলাব সিং শিখদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজদের সাহায্য করেন। পুরস্কারে হার্ডিঞ্জ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাহার নিকট কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্য বিক্রয় করিলেন এবং অমৃতসরের সন্ধিতে তাহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল।

কাছাড় ও কাইথুল সম্পর্কে বেন্টিঙ্ক ও এলেনবারা যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন কোম্পানীর সাম্রাজ্যের শেষ স্রষ্টা লর্ড ডালহৌসীর স্বত্বভ্রংশ নীতিতে (Doctrine of Lapse) তাহা পূর্ণতা লাভ করে। কোম্পানীর অস্ত্রবলে যে সমস্ত রাজ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, জয় করিয়াও কোম্পানী সনদ দ্বারা যে সমস্ত রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যে সমস্ত

(১) কস্তুরী—বৃটিশ অকুপেশন ইন ইণ্ডিয়া ২০৩ পৃঃ।

রাজ্য পূর্ব্বে পেশবার অধীন ছিল এবং পরে কোম্পানীর অধীনে আসিয়াছে স্বাভাবিক উত্তরাধিকারীর অভাবে ডালহৌসী তাহাদের দত্তক গ্রহণ করিয়া বংশরক্ষার অধিকার কাড়িয়া নিলেন। স্যার চার্লস উডের নিকট লিখিত এক পত্রে ডালহৌসী দেশীয় রাজ্যসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন :—(১) স্বাধীন রাজা, (২) করদ ও অধীন সামন্ত রাজ্য এবং (৩) কোম্পানীর সনদ দ্বারা সৃষ্ট রাজ্যসমূহ। তাহার মতে শক্তির জবরদস্তি ছাড়া প্রথম শ্রেণীর রাজন্যবর্গের দত্তকগ্রহণে আপত্তি করার কোন অধিকার কোম্পানীর নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজাদের ক্ষেত্রে দত্তকগ্রহণে আপত্তি করা গেলেও নীতি হিসাবে এ ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু "তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্যসমূহকে আমার মতে দত্তক গ্রহণের অধিকার দেওয়া কোন মতেই উচিত নহে।"

ডালহৌসী নিজেই এই শ্রেণীবিভাগ মানিয়া চলেন নাই। একমাত্র তাহার আমলেই সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর, কর্ণাটক ও তাঞ্জোর রাজ্য এই নীতির বলে সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। ইহাদের সকলেই ডালহৌসী-বর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীর রাজ্য নহে।

লর্ড ডালহৌসীর এই নীতি দেশীয় রাজ্যে কি প্রবল শঙ্কা ও বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল স্যার জন কে'র উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায়। "অপবর্ত্তন শব্দটি কিছুদিনের মধ্যেই রাজন্য সমাজে সামরিক আক্রমণের চাইতে অধিকতর বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। ভারতীয়েরা অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী। শক্তিধরের নিকট যুদ্ধে পরাজয়কে তাহারা কিসমৎ বা নিয়তি বলিয়া গ্রহণ করে। কিন্তু এই পরাজয় তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারে না।......অপবর্ত্তন পরাজয়ের চাইতেও ভয়ঙ্কর। মৃত্যুর পরেও অভিশাপের মত ইহা তাহাদের অনুসরণ করিবে। স্বত্বভ্রংশনীতি তাহাদের অপুত্রক করিয়া পারলৌকিক মুক্তি ও শান্তিলাভের পথও রুদ্ধ করে।"

কাজেই শাসনভার গ্রহণের কালে লর্ড ক্যানিং যদি ভারতের দিগন্তে প্রভঞ্জনের কৃষ্ণমেঘ দেখিয়া থাকেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। লর্ড ডালহৌসীর ভারত-ত্যাগের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কোম্পানীর সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ কাঁপাইয়া তুলিল। শাসনভার গ্রহণের পূর্ব্বেই ক্যানিং মানস চক্ষে এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর পরিচালকগণ তাহার বিদায় সম্বর্দ্ধনার জন্য যে ভোজসভার আয়োজন করেন উহাতে লর্ড ক্যানিং বলেন—"আমার শাসনকাল শান্তিময় হউক ইহাই কামনা করি। কিন্তু আমি ভুলিতে পারি না যে, ভারতের প্রশান্ত আকাশে হস্ত পরিমিত এক খণ্ড মেঘ দেখা দিতে পারে এবং এই মেঘ ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাইয়া প্রভঞ্জনের ভীমবেগে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে।"

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শাসকদের শেষ সম্মিলিত সংগ্রাম। বিদেশী প্রভুত্বের গতিরোধ করিয়া সাবেক প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইবার জন্য সামন্ত সমাজ এই ভারতব্যাপী বিদ্রোহানল জ্বালাইয়া তোলে। শতাধিক বৎসরের শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে গোটা ভারতে, বিশেষতঃ আর্য্যাবর্ত্তে যে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল তাহাতে স্ফুলিঙ্গ সংযোগের কারণ যাহাই হউক, ইহার নেতৃত্ব করেন সামন্ত সমাজ। অসন্তুষ্ট ভারতীয় রাজন্য সমাজের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন পদচ্যুত পেশবা বাজীরাওয়ের পুত্র নানা সাহেব। মধ্য ভারতের বিদ্রোহীদের মধ্যমণি ছিলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। মধ্য ভারতের কয়েকটি সামন্ত শক্তি বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইলেও প্রকাশ্যে বিদ্রোহে যোগ দিতে সাহস করেন

নাই। কিন্তু গোয়ালিয়রের সৈন্যদল প্রকাশ্যেই বিদ্রোহীদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইল।

অপর পক্ষে কোম্পানী এই বিদ্রোহ দমনও করেন সামন্ত শক্তির সহায়তায়। প্রভু শক্তির এই বিপদে বহু সামন্ত নৃপতি সম্পদ ও সৈন্যবল দিয়া ইংরাজদের সাহায্য করিয়াছে। বস্তুতঃ শিখ, গুর্খা ও নিজামের সক্রিয় সাহায্যের জন্যই বিদ্রোহের আগুন সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই; এবং ইহাদের সাহায্যের জন্যই দিল্লী, রোহিলখণ্ড ও মধ্য ভারতের বিদ্রোহ দমন করা সাধ্যাতীত হয় নাই।

যাহা হউক, ভারত শাসন সম্পর্কে বৃটিশ মন্ত্রিসভা এতকাল যে পরোক্ষ কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর তাহার অবসান হইল। ইংলণ্ডেশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া গোটা ভারত সরাসরি বৃটিশ মন্ত্রিসভার কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া গেল। বড়লাট "রাজপ্রতিনিধির" মর্য্যাদায় ভূষিত হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করিলেন, রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি এবং তাহাদের স্বত্ব ও মর্য্যাদা রক্ষার যে ব্যবস্থা কোম্পানী করিয়াছে তাহা রক্ষিত হইবে এবং সামন্ত রাজ্য গ্রাস করার নীতি পরিহার করা হইবে।

রাজ্য গ্রাসের নীতি পরিত্যক্ত হইলেও দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন সত্তা তখন বিলুপ্ত। রাজন্যবর্গ তখন বৃটিশ শক্তির সর্ব্বাত্মিক প্রভুত্ব ও রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অধীন। লর্ড ক্যানিং স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "ইংলণ্ডেশ্বর এখন গোটা ভারতের অবিসম্বাদী শাসনকর্ত্তা এবং রাজচক্রবর্ত্তী। বৃটিশ রাজ শক্তি এই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার সামন্তদের মুখোমুখি দাঁড়াইলেন। ইংলণ্ডের এই সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব এক অভিনব বাস্তব সত্য। ইতিপূর্ব্বে কোন কালেই ইহার অস্তিত্ব ছিল না।

সামন্তগণ এই সত্য যে কেবল অনুভব করেন তাহাই নহে—তাহারা এই সত্য স্বীকার করিতেও ব্যগ্র।[১]

ইংলণ্ডের রাজশক্তির সহিত দাসত্বের নাগপাশে হীনবল দেশীয় রাজশক্তির অতঃপর যে সম্পর্কের সূচনা হইল তাহা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের রকমফের মাত্র।

(১) শাস্ত্রী—ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স ঃ ২১ পৃ ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাম্রাজ্য নীতির রূপান্তর

স্বার্থান্বেষী বণিক শোষণের উচ্ছেদ হওয়ায় গোটা ভারত মোটামুটি ভাবে উপকৃত হইলেও অতঃপর যে যুগের সূত্রপাত হইল দেশীয় রাজ্যের মর্য্যাদার দিক হইতে তাহার মধ্যে কোনও অভিনবত্ব ছিল না। রাণীর ঘোষণায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে, কোম্পানীর আমলের সন্ধি চুক্তির মর্য্যাদা যথাযথভাবে রক্ষিত হইবে। সুতরাং কোম্পানীর আমলে দেশীয় রাজ্যসমূহ যে অধীন মর্য্যাদায় অবনমিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনেও সেই মর্য্যাদা অপরিবর্ত্তিত রহিল। তবে বণিক রাজত্বে রাজ্য গ্রাসের জন্য যে শাঠ্য ও কূট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হইত বিদ্রোহোত্তর যুগে তাহা পরিত্যক্ত হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন, রাজ্য বিস্তারের জন্য আর কোনও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। লর্ড ক্যানিং ১৬০টি রাজ্যের দত্তক গ্রহণের অধিকার স্বীকার করিয়া সনদ জারী করিলেন। লর্ড ল্যানস্‌ডাউনের আমলে আরও ১৭ টি সনদ ইস্যু করা হয়।

দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বৃটিশ শক্তির এই বিদ্রোহোত্তর সদিচ্ছা অকারণ নহে। কোন দেশে সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখিতে হইলে সেই দেশের সমাজের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন শ্রেণী স্বার্থ সৃষ্টি করা আবশ্যক এবং উহাকে জীয়াইয়া রাখা দরকার। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থায়, বিশেষতঃ বৈদেশিক শাসনে ভেদবাদ শাসকের অপরিহার্য্য রাষ্ট্রনীতি। সাম্রাজ্য-

বাদের প্রতি অসন্তুষ্ট প্রগতিশীল জনসমাজের মধ্যে এইরূপ সামাজিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীই এই বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক। কেননা ইহাদের স্বার্থও জনগণের স্বার্থের বিরোধী। এই জন্যই কোম্পানী গবর্ণমেণ্ট প্রথমাবস্থায় রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করেন। এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগবিশিষ্ট এবং সাম্রাজ্যবাদীর উপর একান্ত নির্ভরশীল বিভিন্ন বণিক স্বার্থ ও কুসীদজীবী শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। সামন্ত সমাজ ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় এইরূপ একটি শ্রেণী।

যতদিন ভারতের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব লইয়া সামন্ত সমাজ ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, ততদিন বিদেশী শাসক সামন্ত শ্রেণীকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল ছিল না। ভারত জয়ের প্রারম্ভে বিদেশী বণিক সাধারণভাবে এই ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছে, এবং বহুধাবিচ্ছিন্ন বিচিত্র ধরণের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে একই ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য কৃতিত্ব বোধ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বৃটিশ প্রভুত্ব যখন আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তা লইয়া অগ্রসর হইতেছিল তখন সুযোগ পাইলে কোন দিকে ভ্রূপেক্ষ না করিয়া ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয় রাজ্যসমূহকে বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীন অঞ্চলের অন্তর্লীন করা হইয়াছে। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শক্তির শেষ বিদ্রোহের পর এই নীতির অবসান হইল। ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্রোহ দমনে ইংরাজকে সাহায্য করে। কিন্তু বিদ্রোহ হইতে ইংরাজ শক্তি ভবিষ্যতের জন্য ও শিক্ষা গ্রহণ করিল। অতঃপর সামন্ত সমাজকে বৃটিশ শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী গণ্য করিবার কোন কারণই রহিল না। যে প্রগতিশীল শক্তিকে এতকাল আনুকূল্য করা হইয়াছে, জনগণের ভাবী নেতা হিসাবে তাহাদের প্রতিই সাম্রাজ্যবাদীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। কাজেই, অতঃপর বৃটিশ

শাসনের বর্ম হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী আরও সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী সৃষ্টির জন্য তৎপর হইল। রাজন্য সমাজও তাহাদের রাজ্য রক্ষায় অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন।

বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্যার জন স্লিম্যান বড়লাট ডালহৌসীকে বলিয়াছিলেন—"অযোধ্যা জয় করিলে ইংরাজ শক্তির যে ক্ষতি হইবে তাহা এই রাজ্যের দামের দশ গুণেরও বেশী; ইহার ফলে সিপাহীরা বিদ্রোহ করিবে।" তাহার মতে, দেশীয় রাজ্যসমূহকে "বাঁধ" হিসাবে গণ্য করা উচিত; কেননা "এই বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে আমাদের একান্তভাবে দেশীয় বাহিনীর উপর নির্ভর করিতে হইবে; সব সময়ে উহা নির্ভরযোগ্যভাবে আমাদেব নিয়ন্ত্রণাধীন নাও থাকিতে পারে।"

ডালহৌসী এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়াছেন। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতায় ভুল ভাঙ্গিল। ১৮৬০ সালে লর্ড ক্যানিং বলিলেন,—স্যার জর্জ্জ ম্যালকম বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, আমরা যদি গোটা ভারতকে জিলায় ভাগ করিয়া দেই তবে আমাদের সাম্রাজ্য পঞ্চাশ বৎসরও টিকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা যদি রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন কতগুলি দেশীয় রাজ্য বজায় রাখিতে পারি তবে যতদিন সমুদ্রে আমাদের আধিপত্য থাকিবে আমরা ভারতে টিকিয়া থাকিব। এই মতের সারবত্তা সম্পর্কে আমার সংশয় নাই। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে এ বিষয়ে আগের চাইতে বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার।"

তখনই হউক কিম্বা দুদিন পরেই হউক, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত রাজ্য অবশ্যই লোপ পাইত। কিন্তু বৃটিশ নীতি তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। "রাষ্ট্রীয় কারণেই" ইহাদের অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে—প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যের নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধার দরুণ নহে।

(১) পাম দত্ত—ইণ্ডিয়া টু-ডে : ৩৫৮ পৃঃ।

বিদেশী বুর্জোয়া শাসনের সমর্থক হিসাবে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

বিদ্রোহোত্তর রাজ্যরক্ষানীতি

কোম্পানীর আমলে, বিশেষতঃ ১৮৩৮ সালের পূর্ব্বে বৃটিশ শক্তি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কখনও হস্তক্ষেপ করার নীতি, কখনও বা নিরপেক্ষতা নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কুশাসন, অরাজকতা, বিদ্রোহ কিম্বা উত্তরাধিকারীর অভাব ঘটিলেই রাজ্য দখল করা হইত। কিন্তু বিদ্রোহোত্তর রাজ্যরক্ষানীতি অনুসারে রাণীর ঘোষণায় যখন রাজন্য সমাজের অধিকার, মর্য্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যবৃদ্ধির জন্য দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার "পবিত্র প্রতিশ্রুতি" দিলেন, ভারতের বুকে তখন বৃটিশ শাসিত অঞ্চলের সহিত সাড়ে পাঁচ শতাধিক সামন্ত রাজ্য কায়েম হইল।

ইহাদের মধ্যে মাত্র ৪০টি রাজ্যের সহিত কোম্পানীর সন্ধি ছিল।[১] বাকী রাজ্যের প্রায় চারিশতটি রাজ্য পূর্ব্বে কোন না কোন রাজ্যের অধীন ছিল কিম্বা তাহাদের কর দিত। ১৮১৪ সাল হইতে ১৮৪০ সালের মধ্যে কোম্পানী ইহাদের প্রভুরাজ্যের বন্ধনমুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাদের সহিত কোম্পানীর সম্পর্ক অঙ্গীকার ও সনদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। বৃহৎ রাজ্যের বন্ধনমুক্ত এই সব রাজ্য "কয়েকটি সামন্ততান্ত্রিক অধিকারসহ সীমাবদ্ধ কর্ত্তৃত্ব সম্পন্ন বিশেষ ধরণের জমিদারীর" মত। এই সব রাজ্যের স্বত্ব ও অধিকার বিভিন্ন ধরণের হইলেও মিঃ এটকিসন তাহাদের দুইটি সাধারণ ভাগে ভাগ করিয়াছেন। যে সমস্ত রাজ্যের গ্যারাণ্টিতে

(১) ইণ্ডিয়া স্পীকিং: নানাবতী সম্পাদিত—১৬ পৃঃ।

ঐ রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় সামন্ত-প্রভুর হস্তক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহারা প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত। আর যাহাদের প্রতিশ্রুতি পত্রে ঐরূপ কোন সর্ত্ত নাই তাহারা দ্বিতীয় পর্য্যায়ের। ইহাদের সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করিতেন :—

(১) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা কেবলমাত্র মূল বংশোদ্ভূত উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

(২) মূল বংশোদ্ভূত উত্তরাধিকারী না থাকিলে দত্তক গ্রহণের পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন লাভ, নিয়ম হিসাবে গ্যারাণ্টি অব্যাহত রাখার জন্য অত্যাবশ্যক। ইহা করা হইলে দত্তকের উপরও গ্যারাণ্টি বর্ত্তিবে।

(৩) অনুমোদন গ্রহণ করা না হইলে এই গ্যারাণ্টি দত্তক সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না যতক্ষণ দত্তক গ্রহণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিধিসম্মত অনুমোদন লাভ না করে।

(৪) যে ক্ষেত্রে মূল বংশোদ্ভূত উত্তরাধিকারী কিম্বা দত্তক কিছুই থাকিবে না, সে ক্ষেত্রে রাজার অধিকারভুক্ত সম্পত্তি সামন্ত প্রভু পাইবেন,—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নহে।

(৫) যে ক্ষেত্রে গ্যারাণ্টির সর্ত্ত দ্বারা অধীন সামন্ত সম্পর্কে সামন্ত প্রভুর হস্তক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের।

(৬) কোন এষ্টেটের যদি মূল বংশোদ্ভূত উত্তরাধিকারী থাকে এবং ঐ এষ্টেটের সনদে সামন্ত-প্রভুর হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হইয়া থাকে তবে উত্তরাধিকার এবং এষ্টেটের গ্যারাণ্টি অব্যাহত রাখা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একমাত্র অধিকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের। কিন্তু সামন্ত

প্রভু যদি উত্তরাধিকারী সম্পর্কে কোন সঙ্গত আপত্তি জানাইতে চাহেন (যেমন তাহার জন্মের বৈধতা সম্পর্কে) তবে তাহার বক্তব্য শুনিতে হইবে।

(৭) এইরূপ কোন এষ্টেটের যদি মূল বংশোদ্ভূত উত্তরাধিকারী না থাকে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দত্তকের উত্তরাধিকার অনুমোদন করেন, তবে অধীন সামন্তের সম্পত্তি সম্পর্কে সামন্ত প্রভুর দাবী ধৈর্য্য সহকারে শুনিতে হইবে। কিন্তু উত্তরাধিকারের প্রশ্ন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থায় তাহার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নাই। কিম্বা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রারম্ভিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্ব্বে, অথবা উহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে, তিনি (সামন্ত-প্রভু) দত্তক উত্তরাধিকারী অনুমোদনকল্পে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

(৮) নিজ বংশ ছাড়া টঙ্কাদারদের টঙ্কার উপর কোন অধিকার থাকিবে না; কিম্বা তাহারা টঙ্কাকে এমন ঋণভারাক্রান্ত করিতে পারিবেন না যাহা তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও দিতে হইবে।

(৯) গ্যারাণ্টির সর্ত্তে সামন্ত-প্রভুর হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হইয়া থাকিলে, অধীন সামন্তকে নজরানা দিতে হইবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে সামন্ত-প্রভু অধীন সামন্তের এষ্টেটে দত্তক গ্রহণের কালে ঐ এষ্টেটের নীট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ নজরানা দাবী করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে সমস্ত প্রভু অধীন সামন্তকে নজরানার এক-চতুর্থাংশ উপঢৌকন দিয়া থাকেন।

(১০) এই সমস্ত মিডিয়েটাইজড্ সামন্তদের (সামন্ত-প্রভুর বন্ধনমুক্ত অধীন-সামন্ত) কাহারও মৃত্যুদণ্ড দিবার অধিকার নাই। গুরুতর ও ঘৃণ্য অপরাধে অভিযুক্ত আসামীর বিচার এবং মৃত্যুদণ্ড, দ্বীপান্তরদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিবার

অধিকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় প্রতিনিধির। সমস্ত বিষয়ই তাহার নিকট যথারীতি পেশ করিতে হইবে।[১]

সাম্রাজ্যনীতির পরিবর্ত্তনের ফলে রাজনৈতিক দিক হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বা স্বার্থহানি ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যে সমস্ত দেশীয় রাজশক্তি বৃটেনের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন বা অনিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারিত কোম্পানীর আমলে তাহাদের কতগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে তাহারাও হীনবল—কোম্পানীর সন্ধিসর্ত্তের নাগপাশে পলিটিক্যাল এজেণ্টের হাতের পুতুল। চুক্তি সম্পাদনে ইংরাজ যে সাধারণ নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিলেই সামন্ত শক্তির অবস্থা সুস্পষ্ট হইবে। সন্ধিসর্ত্ত সমস্ত ভারতীয় রাজশক্তিকে প্রতিবেশীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। প্রতিবেশী কোন রাজ্যের সহিত কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতে হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে; সরাসরি কিম্বা রাজচক্রবর্ত্তীর অজ্ঞাতসারে করা চলিবে না, সন্ধিসর্ত্তের ইহাই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। রাজচক্রবর্ত্তীর অনুমোদন ব্যতীত কোন চুক্তি করা হইলে তাহা কোন কালেই বলবৎ হইবে না। রাজচক্রবর্ত্তী অত্যন্ত কঠোর ভাবে এই স্বতন্ত্রীকরণের নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ফলে প্রতিটি রাজ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী এক একটি বিচ্ছিন্ন পকেটে পরিণত হইয়াছে। সামন্ত সমাজের এই সংহতিনাশের সঙ্গে ছিল আভ্যন্তরীণ দিক হইতে সাবেক শক্তিমান রাজ্যসমূহকে দুর্ব্বল করার চেষ্টা। এইরূপ প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেরই বহু সামন্ত ছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সামন্তদের সাবেক প্রভুর আনুগত্যমুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফলে ভারতের বুকে সৃষ্টি

(১) কর্ণেল ম্যালিসন—নেটিভ ষ্টেট্স অফ্ ইণ্ডিয়া—৩৫২-৫৩ পৃঃ

হইল অসংখ্য ক্ষুদে রাজ্য। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের দাক্ষিণ্যের দুয়ারে ভিখারী এই সামন্ত সমাজ অচিরেই কায়েমী স্বার্থের এক জটিল পাপচক্র সৃষ্টি করিল। এই ভেদবাদী ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিটি রাজ্যের ছিল ইংরাজ নিয়ন্ত্রিত সেনা বাহিনী এবং সর্ব্বেশ্বর পলিটিক্যাল এজেন্ট। কাজেই দেশীয় রাজ্য সহ গোটা ভারত রাজনৈতিক দিক হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বজ্র মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়িল।

অতঃপর ইংরাজ শক্তি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে যে সাধারণ নীতি অনুসরণ করেন, স্যার চার্লস্ টুপারের মতে তাহা তিনটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত :—

(১) লর্ড ওয়েলেসলী ও লর্ড হেষ্টিংসের নীতির ফলে রাজ-চক্রবর্ত্তীর যে অধিরাজত্ব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

(২) ক্যানিং-এর আমল হইতে এবং গবর্ণমেন্টের পরবর্ত্তী আইন ও ঘোষণায় সমস্ত রাজ্যের সে অটোনমী স্বীকৃত হইয়াছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে।

(৩) ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকার দাবী করিয়া কোনও সামন্ত নৃপতি রাজ্যে কুশাসন চালাইতে পারিবেন না।

অর্থনৈতিক শোষণের ব্যবস্থা ঃ

বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অধীনে ভারত নূতন রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করিলেও, রাজনৈতিক ঐক্য সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে না। রাজনৈতিক প্রভুত্ব তাহার অভীষ্ট লাভের উপায় মাত্র। আসল লক্ষ্য গোটা ভারতের নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক শোষণ। যে কারণে বণিক রাজকে হটাইয়া ভারতে বৃটিশ পার্লামেন্টের সরাসরি কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

অধিকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় প্রতিনিধির। সমস্ত বিষয়ই তাহার নিকট যথারীতি পেশ করিতে হইবে।[১]

সাম্রাজ্যনীতির পরিবর্ত্তনের ফলে রাজনৈতিক দিক হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বা স্বার্থহানি ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যে সমস্ত দেশীয় রাজশক্তি বৃটেনের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন বা অনিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারিত কোম্পানীর আমলে তাহাদের কতগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যাহারা অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে তাহারাও হীনবল—কোম্পানীর সন্ধিসর্ত্তের নাগপাশে পলিটিক্যাল এজেণ্টের হাতের পুতুল। চুক্তি সম্পাদনে ইংরাজ যে সাধারণ নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিলেই সামন্ত শক্তির অবস্থা সুস্পষ্ট হইবে। সন্ধিসর্ত্ত সমস্ত ভারতীয় রাজশক্তিকে প্রতিবেশীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। প্রতিবেশী কোন রাজ্যের সহিত কোন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতে হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মাধ্যমেই তাহা করিতে হইবে; সরাসরি কিম্বা রাজচক্রবর্ত্তীর অজ্ঞাতসারে করা চলিবে না, সন্ধিসর্ত্তের ইহাই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। রাজচক্রবর্ত্তীর অনুমোদন ব্যতীত কোন চুক্তি করা হইলে তাহা কোন কালেই বলবৎ হইবে না। রাজচক্রবর্ত্তী অত্যন্ত কঠোর ভাবে এই স্বতন্ত্রীকরণের নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। ফলে প্রতিটি রাজ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী এক একটি বিচ্ছিন্ন পকেটে পরিণত হইয়াছে। সামন্ত সমাজের এই সংহতিনাশের সঙ্গে ছিল আভ্যন্তরীণ দিক হইতে সাবেক শক্তিমান রাজ্যসমূহকে দুর্ব্বল করার চেষ্টা। এইরূপ প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেরই বহু সামন্ত ছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সামন্তদের সাবেক প্রভুর আনুগত্যমুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফলে ভারতের বুকে সৃষ্টি

---

(১) কর্ণেল ম্যালিসন—নেটিভ ষ্টেট্‌স অফ্ ইণ্ডিয়া—৩৫২-৫৩ পৃঃ

হইল অসংখ্য ক্ষুদে রাজ্য। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দাক্ষিণ্যের দুয়ারে ভিখারী এই সামন্ত সমাজ অচিরেই কায়েমী স্বার্থের এক জটিল পাপচক্র সৃষ্টি করিল। এই ভেদবাদী ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিটি রাজ্যের ছিল ইংরাজ নিয়ন্ত্রিত সেনা বাহিনী এবং সর্ব্বেশ্বর পলিটিক্যাল এজেণ্ট। কাজেই দেশীয় রাজ্য সহ গোটা ভারত রাজনৈতিক দিক হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বজ্র মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়িল।

অতঃপর ইংরাজ শক্তি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে যে সাধারণ নীতি অনুসরণ করেন, স্যার চার্লস্ টুপারের মতে তাহা তিনটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত :—

(১) লর্ড ওয়েলেসলী ও লর্ড হেষ্টিংসের নীতির ফলে রাজ-চক্রবর্ত্তীর যে অধিরাজত্ব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

(২) ক্যানিং-এর আমল হইতে এবং গবর্ণমেণ্টের পরবর্ত্তী আইন ও ঘোষণায় সমস্ত রাজ্যের সে অটোনমী স্বীকৃত হইয়াছে তাহা রক্ষা করিতে হইবে।

(৩) ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকার দাবী করিয়া কোনও সামন্ত নৃপতি রাজ্যে কুশাসন চালাইতে পারিবেন না।

অর্থনৈতিক শোষণের ব্যবস্থা :

বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অধীনে ভারত নূতন রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করিলেও, রাজনৈতিক ঐক্য সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে না। রাজনৈতিক প্রভুত্ব তাহার অভীষ্ট লাভের উপায় মাত্র। আসল লক্ষ্য গোটা ভারতের নিরঙ্কুশ অর্থনৈতিক শোষণ। যে কারণে বণিক রাজকে হটাইয়া ভারতে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সরাসরি কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

করা হইল, ভারতীয় রাজশক্তি সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহোত্তর নীতি তাহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও বণিক সমাজের কাছে ভারতের অফুরন্ত কাঁচা মালের লোভনীয় গুরুত্ব তখন সুপরিস্ফুট। এই সম্পদে বলীয়ান ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ শিল্পসঙ্গতির এক উজ্জ্বল চিত্র তাহাদের মানস চক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই লোভনীয় ভবিষ্যৎ বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য চাই সম্পদ আহরণের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা, চাই ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধাবন্ধহীন অধিকার; তারও আগে ভারতের বুকে চাই বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত "শান্তি ও শৃঙ্খলার" রাজত্ব। কোম্পানীর আমলের শাসননীতির ফলে ভারতের কোন না কোন স্থানে যুদ্ধবিগ্রহ বা অশান্তি লাগিয়াই ছিল। এই অশান্তি ও অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে সুপরিকল্পিত শোষণ সম্ভব নহে। কাজেই বিদ্রোহের অজুহাত দেখাইয়া কোম্পানীকে হটান হইল। রাজ্য-রক্ষা নীতি "শান্তি ও শৃঙ্খলা" স্থাপনের বুনিয়াদ তৈরী করিল। এবং নয়া শোষণ নীতির এজেণ্ট হিসাবে ভারতে আসিতে লাগিল অসংখ্য ইংরাজ বসবাস ও ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্কল্প লইয়া।

কোম্পানীর পক্ষ হইতে মিঃ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মুন্সীয়ানায় বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাহার মধ্যেই এই নয়া শোষণ পদ্ধতির ইঙ্গিত মেলে। "যে সমস্ত ইংরাজ ভারতে বসবাস করিতেছে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই এখন হইতে ভারত শাসন করিতে হইবে এই মনোভাব ইংলণ্ডে প্রসার লাভ করিতেছে দেখিয়া আপনাদের দরখাস্তকারিগণ দুঃখিত।" ১৮৫৮ সালে কমন্স সভা যে সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করেন তাহাকে ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাস ও উপনিবেশ স্থাপনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং তাহার উন্নতি বিধানের উপায় ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তদন্ত করার নির্দ্দেশ

দেওয়া হয়। অতঃপর দেখা গেল, গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ দিতেছেন। ইংরাজ প্লাণ্টার্স, ইংরাজ তুলা ও ষ্টীল উৎপাদকে ভারত ছাইয়া যাইতেছে। শৈলাবাসের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ স্থাপন করা হইতেছে এবং ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা সেখানে ভীড় জমাইতেছে। দলে দলে ইংরাজ আসিতেছে ভারতের সরকারী কাজে।

কিন্তু এই উদ্যোগ আয়োজন অর্থহীন হইবে যদি রেলপথ, রাস্তা ও সড়ক নির্ম্মাণ করিয়া বন্দরের সহিত দেশের অভ্যন্তরভাগ সংযুক্ত করা না যায় এবং বৃটীশ কর্ত্তৃত্বাধীনে ভারতের সর্ব্বত্র একই ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হয়। ভারতে মোটামুটিভাবে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও, দেশের মধ্যে শতাধিক রকমের শাসন ব্যবস্থা ছিল। বণিকের মূলধন লগ্নীর দিক হইতে ইহা নিতান্ত অসুবিধাকর ব্যবস্থা। দেশের প্রতিটি অন্ধিসন্ধিতে অনুপ্রবেশের সুবিধার জন্য তাহার প্রয়োজন গোটা দেশে একই ধরণের আর্থিক বন্দোবস্ত। অতএব রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদীর অনুকূলে গোটা ভারতের অর্থনৈতিক সংহতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হইল।

ডেভিডসন কমিটির রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—গোটা ভারতের স্বার্থের জন্য যখনই দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, বিনা দ্বিধায় তাহারা সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। ১৮৫৮ সালে ভারতে মাত্র কয়েকশত মাইল রেলপথ ছিল। ভারতের সুবিস্তৃত রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য তাহারা প্রয়োজন হইলেই জমি দান করিয়াছে এবং ঐ জমির উপর তাহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী কর্ত্তৃত্ব পরিহার করিয়াছে। সড়ক নির্ম্মাণ ও খাল কাটার জন্যও সহযোগিতার অভাব ঘটে নাই। বহু রাজ্যের

স্বতন্ত্র মুদ্রা ও ডাক ব্যবস্থা ছিল। কেন্দ্রীয় পরিচালনার বিনিময়ে তাহারা নিজস্ব ব্যবস্থা লোপ করিল। সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্য নিজের চৌহদ্দির মধ্য দিয়া মাল চলাচলের উপর কর ধার্য্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রেলপথের প্রসারের ফলে এই ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িল। সামন্ত সমাজও প্রথাটি লোপ করিতে আপত্তি করিল না।

ভিন্ন ভিন্ন শুল্ক ব্যবস্থার দরুণ ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্য যে অসুবিধা ভোগ করিত ১৮৬৩-৬৬ সালে তাহা দূর করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব্বে দেশীয় রাজ্যের সমস্ত বন্দরই শুল্কের দিক হইতে বিদেশী বন্দর বলিয়া গণ্য হইত। ঐ সব বন্দর হইতে ইয়োরোপে প্রেরণের জন্য যে সমস্ত মাল বোম্বাই কি বা বৃটিশ ভারতের অন্য কোন বন্দরে আসিত তাহার উপর আমদানী শুল্ক ধার্য্য করা হইত। বৃটিশ ভারতের রপ্তানীর উপরেও দেশীয় রাজ্যসমূহ শুল্ক ধার্য্য করিত। ১৮৬৫-৬৬ সালে এই ব্যবস্থা রদ করার জন্য কয়েকটি উপকূলীয় রাজ্যের সহিত বন্দোবস্ত করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে একমাত্র কচ্ছ ছাড়া ভারতের উপকূল অঞ্চলের সব কয়টি রাজ্যই বৃটিশ ভারতের সামুদ্রিক শুল্ক ব্যবস্থা মানিয়া নেয়।

লর্ড লিটনের আমলে (১৮৭৬-৮০) রাজপুতানা, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের বহু দেশীয় রাজ্যের সহিত লবণ সম্পর্কে যে চুক্তি করা হয়, অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রধান লবণ-কেন্দ্রসমূহের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যে অবস্থিত। লবণ উৎপাদন এবং তাহা অন্যত্র প্রেরণে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইলে এবং ভালভাবে লবণ কর সংগ্রহ করিতে হইলে দেশীয় রাজ্যের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আবশ্যক। ডেভিডসন কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই সব ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যের নিজস্ব স্বার্থের প্রতি সুবিচার করা না হইলেও, গোটা

ভারতের মঙ্গলের কথা চিন্তা করিয়া তাহারা চুক্তিসর্ত্ত মানিয়া লইতে আপত্তি করে নাই।

সন্ধিচুক্তি ও রাজচক্রবর্ত্তিত্ব

সন্ধি-চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথমে ইংরাজ শক্তির সহিত দেশীয় রাজশক্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইতিহাসের ক্রমবিবর্ত্তনে চুক্তিবদ্ধ পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের এমন পরিবর্ত্তন হইতেছিল যে, কিছুদিনের মধ্যেই বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রে চুক্তি সর্ত্ত অর্থহীন হইয়া পড়িল এবং বৃটিশ রাজশক্তির রাজচক্রবর্ত্তিত্ব ভারতীয় রাজনীতিতে এক নূতন তাৎপর্য্য লাভ করিল।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর এই বিবর্ত্তন দ্রুততর হয়। বিলাতের রক্ষণশীল দল তখন বাদশাহী জাঁকজমকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহের বিশ বৎসর পরেই ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজচক্রবর্ত্তিত্ব ঘোষণা করা হয়। লর্ড বীকনস্‌ফিল্ড আইন পাশ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীকে কাইজার-ই-হিন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ সালে লর্ড লিটন দিল্লীতে এক দরবার আহ্বান করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরীর এই নয়া উপাধির কথা ঘোষণা করেন। এবং এই ঘটনাকে "এক নূতন নীতির" শুভারম্ভ বলিয়া অভিহিত করেন। "এই নীতির ফলে ইংলণ্ডেশ্বর অতঃপর শক্তিশালী দেশীয় অভিজাত সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি ও স্বার্থের সহিত একাত্ম হইবেন।" দেশীয় নৃপতি ও মহাসামন্তগণ দরবারে সমবেত হইয়া রাজপ্রতিনিধির বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজন্য সমাজ কার্য্যতঃ যে বৃটিশ আধিপত্য মানিয়া লইয়াছিলেন দিল্লী দরবারে প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করিতে হইল। সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির সহিত অধীন "দেশীয় অভিজাত সমাজের" স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অভেদাত্মা হইল।

রাজচক্রবর্ত্তিত্বের নূতন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া লর্ড কার্জ্জন ১৯০৩ সালে ভাওয়ালপুরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সব সময়ে সন্ধিচুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে নাই। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এই ব্যবস্থা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।" বস্তুতঃ ভারতীয় রাজশক্তির সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সন্ধিচুক্তির সর্ত্ত উভয়ের চিরস্থায়ী সম্পর্কের নিয়ামক নহে। যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে এই সন্ধি নিষ্পন্ন হইয়াছে সর্ত্তসমূহ তৎকালীন সম্পর্কের স্মারকমাত্র। ভারতীয় ইতিহাস যখনই সেই পর্য্যায় অতিক্রম করিয়াছে, সন্ধিসর্ত্তের তাৎপর্য্য তখনই মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। অধ্যাপক হলের মতে,—"কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছায় নিজের কার্য্যের উপর যে সীমারেখা টানিতে চাহিয়াছেন সন্ধিসর্ত্তসমূহ তাহার স্বীকৃতি বই কিছুই নয়। অবশ্য অনেকগুলি সন্ধিরই মূল উদ্দেশ্য ইহা ছিল না। কিন্তু যখন এই সন্ধি নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার পর ভারতে ইংরাজের রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবস্থা বহুলাংশে বদলাইয়া গিয়াছে ; এবং পরিবর্ত্তিত পরিবেশের দরুণ সন্ধি সর্ত্তের তাৎপর্য্যেরও যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহা যথাযথভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।" অধ্যাপক হল আরও বলেন—সন্ধিসমূহ এই সর্ত্তাধীনেই নিষ্পন্ন করা হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে কিম্বা রাজন্যবর্গের প্রজাদের স্বার্থ-হানিকর কোন গুরুতর অবস্থা দেখা দিলে এই সন্ধিসর্ত্ত লঙ্ঘন করা চলিবে।

স্যার লি ওয়ার্ণার আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতীয় রাজ্যের সহিত যখন সন্ধি ও চুক্তি করা হয় তখন উভয় পক্ষের যে সম্পর্ক ছিল এবং পরে উভয়ের যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে—এই উভয় অবস্থার কথা স্মরণ না করিয়া এই সমস্ত সন্ধিচুক্তির পূর্ণ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। হুইটন বলেন, "যখনই উভয় পক্ষের ঐ সম্পর্ক থাকে না, —এক পক্ষের অবস্থা এমন গুরুতরভাবে বদলাইয়া যায় যে, অপরের

পক্ষে এই পরিবর্ত্তন পূর্ব্বাহ্ণে উপলব্ধি করিয়াও কোন নূতন চুক্তি করা সম্ভব নয় তখন প্রথম পক্ষের আর সন্ধিসর্ত্তের বাধ্য-বাধকতা থাকে না। পেশবার সার্ব্বভৌমত্ব ত্যাগ, দিল্লীর বাদশাহের বিচার, রাজার নিকট কোম্পানীর শাসন হস্তান্তরিতকরণ এবং গায়কোবাড়ের পদচ্যুতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা সন্ধিচুক্তির সমকক্ষতা এবং পারস্পরিকতা জাতীয় শব্দের তাৎপর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে।"

ডাঃ মেহতা সন্ধিচুক্তি বনাম রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, "সন্ধি সম্পর্কে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐগুলি চুক্তিবদ্ধ পক্ষে আপেক্ষিত অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে বাধা দিতে পারে নাই; কিম্বা নূতনতর সম্পর্ক সৃষ্টি রোধ করিতে পারে নাই। কাজেই সন্ধির ব্যাখ্যা কালে যে অবস্থা বিদ্যমান তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই উভয়ের সম্পর্ক বিচার করিতে হইবে,—সন্ধিচুক্তি নিষ্পন্ন করার কালে যে অবস্থা ছিল তাহার ভিত্তিতে নহে"। মিঃ, এন, ডি, বরদাচারিয়ারও এই অভিমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "সন্ধিসমূহকে আইনসঙ্গত অধিকারের উৎস হিসাবে বিচার না করিয়া রাজনৈতিক আচরণের দিগদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।"

ডাঃ মেহতার অভিমত বাস্তব রাজনীতিকের অভিমত। উনবিংশ শতাব্দীতে তৎকালীন ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজ শক্তি কোন দেশীয় রাজ্যের সহিত যদি সমকক্ষ মিত্র হিসাবে সন্ধি করিয়া থাকে, বিংশ শতাব্দীতে তাহার সেই সমকক্ষতা যখন ছিল না তখন তৎকালীন সন্ধিসর্ত্তের ভিত্তিতে অধিকার দাবী করা অর্থহীন। বিংশ শতাব্দীতে রাজচক্রবর্ত্তী প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন। কোথাও রাজ্যের স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরোধের পর রাজ্যশাসন সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হইত; কোথাও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অযাচিত উপদেশ আসিত; আবার কোথাও বা রাজ্যের গোটা শাসন

ব্যবস্থাই ছিল রাজচক্রবর্ত্তীর পূর্ণনিয়ন্ত্রণাধীন। রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে বিভিন্ন স্তরের দেশীয় রাজ্যের পরস্পরের মর্য্যাদার প্রভেদ শেষ পর্য্যন্ত কম-বেশী নিয়ন্ত্রণের তফাতের মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কার্জ্জনের আমলে রাজচক্রবর্ত্তীর আচরণের ফলে সমস্ত দেশীয় রাজ্য একই স্তরে নামিয়া আসে। সমকক্ষ কেহই নহে—সকলেই অধীন।

কার্জ্জনের আমলে রাজন্যবর্গ কোন্ স্তরে উপনীত হইয়াছিল বড়লাটের রোজ-নামচাতেই তাহার হদিস মেলে। সিংহাসন ত্যাগের পূর্ব্বে জনৈক রাজা তাঁহার উত্তরাধিকারীকে উপদেশ দিতেছেন—"আমার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ এই যে, সর্ব্বপ্রযত্নে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগত হইবার চেষ্টা করিও। গবর্ণমেণ্টের নিকট যদি তোমার কোন আবেদন করিতে হয় তবে সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে তাহা নিবেদন করিবে। সর্ব্বক্ষণ রাজচক্রবর্ত্তীর দৃঢ় সমর্থক হিসাবে থাকিবে। ব্যক্তিগত জীবনে এবং সামাজিক জীবনে তোমার দেশ, তোমার ধর্ম্ম এবং তোমার বংশের রীতিনীতি মানিয়া চলিবে এবং শাসন ক্ষমতা গ্রহণের বয়স হইলে যাহাতে তাহার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হও তাহার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা গ্রহণ করিও।" অনামী রাজা পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়া রাজন্য সমাজের অসহায় অবস্থার যে করুণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা রাজচক্রবর্ত্তিত্বের পূর্ণাভিব্যক্তির পরিণতি। কেবল সন্ধি-সর্ত্ত দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না।

১৯২৬ সালে লর্ড রিডিংএর পত্রে অবস্থাটা আরও স্পষ্ট হইল। নিজামের নিকট লিখিত পত্রে তিনি বলেন—"আপনি বলিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতা, হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়েও আপনার সেই ক্ষমতা।......ইহা হইতে প্রতিভাত হয় যে, রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত আপনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনার ভ্রান্ত ধারণা

আছে। রাজপ্রতিনিধি হিসাবে আমার ইহা দূর করা কর্ত্তব্য; কেন না এক্ষণে আমি চুপ করিয়া থাকিলে এই নীরবতাকে পরে সম্মতি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইতে পারে।

"ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির সার্ব্বভৌমত্ব সর্ব্বোচ্চ। সুতরাং দেশীয় রাজ্যের কোন শাসক তাহার সহিত সমপর্য্যায়ে আলোচনা করিবার দাবী করিতে পারে না। এই সার্ব্বভৌমত্ব কেবল সন্ধিচুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে ইহার অস্তিত্ব আছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক এবং পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণের একক অধিকার ছাড়াও গোটা ভারতের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য। অবশ্য দেশীয় রাজ্যের সহিত নিষ্পন্ন চুক্তির মর্য্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করিয়াই তাহাকে ইহা করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার যে অধিকার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আছে তাহা বৃটিশ রাজশক্তির সার্ব্বভৌমত্বের স্বাভাবিক পরিণতির অপর একটি দৃষ্টান্ত।......দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ যে বিভিন্ন ধরণের আভ্যন্তরীণ কর্ত্তৃত্ব ভোগ করেন তাহা রাজচক্রবর্ত্তীর এই দায়িত্বের সর্ত্তাধীন। অন্যান্য বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়......কিন্তু এবিষয়ে আর কিছু বলা প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি না। শুধু আর একটি কথাই বলিব। আপনার যে "বিশ্বস্ত মিত্র" উপাধিটি আছে তাহার দরুণ আপনার গবর্ণমেণ্ট রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনস্থ অন্যান্য রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের চাইতে স্বতন্ত্র কোন পর্য্যায়ে পড়িতে পারে না।"[১]

দেশীয় রাজ্য এবং তাহার "শক্তিশালী অভিজাত সমাজের" পক্ষে বৃটিশ সার্ব্বভৌমত্বের আসল তাৎপর্য্য কি, লর্ড রিডিং-এর পত্রের পর সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

(১) বাটলার কোম্পানীর রিপোর্ট—৫৬-৫৯ পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায়

রাজচক্রবর্ত্তিত্বের প্রকৃতি

অধ্যাপক এস রত্নস্বামী বলিয়াছেন, "রাজচক্রবর্ত্তিত্ব এক অভিনব মৌলিক রাজনৈতিক কল্পনা। অভিজ্ঞতার কারখানায় বৃটিশ উহা গড়িয়া তুলিয়াছে।" এই অভিনব মৌলিক কল্পনার কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। শেষ পর্য্যন্ত ইহা সংজ্ঞাহীনই রহিয়া গিয়াছে। অথচ দেশীয় রাজশক্তির মর্য্যাদা, ক্ষমতা, অধিকার, রাজনৈতিক অস্তিত্ব আসলে যাহাই হউক, সব কিছুই ছিল এই মৌলিক নীতিবাদের উপর নির্ভরশীল।

আন্তর্জ্জাতিক আইন বিশারদ অধ্যাপক ওয়েষ্ট লেক বলিয়াছেন, "বৃটিশ রাজশক্তির একটা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব আছে যাহার ব্যাপ্তি বুদ্ধিমানের মত সংজ্ঞাহীন রাখা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একটা অধীনতার ভাব আছে যাহা সকলে জানে এবং বুঝে কিন্তু বুঝান যায় না। বৃটিশ শক্তির নিরাপত্তা ও ভারতীয় জনগণের স্বার্থ বিপন্ন হইলে সাধারণ নীতি হিসাবে রাজচক্রবর্ত্তী (রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায়) হস্তক্ষেপ করেন। সন্ধির ফলে দেশীয় রাজ্যের সার্ব্বভৌমত্বের যে যে বিষয় অর্পিত হইয়াছে, অথবা সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহা ছাড়াও এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, নীরবে এবং কার্য্যকরীভাবে যাহা তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।" অতঃপর তিনি বলেন, "এইরূপ রাজচক্রবর্ত্তিত্বের বিগুমানতাই তাহার সংজ্ঞা। ভাল হউক মন্দ হউক ইহার সংজ্ঞা দিবার চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু যাহার সীমা নাই তাহাই অসীম। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের যে ক্ষমতা আছে এই

শক্তিকে কেবলমাত্র তাহার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। কেবল নীতিজ্ঞান ও সমীচীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু অপর কোন রাজনৈতিক শক্তি কোন সীমারেখায় ইহার সহিত মোকাবিলা করিতে পারে না, সে সীমান্ত কোন স্থান বা বিষয় যাহারই হউক না কেন।”

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স্ কমিটিও অধ্যাপক ওয়েষ্ট লেকের ব্যাখ্যার কোন উন্নততর পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব অবশ্যই সার্ব্বভৌম থাকিবে। তবে কালের প্রয়োজন এবং দেশীয় রাজ্যের ক্রমিক উন্নতি অনুসারে নিজের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া এবং নিজেকে সুসমঞ্জস করিয়া ইহাকে ইহার দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ভিত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়া কমিটি বলিয়াছেন,—সন্ধি, চুক্তি ও সনদই রাজচক্রবর্ত্তিত্বের বুনিয়াদ। ইহার সঙ্গে আছে রীতি ও সম্মতি, আছে ভারত সরকারের আদেশ ও ভারত সচিবের নির্দ্দেশ। সন্ধি ও চুক্তির বলে রাজচক্রবর্ত্তী যে ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রয়োগ ক্ষেত্র সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু আচরিত রীতির নজীর উপস্থিত করিয়া এবং রাজন্য সমাজের অনুমোদিত না হইলেও তাহাদের মৌন সম্মতি অনুসারে রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষমতা প্রয়োগের যে ক্ষেত্র পাইলেন তাহা অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং ব্যাপক —রাজচক্রবর্ত্তীর অভিপ্রায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল।

কিন্তু স্যার লেসলী স্কট বলিয়াছেন যে, কেবল রীতি দ্বারা দেশীয় রাজ্য এবং বৃটিশ রাজশক্তির মধ্যেকার সন্ধি বা চুক্তির পরিবর্ত্তন ঘটান যায় না। কেননা, কোন চুক্তির পশ্চাতে রীতির প্রশ্ন থাকে না যদি চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সম্মতিক্রমে কোন রীতি গড়িয়া তোলা না হয়। রীতি অর্থে যদি স্বাধীন জাতিসমূহ কর্ত্তৃক সাধারণতঃ

অনুসৃত আচরণ বুঝান হয় তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দেশীয় রাজ্য-সমূহ বৃটিশ রাজশক্তি-রক্ষিত সুতরাং আন্তর্জাতিক কোন রীতি এ ক্ষেত্রে খাটে না। রাজশক্তির সহিত চুক্তিসর্ত্তে দেশীয় রাজ্যসমূহ অপর কোন দেশের সহিত কূটনৈতিক আলোচনা চালাইবার কিম্বা যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অথবা প্রতিবেশী রাজ্যের উপর চাপ দিবার অধিকার ত্যাগ করিয়াছে। রাজ্য, সিংহাসন, পদমর্য্যদা এবং শাসনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষণের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দেশীয় রাজ্যসমূহ তাহাদের পররাষ্ট্রিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ভার রাজচক্রবর্ত্তীর উপর অর্পণ করিয়াছে।" তিনি আরও বলেন, "রাজনৈতিক আচরণকেও বাধ্যতামূলক শক্তি হিসাবে গণ্য করা যায় না। ব্যক্তিগত প্রশ্নের নজীর বা ভারত সরকারের আদেশ আরও দুর্ব্বল যুক্তি। আইনের দৃষ্টিতে সম্মতির যুক্তি রীতির চাইতে এতটুকু সবল নয়।"

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স্ কমিটি স্যার লেসলীর যুক্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিলেও "রাজচক্রবর্ত্তিত্বের আইনগত অবস্থা সবিস্তারে আলোচনা করেন নাই।" রাজচক্রবর্ত্তীর এই ক্ষমতা বস্তুতঃ রাজনৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিছক আইনের দৃষ্টিতে ইহার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। কিন্তু রাজন্য সমাজের নিকট এই অনির্দ্দিষ্ট অবস্থা নিশ্চয়ই অশ্বস্তিকর। কাজেই তাহারা বারে বারেই ইহার সংস্কার জন্য দাবী জানাইয়াছেন। অবশেষে ভারত সচিব কমন্স সভায় (মার্চ্চ ১৯৩৫) সমস্ত তর্কবিতর্কের নিরসন করিয়া বলেন,—"চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দেশীয় রাজ্যের সহিত বৃটিশ রাজশক্তির সম্পর্ক কেবলমাত্র চুক্তিদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নহে। কাজেই দেশীয় রাজ্যের সহিত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে রাজপ্রতিনিধির হস্তে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার থাকা আবশ্যক। রাজপ্রতিনিধির হস্তক্ষেপের অধিকারের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা নির্ণয়ের কোন চেষ্টাই সফল হওয়া সম্ভব নহে।"

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্ কমিটির মতে রাজচক্রবর্ত্তীর কার্য্যকলাপ নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিত :—

(১) বৈদেশিক সম্পর্ক : আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্নে দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারত অভিন্ন ছিল।

(২) আন্তঃরাজ্যিক সম্পর্ক : রাজচক্রবর্ত্তীর অনুমোদন ব্যতীত কোন রাজ্য অপর কোন রাজ্যকে তাহার কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে, বিক্রয় করিতে কিম্বা উহার সহিত বিনিময় করিতে পারিত না।

(৩) দেশরক্ষা ব্যবস্থা : দেশীয় রাজ্যসহ গোটা ভারতের সামরিক রক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল রাজচক্রবর্ত্তীর। কাজেই দেশরক্ষা সংক্রান্ত সর্ব্ব বিষয়েই তাহার অভিমত চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সামরিক আয়োজন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের উপর তাহার একক কর্ত্তৃত্ব থাকা একান্ত আবশ্যক ছিল।

নরেন্দ্র, দেশীয় রাজ্য এবং গোটা ভারতের মঙ্গলের জন্য হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতাও রাজচক্রবর্ত্তীর অন্যতম অধিকার বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। উত্তরাধিকার অনুমোদন সম্পর্কে রাজচক্রবর্ত্তীর অধিকার নরেন্দ্রের মঙ্গলের জন্য হস্তক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিরোধ দেখা দিলে রাজচক্রবর্ত্তীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। দত্তক গ্রহণেও রাজচক্রবর্ত্তীর অনুমোদন আবশ্যক হইত। গোটা ভারতের আর্থিক মঙ্গলের জন্য হস্তক্ষেপের দাবী সব সময় দেশীয় রাজ্যে সমাদর লাভ করে নাই।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্ কমিটি এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কুশাসন, আনুগত্যের অভাব, গুরুতর অপরাধ অথবা কুপ্রথা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। কুশাসনের দরুণ রাজচক্রবর্ত্তীর হস্তক্ষেপের ফল তিন রকম হইতে পারে, যথা সিংহাসনচ্যুতি, ক্ষমতা হ্রাস অথবা তদারককারী অফিসার নিয়োগ।

শেষের দিকে এজন্য কমিশন বসাইয়া তদন্তের ব্যবস্থা করা হইত। আনুগত্যের অভাব ঘটিলেও রাজচক্রবর্ত্তী হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আগাইয়া আসিতেন। কুপ্রথা নিবারণের জন্য হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত সতীদাহ, শিশুহত্যা নিরোধ প্রভৃতি।

শাসকের নাবালকত্বের সময় রাজচক্রবর্ত্তী যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার কোন স্তর পর্য্যন্ত—"রাজচক্রবর্ত্তিত্বের নখর" অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে বাটলার কমিটির নিকট যে অভিমত ব্যক্ত করা হয়, আইনসঙ্গত দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাতে বলা হয় যে, কোন কারণে কোন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা যদি রাজচক্রবর্ত্তীর নিয়ন্ত্রণাধীন হয় তবে ঐ রাজ্য সম্পর্কে তাহার অছির মত আচরণ করা উচিত। গচ্ছিত ধন হইতে লাভ করার চেষ্টা করা অছির পক্ষে সঙ্গত নহে। অভিভাবকের নিস্পৃহ ভাব লইয়াই তাহার কাজ করা উচিত। কিন্তু এসত্ত্বেও ইতিহাস বলে যে, রাজার নাবালকত্বের কালে আলোয়ার ও বিকানীর তাহাদের মুদ্রা ব্যবস্থা হারাইয়াছে, কচ্ছ ও সবন্তবাদীর টাঁকশাল গিয়াছে, পাতিয়ালা ও ঝিন্দ নিজ রাজ্যের মধ্যস্থ রেলপথের উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইয়াছে। ১৯১৭ সালে রাজচক্রবর্ত্তী এই সম্পর্কে যে নীতি নির্দ্ধারণ করেন তাহাতে স্বীকার করা হয় যে, রাজার নাবালকত্বের সময় শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে রাজচক্রবর্ত্তী নিজেকে "দেশীয় রাজ্যের অধিকার, স্বার্থ এবং ঐতিহ্যের অছি এবং রক্ষক হিসাবেই গণ্য করিবেন।" বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম লঙ্ঘনের প্রয়োজন হইতে পারে এই সর্ত্তাধীনে রাজার নাবালকত্বের সময় শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত সাধারণ নীতি নির্দ্ধারণ করা হয়,—শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভার একটি পরিষদের হস্তে অর্পণ করা হইবে। রাজ্যের প্রাচীন রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। রাজ্যের চিরাচরিত

নীতি অবগত হওয়ার জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে নথিপত্র পড়িতে হইবে। শাসন ব্যবস্থায় লোক নিয়োগ করিতে হইলে যে পদে সম্ভব সেই পদেই স্থানীয় লোক নিয়োগের চেষ্টা করিতে হইবে। সন্ধিসর্ত্তের অধিকার কোন ভাবে ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। সন্ধিসর্ত্তের সংশোধন প্রয়োজন হইতে পারে এমন ব্যবস্থাও যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতে হইবে। রাজার নাবালকত্বের সময় কোন রাজ্যাংশ অথবা স্থাবর সম্পত্তি বিনিময় বা বিক্রয় করা কিম্বা হস্তান্তরিত করা চলিবে না। কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীকে দীর্ঘ মেয়াদী বাণিজ্যিক সুবিধা কিম্বা একচেটিয়া অধিকার দেওয়া চলিবে না। রাজার শিক্ষার ব্যবস্থা তদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারেই পরিচালিত হইবে। সাধারণ নিয়ম হিসাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থা ইয়োরোপের পরিবর্ত্তে ভারতে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কোন আইনসঙ্গত নির্দ্দিষ্ট ফরমূলার ভিত্তিতে রাজচক্রবর্ত্তীর নীতি হইতে উদ্ভূত সমস্যার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ওয়েলেসলী, ময়রার আর্ল, ডালহৌসী, ক্যানিং, মেয়ো, কার্জ্জন, লর্ড রিডিং, আরউইন ও লিনলিথ্‌গোর মতামত অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, সবসময় আন্তর্জ্জাতিক আইন বা রাজনৈতিক মতবাদের বাঁধাধরা পথ ধরিয়া তাঁহারা চলেন নাই।

তৎসত্ত্বেও ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজচক্রবর্ত্তীর হস্তক্ষেপে একটা জিনিষের সুনিশ্চিত মৃত্যু ঘটিয়াছে। রাজন্যবর্গ ভগবানদত্ত অধিকারের যুক্তিতে কুশাসন চালাইবার ক্ষমতার যে দাবী করিতেন রাজচক্রবর্ত্তীর খবরদারি ও হস্তক্ষেপে তাহার অবসান হইয়াছে। কালীর সম্মুখে বলি দিবার জন্য জয়ন্তিয়া রাজ্যে ১৮৩২ সালে চারজন বৃটিশ প্রজা হরণ করা হয়। রাজার নিকট অপহৃতদের প্রত্যর্পণের দাবী করা হইলে তিনি তাহা পূরণ করিতে অসমর্থ হন। ফলে তাঁহার সমতল ভূমির রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। কুশাসনের দায়ে ১৮৩০ সালে মহীশুরের

রাজার সমস্ত অধিকার কাড়িয়া রাজ্যটি পঞ্চাশ বৎসর বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। হত্যাকাণ্ড সমর্থনের অভিযোগে টঙ্কের নবাব কিছুটা রাজ্য হারান। লর্ড ক্যানিং ১৮৬০ সালে তাঁহার "মিনিটে" এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "কোন দেশীয় রাজ্যে কুশাসনের দরুণ দেশের কোন অংশে অশান্তি বা অরাজকতা দেখা দিবার আশঙ্কা সৃষ্টি হইলে ভারত সরকার সেই রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনধিকারী নহেন। সঙ্গত কারণ থাকিলে যে কোন রাজ্যের সাময়িক শাসনভারও গ্রহণ করা যায়। এই জাতীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কি না তাহা বিচার করিবার একমাত্র অধিকারী সপরিষদ বড়লাট, অবশ্য পার্লিয়ামেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীনেই তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে।" রাজপুতানার দরবারে লর্ড মেয়ো রাজন্যবর্গকে স্পষ্টই বলেন,— "আমরা যেমন আপনাদের অধিকার ও ক্ষমতাকে সম্মান করি, আপনাদেরও তেমনি উচিত আপনাদের অধীনস্থদের অধিকার সম্মান করা। আপনাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে সাহায্য করিয়া আমরা আপনাদের নিকট সুশাসন ব্যবস্থা আশা করি।" বিখ্যাত "কার্জ্জন সার্কুলারে" বলা হয় যে, বিলাস ব্যসন ও আরামের দিকে শক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত না করিয়া রাজন্য সমাজকে প্রজাদের মঙ্গল এবং শাসনব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। বারম্বার রাজ্য হইতে দূরে থাকিলে, এই অনুপস্থিতিকে কর্ত্তব্যের অবহেলা বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই সার্কুলার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া জনৈক বিশিষ্ট সামন্ত বলেন, "আমরা সকলেই সামন্ত বলিয়া অভিহিত; কিন্তু আমাদের প্রতি মাহিনাকরা ভৃত্যের চাইতেও জঘন্য ব্যবহার করা হয়।"

বেরার সমস্যা সম্পর্কে একটি কমিশন নিয়োগের জন্য নিজাম যে প্রস্তাব করেন, তাহার উত্তরে লর্ড রিডিং তাঁহাকে জানান যে, সম্রাটের

গবর্ণমেণ্ট যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সে সম্পর্কে সালিশ নিয়োগের কোন বিধান নাই। রিডিং-এর এই বিখ্যাত পত্রে আর একবার স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, ভারতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব কেবলমাত্র সন্ধি ও চুক্তির ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার সহিত সম্পর্ক-শূন্যভাবে এবং বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ন্যস্ত ক্ষমতা ছাড়াও এই সার্ব্বভৌমত্বের অস্তিত্ব আছে। "কোন দেশীয় রাজ্যেরই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সমকক্ষ হিসাবে আলোচনা চালাইবার অধিকার নাই"—এই বাস্তব সত্যের উপর জোর দিয়া লর্ড রিডিং তাঁহার পত্রে আরও বলেন যে, "বৃটিশ রাজশক্তির যে সার্ব্বভৌমত্ব রহিয়াছে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাহার অপর একটি দৃষ্টান্ত এবং এই সার্ব্বভৌমত্বের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বারম্বার একথা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গুরুতর কারণ ব্যতীত তাঁহারা এই অধিকার প্রয়োগ করিতে চাহেন না।...... রাজন্যবর্গ বিভিন্ন স্তরের যতটা আভ্যন্তরীণ কর্ত্তৃত্ব ভোগ করেন তাহা রাজচক্রবর্ত্তীর এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতার সর্ত্তাধীন।"

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স্ কমিটি মোটামুটিভাবে লর্ড রিডিংএর মতবাদই সমর্থন করিয়াছেন। রাজন্য সমাজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও "রাজ প্রতি-নিধির হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা সংজ্ঞাহীন" রহিয়া গিয়াছে। সহজ কথায় বলিতে গেলে, যখনই কোন দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত পথে চলে নাই অমনিই রাজচক্রবর্ত্তীর হস্তক্ষেপের অধিকারের প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং রাজনৈতিক বিভাগের অভিপ্রায় অনুযায়ী "অন্যায়ের প্রতিবিধান" করা হইয়াছে। রাজন্য সমাজ অবনত মস্তকে এই নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

পলিটিক্যাল এজেন্ট ঃ

রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অধিকারে বৃটিশ রাজশক্তি সামন্ত রাজ্যে তদারকীর জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক বিভাগের "দালাল" হিসাবে বিভিন্ন রাজ্যে যে সমস্ত পলিটিক্যাল এজেণ্ট বা রেসিডেণ্ট মোতায়েন করা হইত তাঁহারাই একাজ করিতেন। রাইট্ অনারেবল্ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার কোচিন-বক্তৃতায় বলেন যে, "গোপনীয়তা, গোপন ডেসপ্যাট এবং রহস্যময় পত্রাদি প্রেরণ, একই রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদেশ দেওয়া এবং বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন আদেশ ও নির্দ্দেশ দানই গোটা অফিসের গোষ্ঠীর একমাত্র কাজ।"

"রেসিডেণ্ট ও·ক্ষুদে রাজনৈতিক অফিসারদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য প্রথমাবধি ইহাদের এক অভিনব কূটনৈতিক অফিসারের মর্য্যাদা দান করিয়াছিল।" "কোম্পানীর আমলের বাণিজ্যিক রেসিডেণ্টের উত্তরাধিকারী এই অফিসার গোষ্ঠী কোন কালেই তাহাদের বাণিজ্যিক উৎপত্তির প্রভাব ছাড়াইতে পারে নাই।" সেযুগে দেশীয় গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা ধ্বংস করার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বপ্রকার অপচেষ্টা করাই ছিল ইহাদের কাজ। পরবর্ত্তী যুগে এই কর্ত্তব্য খানিকটা রূপান্তরিত হয়। তখন দেশীয় রাজশক্তির অধীনতার নাগপাশকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সাম্রাজ্যবাদের অভীষ্ট পথে তাহাদের পরিচালিত করিতেই ইহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। অযোধ্যার নবাবের সহিত ওয়ারেণ হেষ্টিংসের আচরণ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, নবাবের আস্তাবলের ঘোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনশালার খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়েই রেসিডেণ্ট নাক গলাইতেন।

লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে রাজনৈতিক বিভাগের আরও বিস্তার সাধন করা হয়। মন ষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোন রাজনৈতিক অফিসারদের

কর্ত্তব্য সম্পর্কে যে প্রামাণ্য বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, গুপ্তচরবৃত্তি, দেশীয় রাজার সেনা বাহিনী ও রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে খবরাখবর দেওয়া এবং সামরিক কাজ করা তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য ছিল। রত্নস্বামী ইহাদের "মোটামুটিভাবে রাজদূতের মত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কিন্তু রেসিডেণ্ট ম্যালকমকে তিরস্কার করিয়া ওয়েলেসলী যে পত্র লেখেন তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—"আমার আদেশ মান্য করিয়া চলা এবং আমার নির্দ্দেশ পালন করাই মিঃ ম্যালকমের কর্ত্তব্য।"

প্রথম দিকে সেনাবাহিনীর লোকজনকেই রাজনৈতিক বিভাগের অফিসার পদে নিয়োগ করা হইত। ওয়েলেসলী কোম্পানীর সিভিলিয়ানদের মধ্য হইতে অফিসার নিয়োগের প্রথা পর্য্যন্ত চালু করেন। কোম্পানী যখন দেশীয় রাজশক্তির সহিত অধীন সহযোগীর ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে তখন হইতেই কোম্পানীর "রেসিডেণ্ট মন্ত্রীদের" রূপান্তর ঘটিতে আরম্ভ হয়। বিদেশী গবর্ণমেণ্টের কূটনৈতিক প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে ক্রমেই তাহারা প্রভু-গবর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার শ্রেণীতে পরিণত হন। ১৮১৪ সালে লর্ড হেষ্টিংস্ তাঁহার "প্রাইভেট জার্ণালে" লেখেন—"রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধিতে আমরা তাহাদের স্বাধীন নৃপতি হিসাবেই মানিয়া নেই। অতঃপর আমরা তাহাদের দরবারে রেসিডেণ্ট প্রেরণ করি। রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ না করিয়া এই সব রেসিডেণ্ট অচিরেই ডিক্টেটরের ভূমিকা গ্রহণ করে এবং রাজন্যবর্গের সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে।" হায়দরাবাদের শাসনকার্য্য পরিচালনায় ন্যার চণ্ডুলাল কেবলমাত্র রেসিডেণ্টের আদেশ অনুসারেই চলিতেন। মেকলে কোচিনের রাজাকে লেখেন—'রেসিডেণ্ট কোচিনের নিকট পৌছিলে রাজা যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ করিতে পারেন, তবে তিনি খুসীই হইবেন।'

রত্নস্বামী বলিয়াছেন—বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যের চুক্তির প্রকৃতি অনুসারে রেসিডেণ্টের কর্ত্তব্যের ইতরবিশেষ ঘটিত। কোন দেশীয় রাজ্য যদি ভারত সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতে চাহিতেন, তবে রেসিডেণ্টের মারফতেই সে পত্র পাঠাইতে হইত। ইঁহারা সমস্ত আলাপ আলোচনা চালাইতেন, দরবারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট দিতেন এবং রাজন্যবর্গের শক্তি, সম্পদ ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্ব্বদা সার্ব্বভৌম গবর্ণমেণ্টকে ওয়াকেফহাল রাখিতেন। আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরের কোন কোন বিষয় সম্পর্কে রাজন্যদের অনেক উপদেশ দিতেন,—সময় সময় চাই কি সাহায্যও করিতেন এবং অনুরুদ্ধ হইলে রাজা ও প্রজার অথবা প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত মতবিরোধের মধ্যস্থতাও করিতেন। এ সত্ত্বেও, "এই ইংরাজ অফিসারদের রূঢ় এবং দাম্ভিক আচরণ" সম্পর্কে রাজন্য সমাজের বিভীষিকা কোন কালেই যায় নাই। শেষের দিকে এজেণ্টদের বাহিরের আচরণ খানিকটা মোলায়েম হইলেও তাহাদের গোপন ডেসপ্যাচের বিভীষিকা রাজন্য সমাজকে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। রাজন্য সমাজ মনে করিতেন যে, "অধীন সহযোগিতা" শব্দটির অপব্যাখ্যা করিয়া পলিটিক্যাল এজেণ্টগণ অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজন্য সমাজের নিরাপত্তার একমাত্র পথ এই সর্ব্বেশ্বরের কাছে সর্ত্তহীন আত্মসমর্পণ।

পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিজেকে সর্ব্বেশ্বর মনে করিবেই বা না কেন? সমস্ত বিষয়ে সে ভারত সরকারের তথা রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতিনিধি। ভারত সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন বা প্রতিবাদ করিতে হইলে তাহার মারফতে করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের কোন আইন কানুন তাহার কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাও

কিছু কিছু তাহার ছিল। কোন ইউরোপীয়, ক্ষেত্র বিশেষে বৃটিশ ভারতের কোন প্রজা সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে তাহার অনুমতির প্রয়োজন হইত। তাছাড়া আইন সংক্রান্ত বিষয়েও সে ছিল ভারত সরকারের প্রতিনিধি। একাধারে এত ক্ষমতা থাকায় স্বভাবতই সে মনে করিতে পারে যে, বিনা দ্বিধায় তাহার নির্দ্দেশ পালন করাই অধীন সহযোগীর কর্ত্তব্য, এবং তাহাই অধীন সহযোগিতার অর্থ।

পলিটিক্যাল এজেণ্টের এই অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকার রাজন্য সমাজ হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নাই। ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্ কমিটির সমক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তৎকালীন নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার স্পষ্টই বলেন,—রাজা ও তাহার শাসন ব্যবস্থা পলিটিক্যাল অফিসারের আদেশের অধীন বলিয়া গণ্য করা হয়।······সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে বৃটিশ রাজশক্তি গুরুতর অবিচার ও কুশাসনের ক্ষেত্রে উহা সংশোধনের জন্য দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের অধিকারী, রাজন্যবর্গ একথা স্বীকার করেন। কিন্তু আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, বৃটিশ রাজশক্তির এই দায়িত্বের দরুণ ভারত সরকারের কোন এজেণ্ট নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারী হইতে পারেন না। সয়াজী রাও গায়কোবাড়ের ভাষায়, এই অহেতুক হস্তক্ষেপের পরিণাম স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি আস্থা হ্রাস ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি, রাজার প্রভাবহানি এবং রাজ্য শাসন সম্পর্কে তাহার বীতস্পৃহা বৃদ্ধি। কিন্তু নরেন্দ্র সমাজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অস্তিত্বের শেষ দিন পর্য্যন্ত পলিটিক্যাল এজেণ্ট বরাবর অপার ক্ষমতার অধিকারী রহিয়া গিয়াছে; এবং যখনই এই রহস্যময় সর্ব্বেশ্বরের দপ্তর হইতে আদেশ, নির্দ্দেশ অথবা উপদেশ আসিয়াছে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, রাজন্য সমাজকে আনত শিরে তাহা মস্তকে ধারণ করিতে হইয়াছে।

রাজচক্রবর্তীর সহিত সম্পর্ক :

গোটা ভারতের ভাগ্যবিধাতার সহিত সামন্ত শক্তির সম্পর্ক রাজচক্রবর্ত্তিত্বের হস্তক্ষেপের অধিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে বৃটিশ রাজশক্তি দ্বৈতমর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। সামন্ত রাজ্যের পক্ষে যে শক্তি রাজচক্রবর্ত্তী সেই আবার অবশিষ্ট ভারতের ভাগ্যবিধাতা। অধীন সহযোগীদের সহিত রাজচক্রবর্ত্তীর যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে বৃটিশ রাজশক্তির এই দ্বৈতরূপের তাৎপর্য্য প্রতিফলিত। এই সম্পর্কের রূপ ও প্রকৃতি অনুধাবন করিলে অধীন সহযোগিতার আসল রূপ হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হয়।

বৈদেশিক সম্পর্ক :—আন্তর্জ্জাতিক দিক হইতে দেশীয় রাজ্যের কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা মর্য্যাদা ছিল না। এ বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব গোটা ভারতের সত্তার মধ্যে অবলুপ্ত। আন্তর্জ্জাতিক কারণে দেশীয় রাজ্য ও "বৃটিশ ভারতের" অবস্থা একই এবং উভয় অঞ্চলের প্রজাদের মধ্যেও কোন তফাৎ করা হয় নাই। ভারতের সামন্ত রাজ্যসমূহকে বাহিরের এবং আভ্যন্তরীণ আক্রমণ ও বিপদ হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাজচক্রবর্ত্তীর। দেশীয় রাজ্যের পক্ষে বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং ঐ সম্পর্ক কি হইবে তাহা স্থির করিবার অধিকার এবং দায়িত্বও ছিল তাহারই। মহারাণা গোলাব সিং-এর রুদক বিজয়ের কালে চীন ও তিব্বতের সহিত কাশ্মীর রাজ্যের যে সন্ধি হয়, অতঃপর বৃটিশ রাজশক্তির মাধ্যমেই তাহার বিধান প্রযুক্ত হইত। এই অবস্থায় রাজচক্রবর্ত্তী আন্তর্জ্জাতিক বিষয়ে যদি কোন দায়িত্ব বা বাধ্য-বাধকতা গ্রহণ করিতেন সেই দায়িত্ব পালনে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাই ছিল অধীন সহযোগীর কর্ত্তব্য। নিরপেক্ষতা পালনে রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত সহযোগিতা করা, দাসব্যবসায় নিবারণে তাহাকে

সাহায্য করা এবং কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রজার ক্ষতিসাধন না করা প্রত্যেকটী রাজ্যের অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য ছিল। পলায়িত অপরাধীদের সমর্পণ সম্পর্কে রাজচক্রবর্ত্তী যদি কোন শক্তির সহিত সন্ধি নিষ্পন্ন করিতেন তদনুসারে দেশীয় রাজ্যসমূহকেও নিজ এলাকার বিদেশীদের বাধ্যতামূলকভাবে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করিতে হইত।

অপরাধী প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা :—অবশিষ্ট ভারতের সহিত সামন্ত রাজ্যের পারস্পরিক অপরাধী সমর্পণের বিধিব্যবস্থা বহু সন্ধিচুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পারস্পরিকতার ভিত্তিতে এই বন্দোবস্ত করা হইলেও উভয়ের বাধ্যবাধকতার মধ্যে তাফাৎ ছিল। ভারত সরকার সামন্ত রাজ্যের নিকট যে কোনও শ্রেণীর অপরাধীকে সমর্পণের দাবী করিবার অধিকারী হইলেও, তিনি কয়েকটি শ্রেণীর অপরাধীকে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিতেন। রাজচক্রবর্ত্তীর পক্ষ হইতে এমন দাবীও করা হইয়াছে যে, অপরাধী সমর্পণের সমর্থনে রাজচক্রবর্ত্তী যে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি উপস্থিত করিবেন, রাজনৈতিক অফিসার তাহাতে যদি সন্তুষ্ট হন তাহা হইলেই দেশীয় রাজ্যকে ঐ দাবী অনুযায়ী অপরাধীকে সমর্পণ করিতে হইবে। কর্ণেল নিউ মার্চ্চ গোয়ালিয়র দরবারকে জানান—"আমি যদি সাক্ষ্যপ্রমাণাদি যথেষ্ট মনে করি, অপরাধীকে সমর্পণের পক্ষে এবং বৃটিশ আদালতে তাহার বিচার হইবার পক্ষে সেই অভিমতই যথেষ্ট।"

ভারত সরকার ও দেশীয় রাজ্যের অপরাধী সমর্পণের বন্দোবস্তের মধ্যে এছাড়া আরও কয়েকটি অসুবিধা অনুভূত হইয়াছে। প্রথমতঃ পলিটিক্যাল এজেণ্ট কর্ত্তৃক বিধিমতে পরোয়ানা জারী করা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্রে অপরাধীকে সমর্পণ করা না করা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইম্পিরিয়াল সার্ভিস্ ট্রুপস্ এবং দেশীয় রাজ্যের সেনা বাহিনীর পলাতকদের সমর্পণ সম্পর্কেও পার্থক্য করা হইত। তাছাড়া, বৃটিশ ভারতের গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত অপরাধের ক্ষেত্রে

অভিযুক্তকে দেশীয় রাজ্যের নিকট সমর্পণের যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই, ঠিক সেই জাতীয় অপরাধে অভিযুক্তদের সমর্পণের জন্য দেশীয় রাজ্যের নিকট হামেশা দাবী জানান হইয়াছে এবং সামন্ত শক্তিকে এই দাবী পূরণ করিতে হইত।

দেশরক্ষা :—দেশীয় রাজ্যসহ গোটা ভারতের সামরিক রক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল রাজচক্রবর্ত্তীর এবং দেশরক্ষা সম্পর্কিত সর্ব্ববিষয়ে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। বাটলার কমিটির ভাষায়, ষ্ট্রাটেজিক কারণে সড়ক, রেলপথ, বিমান চলাচল, বন্দর, ডাক-তার-টেলিফোন ও বেতার ব্যবস্থা, ক্যাণ্টনমেণ্ট, দুর্গাদি, সৈন্যচলাচল এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ সরবরাহের যাবতীয় ব্যবস্থা রাজচক্রবর্ত্তীর আয়ত্তাধীনে আনিবার সামর্থ্য তাহার থাকা আবশ্যক।

রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে বারম্বার এই যুক্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে, "রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধান, বিদ্রোহদমন ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার" দায়িত্ব রাজচক্রবর্ত্তীর। সন্ধিচুক্তি ও সনদ হইতে উদ্ভূত চাঁদা ছাড়া দেশরক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিবার কোন বাধ্যবাধকতাই তাহাদের নাই। কিন্তু যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় সামন্ত শক্তির এই দাবী যে কোন কালেই টিকে নাই,—বিনা প্রতিবাদে যে তাহাদের রাজচক্রবর্ত্তীর চাহিদা পূরণ করিতে হইয়াছে ইহা কাহারও অবিদিত নাই। রাজচক্রবর্ত্তীর বিনা অনুমোদনে কোন দেশীয় রাজা অপর রাজ্যের নিকট নিজ রাজ্যের কোন অংশ বিক্রয় বা বিনিময় করিবার অথবা ছাড়িয়া দিবার অধিকারীও ছিলেন না।

যানবাহন ব্যবস্থা :—গোটা ভারতের ষ্ট্রাটেজিক প্রয়োজন ও আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ভারতের রেলপথ নির্ম্মাণে দেশীয় রাজ্যের স্বার্থের প্রতি যে সব সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় নাই, দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই তাহা

সুস্পষ্ট হইবে। প্রথমতঃ গোয়ালিয়র-আগ্রা রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য গোয়ালিয়র দরবারকে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা, বিনামূল্যে জমি ও সাজ-সরঞ্জাম জোগাইতে হইয়াছে। অথচ ঐ রেলপথের অর্দ্ধেকের কম তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রেলপথের ষ্ট্রাটেজিক যোগসাধনের জন্য নিজামকে পূর্ণা হইতে হিঙ্গোলী পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে রাজী করান হয়। পঞ্চাশ মাইল রেলপথ নির্ম্মাণের পর পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হইল। সংশোধিত পরি-কল্পনায় যেমন রেল লাইনের গতিপথ বদলাইয়া গেল, তেমনি রেলের "গেজ" পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করা হইল। ফলে নিজামের এই অসমাপ্ত রেলপথের কোন গতিই হইল না। এই পথ নির্ম্মাণ করিতে যে টাকা বিনিয়োগ করিতে হইয়াছে আজও তাহার শতকরা দুই তিন ভাগের বেশী বছরে আয় হয় না। তবে হোলকার ষ্টেট্ রেলওয়ে যে সর্ত্তে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে ইন্দোর তাহাতে লাভবানই হইয়াছে। ইন্দোর দরবার হইতে শতকরা সাড়ে চার টাকা সুদে এক কোটি টাকা কর্জ্জ করিয়া এই রেলরাস্তা নির্ম্মাণ করা হয়। ইন্দোর দরবার ষ্টেট রেলওয়ের মোট লাভের অর্দ্ধেক অংশীদার। দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতে এই যুক্তি দেখান হয় যে, গোটা ভারতের সংযোগসাধন ও উন্নতি বিধানের জন্য যে রেলপথ বসান হইবে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য দেশীয় রাজ্যকে লাভের ভাগিদার না করিয়া ব্যয়ভার বহনের জন্য সহযোগিতা করার আহ্বান করিবার কোন সঙ্গত যুক্তি নাই।

ডাক ও তার ব্যবস্থা :—পনরটি দেশীয় রাজ্য নিজস্ব ডাকঘরের ব্যবস্থা করিয়াছে। তন্মধ্যে গোয়ালিয়র, চম্বা, ঝিন্দ, নাভা ও পাতিয়ালা রাজ্য ভারত সরকারের ডাক বিভাগের সহিত বন্দোবস্ত মতে উহার সহিত একযোগে কাজ করিত। হায়দরাবাদ, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, জয়পুর, চরখারি, জুনাগড়, কিষণগড়, মেবার, শাহপুর এবং ওরখা রাজ্যের

চিঠি-পত্র বহনের কাজ স্থানীয় পোষ্ট-অফিসই করে। তবে রাজ্যের বাহিরে প্রেরিত চিঠি-পত্রাদি ভারত সরকারের ডাক বিভাগের শাখা অফিসের মারফতে প্রেরণ করিতে হয়। গোয়ালিয়র রাজ্যে ভারত সরকারের পোষ্ট-অফিসসমূহ সাধারণতঃ বৃটিশ কর্ত্তৃত্বাধীন এলাকায়, যথা রেল ষ্টেসন ও রেসিডেন্সী এলাকায় অবস্থিত। গোয়ালিয়রের ডাক টিকেটে ভারতের যত্রতত্র চিঠি-পত্রাদি প্রেরণ করা যায়; কিন্তু ভারত সীমান্তের বাহিরে ঐ টিকেট কার্য্যকরী নহে।

এই পনরটি রাজ্য ছাড়া সমস্ত দেশীয় রাজ্যের ডাক চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারের ডাক বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন। সাতাশটি রাজ্য তাহাদের সরকারী চিঠি-পত্রাদির জন্য বিনা মূল্যে ডাক টিকেট পাইত এবং ভারত সরকারের ডাক বিভাগ বিনামূল্যে ভাওয়ালপুর, বাঙ্গনা পল্লী, ভূপাল, মহীশুর, পদ্দুকোট্টাই ও রেওয়া রাজ্যের সরকারী চিঠি-পত্রাদি বহন করিতেন।

টাঁকশাল ও মুদ্রাব্যবস্থা ঃ—টাঁকশাল ও মুদ্রাব্যবস্থা সার্ব্বভৌমত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। বহু দেশীয় রাজ্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই এই অধিকার ত্যাগ করিয়াছে। হায়দরাবাদ, উদয়পুর ও যোধপুর অদ্যাপিও তাহার নিজস্ব টাকা ও পয়সা তৈরী করে। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে একমাত্র হায়দরাবাদেরই নিজস্ব নোট আছে এবং এই কাগজের মুদ্রা হইতে প্রতি বৎসর তাহার প্রচুর লাভ হয়।

শুল্ক ব্যবস্থা ঃ—দেশীয় রাজ্যে ব্যবহারের জন্য প্রেরিত চিনি, খনিজ তৈল, সূতা, কার্পাস বস্ত্র, দিশলাই, তূলা বা রেশম ছাড়া অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদির পর যে কর ধার্য্য করা হয় তাহাকে প্রকৃতপক্ষে রপ্তানী-শুল্কের পরিবর্ত্তে চুঙ্গি বলিয়াই অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সমস্ত দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করার দরুণ যে আয় হয় দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতে তাহার একটা অংশ দাবী করা হইয়াছে। ভারতীয়

শিল্পের উন্নতির জন্য সহযোগিতা করিতে তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করে নাই; তবে তাহারা এই দাবী করিয়াছে যে, এই সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারণের কালে ব্যবহারকারী ও উৎপাদক হিসাবে তাহাদের স্বার্থ ও মতামতের প্রতি যেন যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সামুদ্রিক শুল্কব্যবস্থা সম্পর্কে ডেভিডসন কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে,—কাথিয়াবাড় ও অন্যান্য রাজ্যের সামুদ্রিক শুল্ক ধার্য্য করার ক্ষমতা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সন্ধি বা চুক্তি হইতে উদ্ভূত হয় নাই। কমিটির মতে এই অধিকার তাহাদের "নিজস্ব সার্ব্বভৌমত্বের" বলেই বিদ্যমান আছে। কেবলমাত্র আর্থিক গুরুত্বের জন্যই এই অধিকার বজায় রাখা হয় নাই; পরন্তু দেশীয় রাজ্যের পরম আদরের বস্তুর (সার্ব্ব-ভৌমত্বের) বাহ্যিক প্রতীক বলিয়াই ইহার জন্য তাহাদের এত ব্যগ্রতা,—এই মন্তব্য করিয়াই কমিটি স্বীকার করিয়াছেন যে, 'কয়েকটি রাজ্যের অস্তিত্বই তাহার বন্দরের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত।' সুতরাং রাজচক্রবর্ত্তী কি কারণে দু'একটি রাজ্যের এই অধিকার মানিয়া লইয়াছেন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির রিপোর্টে বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে বলা হইয়াছে যে—সমুদ্রোপকূলের যে সমস্ত রাজ্যের সামুদ্রিক শুল্ক ধার্য্য করার অধিকার আছে সংগৃহীত শুল্কের সবটা তাহাদের রাখিতে দেওয়া উচিত নহে। যে সমস্ত দ্রব্যের উপর ঐ শুল্ক আছে তাহার যতটা ঐ রাজ্যে ব্যবহৃত হইবে দেশীয় রাজ্যটীকে তদনুপাতিক শুল্ক রাখিতে দেওয়া উচিত—সবটা নহে। কোচিন বন্দরে শুল্ক সংগ্রহের ব্যবস্থা অনেকটা সরল। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও ভারত সরকারের মধ্যে বন্দোবস্ত করিয়া এই সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা করা হইয়াছে।

লবণ কর সম্পর্কেও দেশীয় রাজ্যের সহিত রাজচক্রবর্ত্তীর কতকগুলি চুক্তি হয়। অতি সুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতে লবণের উপর কর

ধার্য্য করার ব্যবস্থা ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ বেষ্টনী ফেলিয়া এই কর আদায়ের এক ব্যয়বহুল ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। ভারত সরকার ১৮৬৯-৭০ সালে সম্বর হ্রদ ক্রয় করিয়া এই জটিল কর আদায়ের ব্যবস্থার অবসান ঘটান। অতঃপর প্রায় পঞ্চাশটি রাজ্যের সহিত এই সম্পর্কে চুক্তি করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রকৃতির কর আদায়ের ব্যবস্থাকে একই ছাঁচে ঢালিয়া সাজা হয়। কাথিয়াবাড় ও কচ্ছে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ভিত্তির উপর এই চুক্তি সম্পন্ন করা হয় এবং ইংরাজ কর্ম্মচারীদের জবরদস্তির দৃষ্টান্তও বিরল নহে। দেশীয় রাজ্যসমূহ এই লবণ চুক্তির সংশোধন দাবী করিয়াছে; কিন্তু রাজচক্রবর্ত্তী তাহার দিকে কর্ণপাত করেন নাই।

নগদ কর ঃ—এক একটি দেশীয় রাজ্য যখনই বৃটিশ শক্তির সহিত সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হইতে লাগিল কোম্পানী তাহাদের বৃটিশ অফিসার নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী পোষণের জন্য রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিতে অথবা নগদ টাকা দিতে বাধ্য করিতে লাগিলেন। সাড়ে পাঁচশতাধিক দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ২১২টি রাজ্য বরাবর রাজচক্রবর্ত্তীকে নিয়মিতভাবে কর দিয়া আসিয়াছে। কোন বাঁধাধরা নিয়মমাফিক এই কর ধার্য্য করা হয় নাই। বৃটিশ রাজশক্তির খেয়াল খুসী অনুসারেই বিভিন্ন সামন্তের উপর ভিন্ন ভিন্ন করভার চাপান হইয়াছে। ডেভিড্‌সন কমিটি নামে সুপরিচিত ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স ইনকোয়ারী কমিটি (আর্থিক) এই করভারকে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন :—

(১) সার্ব্বভৌমত্বের স্বীকৃতির জন্য কিস্তিমতে দেয় কর। সাহায্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তির জন্য দেয় কর ইহার অন্তর্ভুক্ত। বুন্দি, জয়পুর, শিরোহি, কোটা, মহীশুর, পোরবন্দর এবং কোচিন রাজ্য (আংশিকভাবে) যে কর দিত তাহা এই পর্য্যায়ে পড়ে।

(২) রাজচক্রবর্ত্তীকে সামরিক সাহায্যদানের বাধ্যবাধকতার বিনিময়ে যে কর দেওয়া হইত। ভূপাল, ইন্দোর, জাওরা ও দেওয়াস্ রাজ্যের কর এই পর্য্যায়ের।

(৩) কোন রাজ্যে রাজচক্রবর্ত্তী কোন বিশেষ সৈন্যদল মোতায়েন করিলে তাহার জন্য যে টাকা দিতে হইত। ত্রিবাঙ্কুরের কর এই পর্য্যায়ের। এক ব্যাটালিয়ন দেশীয় পদাতিক মোতায়েন রাখার ব্যয়ভার হিসাবে কোচিনকেও টাকা দিতে হইত।

(৪) স্থানীয় সৈন্যদল ও পুলিশ পোষণের জন্য যে টাকা দিতে হইত (যোধপুর, কোটা, টঙ্ক, উদয়পুর, ইন্দোর এবং মধ্য ভারতের কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের দেয় কর); অথবা এজেণ্ট রাখার ব্যয়ভার হিসাবে যে টাকা দিতে হইত (কোলাপুরের কর)।

(৫) কোন নূতন রাজ্য সৃষ্টি, প্রত্যর্পণ, পুনর্ব্বার অনুমোদন কিম্বা রাজ্য বৃদ্ধির জন্য যে কর ধার্য্য করা হইত (বিনিময়ীকৃত ভূমির মূল্য সমীকরণের জন্য অথবা কোন জমি স্থায়ীভাবে দান করার জন্য যে বাৎসরিক টাকা দিতে হইত, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত)। ঝালোয়াড়, লাবা, অজয়গড়, বিহাত, চরখারি, পান্না, ইন্দোর, কচ্ছ, ভবনগর, মণিপুর, কুচবিহার, বেনারস্ ও পাঞ্জাবের কয়েকটি রাজ্যের কর এই পর্য্যায়ের।

(৬) যে কর পূর্ব্বে অন্য রাজ্যকে দেওয়া হইত কিন্তু পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইতেছিল। সাবেক পাওনাদারের স্বত্ব বিলোপ হওয়ায় অথবা তাহার রাজ্য জয় করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কর আদায় করিতে থাকেন।

(৭) সাবেক পাওনাদারের নির্দ্দেশনামা অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে কর পাইতেন। বরোদা, ইন্দোর ও গোয়ালিয়রের সামন্তগণ ইহাদের যে কর দিত, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার মধ্যেও ভাগ বসাইয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শাসন সংস্কারের যুগে

সামন্ত সমাজের সংহতি সাধন :

কার্জ্জনের আমলের "অভিভাবকাধীনতা ও হীনানুগত্যের" যুগের পর সামন্তশক্তির সহিত বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর আচরণ ইংরাজ রাজ-নীতিকের লেখনীতে 'আন্তরিক সহযোগিতার যুগ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কোম্পানীর আমল হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যের পারস্পরিক আলোচনা ও সরাসরি যোগাযোগ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টোর বড়লাটগিরির সময় (১৯০৫—১০) এই চিরাচরিত নীতির পরিবর্ত্তে সহযোগিতামূলক নীতি প্রবর্ত্তন করা হয়। ১৯০৯ সালে লর্ড মিণ্টো এক বক্তৃতায় বলেন,—সাধারণ নির্দ্দেশ জারী করিবার নীতি নিয়ম হিসাবে আমি যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রত্যেকটি সমস্যার গুণাগুণ স্বতন্ত্র পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

চিরাচরিত নীতির পরিবর্ত্তে লর্ড মিণ্টো যে নয়া-নীতি অবলম্বন করেন তাহার পট-ভূমিকাতেই উত্তরকালে শতধাবিচ্ছিন্ন সামন্তশক্তি ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে এক সংহতশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। "সাম্রাজ্যিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এবং দেশীয় রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়" সম্পর্কে রাজন্যবর্গের মতামত জানার জন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১৩ এবং ১৯১৪ সালে যে দুইটি সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাকেই নরেন্দ্র-সমাজের যুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রথম উদ্যোগ বলিয়া অভিহিত করা

স্থায়। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসনকালেও (১৯১৬-২১) নরেন্দ্র-সমাজের এই বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৯১৮ সালে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং রাজন্যবর্গ এক সম্মেলনে ইহার দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯১৯ সালে নরেন্দ্রসমাজকে জানাইয়া দেন যে, তাঁহারা একটি স্থায়ী নরেন্দ্রমণ্ডল গঠন করিতে চাহেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কনটের ডিউক সম্রাটের পক্ষে নরেন্দ্রমণ্ডলের উদ্বোধন করেন। দেশীয় রাজ্যকে পরস্পর' বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার যে নীতি এতকাল অনুসৃত হইয়াছে, নরেন্দ্র পরিষদ গঠনে সুস্পষ্টভাবে তাহাতে ছেদ পড়িল।

সাম্রাজ্যবাদী রাজচক্রবর্ত্তীর বজ্রমুষ্টির করায়ত্ত বিচ্ছিন্ন সামন্ত শক্তিকে ১৯০৯-২১ সালের মধ্যে কেন সুসংহত করার চেষ্টা করা হইল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে নরেন্দ্রমণ্ডলের উত্তরকালের ভূমিকার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। নরেন্দ্রমণ্ডল গঠিত হওয়ায় রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত দেশীয় রাজ্যের সম্পর্কের যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই সম্রাটের (পঞ্চম জর্জ্জ) ঘোষণা বাণীই তাহার সাক্ষী। নরেন্দ্র-মণ্ডলের আলাপ আলোচনার একতেয়ার নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই ঘোষণায় বলা হয়,—"সাধারণতঃ দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে, এবং বৃটিশ ভারতের সহিত অথবা সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত দেশীয় রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার ভাইসরয় দ্বিধাহীনভাবে নরেন্দ্র-মণ্ডলের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়, তাহার শাসনকর্ত্তা কিম্বা আমার গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্যের সম্বন্ধের সহিত ইহার কোনরূপ সম্পর্ক থাকিবে না। এমন কি দেশীয় রাজ্যসমূহের বর্ত্তমান অধিকার এবং তাহাদের কার্য্যের স্বাধীনতাও ইহা দ্বারা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না।"

শতাধিক বৎসরের অধীনতার ফলে বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত সামন্ত সমাজের যে হীনানুগত্যের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, নরেন্দ্র-মণ্ডলের গঠনে তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল না। পূর্ণাভিব্যক্ত রাজচক্রবর্ত্তিত্বের নীতিবাদ, বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা, রাজনৈতিক বিভাগ ও তাহার এজেণ্টের অপার ক্ষমতার ফলে সামন্ত সমাজ যে অসহায় ও করুণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ ঘটিল না। তথাপি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইহাদের এমন এক সময়ে সংহত করা হইল, যখন বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট "সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বৃটিশ ভারতে ধাপে ধাপে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনকেই" তাহার লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৯১৯ সালের আইনের মুখবন্ধ)।

বৃটিশ ভারতে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত ভারতের সংহতি সাধন সাম্রাজ্যিক নীতির দিক হইতে বিশেষ অর্থপূর্ণ। বিশেষতঃ এই সংহতি সাধনের উদ্যোক্তা যখন সাম্রাজ্যবাদী স্বয়ং। নরেন্দ্রমণ্ডল গঠনের উদ্যোক্তা সামন্ত সমাজ নহে। বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তী যেদিন একটি স্থায়ী নরেন্দ্র পরিষদ গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন তাহার দুই বৎসরের মধ্যেই নরেন্দ্রমণ্ডল গঠিত হয়। নিজের গরজেই যে তাহাকে এই চেষ্টায় ব্রতী হইতে হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সামন্ত সমাজ যে যুক্তভাবে কোন একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে বহু বৎসর যাবৎ একথা তাহারা কল্পনাই করিতে পারে নাই। যৌথ অস্তিত্ব সম্পর্কে তাহাদের বোধশক্তি মরিয়া গিয়াছিল। নানা বাধানিষেধ আরোপ করিয়া এই যৌথ চেতনার উৎসমুখ রোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুক্তভাবে কাজ করিবার, এমনকি মিলিত আলাপ আলোচনার সুযোগও তাহাদের দেওয়া হয় নাই। ফলে প্রত্যেক

রাজ্যের চিন্তাধারা হইয়া উঠিয়াছিল আত্মকেন্দ্রিক। কোম্পানীর শোষণের অবসানে বৃটিশ রাজশক্তি ইহাদের যখন গোটা ভারতের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার সহিত বাঁধিয়া দিতেছিলেন, তখনও সকলেই নিজ নিজ লাভ ক্ষতির দিক হইতে এইসব প্রশ্ন বিচার করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও তাহাদের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইতে নিজেদের সংহতি সাধনের বিশেষ কোন চেষ্টা তদ্বির হয় নাই। সামন্ত-ভারতের এই আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর স্বার্থের অনুকূলেই ছিল। তৎসত্ত্বেও হীনানুগত সামন্ত সমাজের সংহতি ও সংহত সহযোগিতার প্রয়োজন কেন সে অনুভব করিয়াছিল তাহার জবাব ১৯০৫-২০ সালের জাতীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির কথা স্মরণ করিলেই পাওয়া যাইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেই ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়। কিন্তু তৎকালীন আন্দোলন ছিল আবেদন নিবেদন সর্ব্বস্ব মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত বিত্তবানদের বিক্ষোভ। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের রোয়েদাদের বিরোধিতার মধ্য দিয়া বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলন নব-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর আসিল তিলকের হোম রুল আন্দোলন (১৯১৬), জালিনওয়ালাবাগ ও খিলাফৎ (১৯১৯-২০)। মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয় আন্দোলনে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমেই ইহার বুনিয়াদ প্রশস্ত, দৃঢ়তর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিল। প্রকাশ্য এই আন্দোলনের সমান্তরালে চলিয়াছে গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। বাঙ্গলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করিয়া এই অগ্নিমন্ত্র সমগ্র উত্তর ভারতের যুবচিত্তে মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টি করিতেছিল। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের সময় অগ্নিমন্ত্রের উপাসকদের সহিত শক্তিশালী বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথাও প্রকাশ পায়। সাম্রাজ্যবাদী প্রমাদ গণিল,—বুঝিল নব জাগ্রত জাতীয়

শক্তির সহিত হিসাব নিকাশের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। তাই একদিকে চলিল বধ বন্ধনের নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা ;—অপর দিকে আরম্ভ হইল ভেদবাদের নূতন খেলা। ১৯০৫-২০ সালের জাতীয় আন্দোলন বৃটিশ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই জাতীয়তা-বাদকে দুর্ব্বল ও বিভক্ত করিবার মানসে শাসন সংস্কারের টোপ ফেলিয়া নরমপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড় করান হইল নরেন্দ্রসমাজকে। যেন কয়েক শত নৃপতি ছাড়া দেশীয় রাজ্যে আর কাহারও কোন অস্তিত্ব নাই। কোম্পানীর আমলে জনসাধারণের চাইতে নরেন্দ্রসমাজই ইংরাজরাজের বিভীষিকা সৃষ্টি করিত বেশী। এই শক্তিকে কঠোর নাগপাশে বাঁধিবার জন্য তখন আপ্রাণ চেষ্টা করা হইয়াছে ; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর নরেন্দ্রসমাজের নিকট ভয় করিবার কিছু ত ছিলই না ; বরং ভরসা করিয়া অনেক কিছুর জন্যই নির্ভর করা চলিত। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে যাহারা ইংরাজরাজের শত্রু ছিল, শতাধিক বৎসরের হীনানুগত্যের ফলে আজ তাহারা সাম্রাজ্যের অন্যতম নির্ভর। শোষণ-জর্জ্জর যে জনশক্তি স্বাধিকার লাভের চেষ্টায় উন্নতশিরে দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইতেছে তাহা সামন্ত সমাজ ও ইংরাজরাজ উভয়েরই শত্রু। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভ এই রাজন্যসমাজকে যদি সামন্ত ভারতের তথা গোটা ভারতের এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে উভয় অংশের জনপ্রতিনিধির শাসনতান্ত্রিক মিলন যেমন কণ্টকিত হয় তেমনি সামন্ত স্বার্থের ধারক হিসাবে এই প্রতিক্রিয়া শক্তির প্রভাব গোটা ভারতের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে অনায়াসেই বিলম্বিত ও বিঘ্নিত করিতে পারে। সামন্ত ভারত ও বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক যোগ সাধনের জন্য সাইমন কমিশন "বৃহত্তর ভারতীয় পরিষদ" গঠনের যে সুপারিশ

করেন, তাহা হইতেই সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ-রাজ গোটা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নরেন্দ্রমণ্ডলকে কিভাবে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রমণ্ডল :

বৃটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইলেও, দেশীয় রাজ্যের শাসন সংস্কারে যুগ কমন্স সভায় মিঃ মণ্টেগুর ভারত সংক্রান্ত ঘোষণার পর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে (২০শে আগষ্ট, ১৯১৭)। মণ্টেগু সাহেবের ঘোষণায় "পর্য্যায়ক্রমে ভারতে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট" গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইলেও, ১৯১৯ সালের আইনের মুখবন্ধে ভারতের স্থলে "বৃটিশ ভারত" কথাটি ব্যবহার করা হইল। দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি তথাকথিত বৃটিশ ভারতের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া "সামন্তভারতকে" এই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

প্রজাদের কথঞ্চিৎ শাসন ক্ষমতা দিবার বাধ্যবাধকতা হইতে সামন্ত সমাজ অব্যাহতি পাইলেও মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে একটি নরেন্দ্রমণ্ডল গঠনের সুপারিশ করা হয় এবং রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী এই পরিষদের উদ্বোধন করা হয়। রাজকীয় ঘোষণায় পুনর্ব্বার বলা হইল—"ভারতের নরেন্দ্রসমাজের অধিকার, মর্য্যাদা, বিশেষ অধিকার চিরকাল অক্ষত রাখার জন্য আমি ও আমার পূর্ব্বগামীদের পক্ষ হইতে বহু উপলক্ষে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—রাজন্যবর্গ এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।" রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত সম্বন্ধেরও যে কোন ইতরবিশেষ ঘটিবে না, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রাজন্য পরিষদের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে স্থির করা হয় যে, ১০৮ জন নরেন্দ্র স্বীয় অধিকার বলে ইহার স্থায়ী সদস্য হইবেন এবং ১২৭টি দেশীয় রাজ্যের নৃপতি ১২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন। এই দুই পর্য্যায়ের দেশীয় রাজ্য ছাড়া তিন শতাধিক ক্ষুদ্র রাজ্যের নরেন্দ্রমণ্ডলে কোনরূপ প্রতিনিধিত্ব থাকিবে না। ভাইসরয় পদাধিকার বলে পরিষদের সভাপতি হইবেন এবং সদস্য নরেন্দ্রগণ প্রতি বৎসর পরিষদের চ্যান্সেলর ও প্রো-চ্যান্সেলর নির্ব্বাচন করিবেন। চ্যান্সেলর ও প্রো-চ্যান্সেলর সহ সাত জন সদস্য লইয়া নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্টাণ্ডিং কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে। ভাইসরয় পরামর্শ গ্রহণের জন্য যে সমস্ত বিষয় কমিটির নিকট পেশ করিবেন, কমিটি কেবল মাত্র সেই সম্পর্কেই তাঁহাকে পরামর্শ দিবেন। দেশীয় রাজ্যসমূহ সাধারণতঃ যে সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে স্বার্থবান, কিম্বা যে সমস্ত প্রশ্ন গোটা সামন্ত-ভারত, অথবা দেশীয় রাজ্য এবং বৃটিশ ভারতের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট,—রাজপ্রতিনিধির বিবেচনার জন্য ষ্টাণ্ডিং কমিটি তৎসমুদয় বিষয় সম্পর্কেও তাঁহাদের মতামত পেশ করিতে পারিবেন।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রাজন্য পরিষদ ও তাহার ষ্টাণ্ডিং কমিটিকে বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তী কার্য্যকরী ক্ষমতাহীন একটি পরামর্শদাতা কমিটি হিসাবেই গড়িয়া তোলেন। কোন বিষয় উপস্থাপিত হইলে ইঁহারা আলোচনা করিতে পারিতেন, পরামর্শ দিতে পারিতেন; কিন্তু সে উপদেশ মানিয়া চলা না চলা রাজচক্রবর্ত্তী তো দূরের কথা সদস্য রাজ্য-সমূহের পক্ষেও বাধ্যতামূলক ছিল না! পরিষদের গঠনতন্ত্রে সুস্পষ্ট-ভাবে বলিয়া দেওয়া হইল, "কোন রাজ্যের সন্ধি ও আভ্যন্তরীণ বিষয়, তাহার অধিকার ও স্বার্থ, মর্য্যাদা ও ক্ষমতা এবং নরেন্দ্রদের বিশেষ অধিকার, ক্ষমতা ও তাহাদের ব্যক্তিগত কার্য্যাবলী" সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করিবার একতেয়ার পরিষদের থাকিবে না। রাজন্য-সমাজ

বা দেশীয় রাজ্যের সহিত রাজপ্রতিনিধির সম্পর্ক ইহা দ্বারা যেমন কোন ভাবে প্রভাবিত হইবে না, তেমনি যে কোন বিষয় সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত যে কোন রাজ্যের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা চালাইবার অধিকারও অক্ষুণ্ণ রহিল। তাছাড়া পরিষদ যে কোন সুপারিশই করুন না কেন, তাহা পালন করা কোনো রাজ্য বা রাজার পক্ষেই যেমন বাধ্যতামূলক নহে, তেমনি এ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণের অথবা তাহাদের স্বতন্ত্র মতামত জ্ঞাপনের অধিকারও পূর্ব্বের মতই রহিয়া গেল। সুতরাং এই দুর্ব্বল পরিষদ কোন কালেই দেশীয় রাজ্যের বিশেষ উপকারে আসে নাই। পরিষদকে রাজন্য-সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়ও মনে করা যায় না। হায়দরাবাদ ও মহীশুর কোন কালেই পরিষদে যোগ দেয় নাই। কয়েকটি বিশিষ্ট রাজ্য প্রথমে যোগদান করিলেও পরে ইহার বৈঠকে যোগদান করে নাই বলিলেই চলে। তাছাড়া, নরেন্দ্রমণ্ডলের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ গোটা রাজন্য-সমাজের মতামতের প্রতিচ্ছবি নহে, উহার অংশবিশেষের অভিমত মাত্র—এমন অভিযোগও করা হইয়াছে। চ্যান্সেলর ও ষ্টাণ্ডিং কমিটির শূন্যপদে নির্ব্বাচন লইয়া মাঝে মাঝে রাজন্যবর্গের মধ্যে যে মন কষাকষি দেখা দিয়াছে তাহার ফলে সংহতির পরিবর্ত্তে নরেন্দ্রসমাজে বিভেদ বাড়িয়াছে,—কোন কোন মহল হইতে এরূপ অনুযোগও শোনা গিয়াছে।

বাটলার কমিটি :

সামন্ত-সমাজের স্বকীয় মর্য্যাদা, অধিকার কিম্বা রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত তাহাদের সম্পর্কের গুরুতর কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্য নরেন্দ্রমণ্ডল সৃষ্টি করা হয় নাই। গোটা ভারতের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে প্রতিক্রিয়াশীল কণ্টক হিসাবেই এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলা হয়

এবং গোলটেবিল বৈঠকে, জয়েণ্ট পার্লিয়ামেণ্টারী কমিটির আলোচনায়, *ক্রিপস্ মিশনের ও মন্ত্রী মিশনের কালে রাজনৈতিক বিভাগের অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদীর অভীপ্সিত এই ভূমিকা নরেন্দ্রমণ্ডল* সুষ্ঠুভাবেই অভিনয় করিয়াছে।

নরেন্দ্রমণ্ডল স্বকীয় মর্য্যাদা ও অধিকারের যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। রাজচক্রবর্ত্তিত্বের কোন সংজ্ঞা না থাকায় রাজন্য সমাজের মধ্যে একটা চাপা অসন্তোষের ভাব বরাবরই ছিল। আভ্যন্তরীণ কর্ত্তৃত্ব সম্পর্কেও তাহাদের অধিকার যে কত দুর্ব্বল ও পরনির্ভরশীল নিজামের নিকট লিখিত লর্ড রিডিংয়ের পত্রে তাহা আর একবার প্রতিপন্ন হইল। ১৯২৭ সালে রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত দেশীয় রাজ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স্ কমিটি নামে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। যুক্তপ্রদেশ ও বার্ম্মার সাবেক লাট এবং বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য স্যার হারকোর্ট বাটলার এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বলিয়া উত্তরকালে এই কমিটি বাটলার কমিটি আখ্যা লাভ করিয়াছে। সন্ধি-চুক্তির বুনিয়াদের উপর নির্ভর করিয়া নরেন্দ্রসমাজের পক্ষ হইতে নিজেদের অধিকার ও রাজচক্রবর্ত্তিত্বের গণ্ডী সম্পর্কে যথেষ্ট ওকালতি করা হইল। স্যার লেসলী স্কটের মত বিশিষ্ট আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া রাজন্যবর্গ বাটলার কমিটির সমক্ষে নিজেদের দাবী জানাইলেন; কিন্তু ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে দেখা গেল, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সংজ্ঞাহীনই রহিয়া গিয়াছে। বাটলার কমিটি ইহার কোন ফরমূলা বাহির করেন নাই বা করিতে পারেন নাই।

রাজচক্রবর্ত্তীর অধিকারের সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্পর্কে বাটলার কমিটি নরেন্দ্রসমাজকে হতাশ করিলেও "ভারতীয় আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল সর্ব্বভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে সামন্ত সমাজের শঙ্কাকে"

যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ গবর্ণমেণ্ট গঠনের পূর্ব্বে সামন্ত *সমাজের সম্মতি লইতে হইবে রাজন্যবর্গের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কমিটির রিপোর্টের ৫৮ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে,*—"সামন্ত রাজ্যসমূহ দাবী করে যে, তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজচক্রবর্ত্তীর অধিকার ও দায়িত্ব এমন কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পণ করা চলিবে না যাহা তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভারতীয় আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল বৃটিশ ভারতের ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের কথা উল্লেখ করা যায়। বৃটিশ ভারতে ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের ন্যায় কোন গবর্ণমেণ্ট যদি গঠিত হয় তবে উহা স্পষ্টতঃই লিখিত শাসনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নূতন গবর্ণমেণ্ট হইবে।......এই সম্পর্কে নরেন্দ্রসমাজের প্রবল শঙ্কার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া আমরা পারি না। আমাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তী ও সামন্তসমাজের সম্বন্ধের ঐতিহাসিক প্রকৃতির কথা বিবেচনা করিয়া ঐ সম্বন্ধকে ভারতীয় আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল বৃটিশ ভারতের কোন নূতন গবর্ণমেণ্টের নিকট নরেন্দ্রসমাজের সম্মতি ব্যতীত হস্তান্তরিত করা উচিত হইবে না।"

রাজচক্রবর্ত্তী বনাম সামন্ত সমাজ, এবং বৃটিশ ভারত বনাম সামন্ত সমাজ,—এই বিষয় দুইটি সম্পর্কে বাটলার কমিটি যে সুপারিশ করেন তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত সম্পর্ক যেমন আছে তেমনি থাকিবে; কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সর্ব্ব-ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ভার রাজন্য-সমাজের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে। এ সম্পর্কে তাহাদের উপর কোন জোর জবরদস্তি করা চলিবে না। ইঁহারা যে বন্দোবস্তে সম্মত হইবেন, বৃটিশ ভারতের সহিত সর্ব্বভারতীয় বিষয়ে সামন্ত-ভারতের সেই সম্পর্কই স্থাপিত হইবে। ভারতে যদি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হয় তবে তাহাকে যেন সামন্ততন্ত্রের ভার বহন করিয়াই চলিতে হয়।

আরও মজার বিষয় এই যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সম্পর্কে বাটলার কমিটি ও রাজন্যসমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক হইলেও, এ বিষয়ে উভয়েই ছিল একমত।

সাইমন কমিশন :

বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ইতিমধ্যে খরস্রোতবেগে আবর্ত্তিত হইতেছিল। শাসন সংস্কারের মুষ্টিভিক্ষায় অসন্তুষ্ট জাতীয়তা-বাদী ভারত একদিকে যেমন পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য ব্যাপক আন্দোলনের দাবী জানাইতেছিল; অপর পক্ষে নরমপন্থী একদল আইন সভায় প্রবেশ করিলেন নয়া শাসন ব্যবস্থাকে ভিতর হইতে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য। ১৯২৪ সালে প্রদেশে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টসহ "ডোমিনিয়ন হোমরুল" প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থীদল পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বরচিত শাসনতন্ত্রের জন্য চাপ দিতে আরম্ভ করিলে পণ্ডিত মতিলাল নয়া শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনার জন্য এক গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইল। তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড্ এই সময়ে লর্ড সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য এক শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের জন্য ভারতীয়দের চ্যালেঞ্জ করিয়া উক্ত খসড়া পরীক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে ভারতবাসীর পক্ষ হইতে নিখিল ভারত সর্ব্বদলীয় সম্মেলন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিলেন এবং পণ্ডিত মতিলালের সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়নের ভার অর্পিত হইল। ১৯২৮ সালের লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে কমিটির খসড়া অনুমোদিত হইলেও একদল মুসলমান এবং কংগ্রেসের ভিতরকার "ইনডিপেণ্ডেন্স গ্রুপ" নেহরু-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে নেহরু-রিপোর্ট সম্পর্কে বহু সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসের চরমপন্থী ও

নরমপন্থীদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করা হইল যে, নেহরু রিপোর্ট গ্রহণ করা হইবে ; কিন্তু ১৯২৯ সালের মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ দিতে অস্বীকার করেন তবে পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতির লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে।

১৯১৯ সালের আইনে প্রতি দশ বৎসর অন্তর শাসন সংস্কার সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিয়োগ করার বিধান ছিল। এই বিধান অনুসারে আর এক মাত্রা শাসন সংস্কার প্রয়োজন হইবে কিনা সে সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৯২৯ সালে কমিশন নিযুক্ত হইবার কথা। কিন্তু বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতি লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯২৯ সালে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করিলেন না। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ষ্টাটুটরী কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হইল এবং প্রারম্ভিক কার্য্যাদির পর ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন ভারতে কাজ করিতে আরম্ভ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একাংশ বরাবরই সাইমন কমিশনের সহিত অসহযোগিতা করিয়াছে। আইনের বিধান অনুসারে কমিশনের তদন্ত বৃটিশ ভারতের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তদন্ত করিতে গিয়া দেখা গেল যে, বৃটিশ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিতে হইলে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সম্পর্ককে বাদ দেওয়া যায় না। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে স্যার জন সাইমন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট লিখিত এক পত্রে দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার অধিকার চাহেন। বাটলার কমিটি ইতিপূর্ব্বে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তদন্ত করিয়াছেন। তৎ সত্ত্বেও বৃটিশ ভারত সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ দেশীয় রাজ্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করিয়া পারে না,—এই যুক্তির বলে সাইমন কমিশন উভয় অংশের ভাবী সম্পর্ক সম্বন্ধে সুপারিশ) করিবার অধিকার

চাহেন। ম্যাকডোনালড্ সাহেব অনুমতি দিলে দেশীয় রাজ্য সাইমন কমিশনের তদন্তের আওতায় আসিল।

বৃটিশ ভারত ও সামন্ত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক যোগ-সাধনের জন্য সাইমন কমিশন যে সুপারিশ করেন, মোটামুটিভাবে তাহা এইরূপ:—প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার সম্প্রসারিত করিয়া কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে কেবলমাত্র আন্তঃপ্রাদেশিক সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরিচালনা ভার রাখিতে হইবে। দেশরক্ষা, যানবাহন, ডাক ও তার ব্যবস্থা, মুদ্রা, শুল্ক, আফিম, লবণ প্রভৃতি বিষয় এই পর্য্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত বিষয় দেশীয় রাজ্যেরও স্বার্থসংশ্লিষ্ট। অতএব বৃহত্তর ভারতীয় পরিষদ (কাউন্সিল অফ্ গ্রেটার ইণ্ডিয়া) নামে একটি পরামর্শদাতা পরিষদ গঠন করিয়া উভয় অংশের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা এই পরিষদ গঠন করা চলে। দেশীয় রাজ্য অথবা বৃটিশ ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে এবং রাজচক্রবর্ত্তীর ক্ষমতা ও তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে পরিষদ কোনরূপ আলোচনা করিতে পারিবে না। পরিষদের আলোচনার অধিকার সম্পর্কে একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিষয় তালিকা স্থির করিতে হইবে। বৃটিশ ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ এবং সামন্ত ভারতের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠন করিতে হইবে। বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের কিছু কেন্দ্রীয় আইন সভা দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, কিছু মনোনয়ন করিবেন বড়লাট। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের কিছু নির্ব্বাচন করিবেন নরেন্দ্রমণ্ডল, বাকী কয়েকজন মনোনয়ন করিবেন বড়লাট। বড়লাট এই পরিষদের সভাপতি হইবেন। সদস্যপদের মেয়াদ হইবে পাঁচ বৎসর। বৃহত্তর ভারতীয় পরিষদ কেবলমাত্র বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিবার অধিকারী হইবেন। তবে তাহার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় আইন সভা ও নরেন্দ্রমণ্ডলকে

জানাইয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা না করা তাহাদের যে কাহারও ইচ্ছাধীন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্যে উপনীত হইবার গোড়াপত্তন হিসাবে সাইমন কমিশন যে সুপারিশ করেন তাহাকে হাতে খড়ির ব্যবস্থা বলা চলে। ভারতের দুইটি শাসনতান্ত্রিক ইউনিটের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের পক্ষে ওকালতি করিয়াও উভয় অংশের সরাসরি যোগসাধনের সুপারিশ করার সাহস কমিশনের হয় নাই। বরং দেশীয় রাজ্যের অনগ্রসর রাজনৈতিক শিক্ষা, তাহার আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব প্রভৃতি যুক্তির অবতারণা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব বিলম্বিত করার চেষ্টাই করা হইয়াছে। একই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় গোটা ভারত গ্রথিত হউক এমন অভিপ্রায়ও কমিশনের ছিল না। এবং সেই জন্যই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা না করা দেশীয় রাজ্যের তথা নরেন্দ্রসমাজের ইচ্ছাধীন রাখা হইয়াছে। নরেন্দ্র সমাজকে নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিভাগের ক্রীড়নক বলা চলে। সুতরাং কোন্ রাজ্য যোগ দিবে বা না দিবে তাহা কার্য্যতঃ রাজনৈতিক বিভাগই স্থির করিয়া দিতেন। তাছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া কমিশন প্রজাদের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। জনপ্রতিনিধিগণ বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিলেও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার দেওয়া হইল নরেন্দ্রসমাজকে। যাহা হউক, পরবর্ত্তী শাসন সংস্কারের মধ্যে সাইমন কমিশনের এই সুপারিশ গৃহীত হয় নাই। তবে, গোটাভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দেশীয় রাজ্যের যোগদান বাধ্যতামূলক করা চলিবে না এবং ইহাতে যোগদানের জন্য কোন রাজ্যের উপর কোনরূপ চাপ দেওয়া চলিবে না বলিয়া বাটলার কমিটি ও সাইমন কমিশন উভয়েই যে সুপারিশ করেন, ১৯৩৫ সালের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে তাহা উপেক্ষা করা হয় নাই।

গোল টেবিল বৈঠক :

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব বহু পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। ১৯২৪ সালে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এইরূপ বৈঠক আহ্বানের কথা উত্থাপন করেন। চরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব কোন দিনই এইরূপ প্রস্তাব আমল দেন নাই। তাঁহারা বরাবর ভারতীয়গণ কর্তৃক শাসনতন্ত্র রচনার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু নরমপন্থী ও মডারেটগণ চরমপন্থীদের এই মনোভাবে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতেন এবং বরাবর গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। তবে ১৯৩০ সালে লণ্ডনে যে গোল টেবিল বৈঠক বসে তাহাকে নরমপন্থীদের দাবীর প্রত্যক্ষ ফল বলা যায় না। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে স্যার জন সাইমন প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাতে গোল টেবিল আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। স্যার জন লেখেন যে, ষ্ট্যাটুটরী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর একটা সম্মেলনের আয়োজন করা আবশ্যক এবং "ঐ সম্মেলনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইয়া চূড়ান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে যত বেশী সম্ভব মতৈক্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে।" প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনালড্ প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলেন এবং ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বসিল। দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতে ১৬ জন সামন্তপ্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

গোল টেবিল বৈঠক আহ্বানের কথা ঘোষিত হইবার পর আশা করা গিয়াছিল যে, ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের ন্যায় শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যেই বৈঠক আহূত হইতেছে। ১৯২৮ সালের ৩১শে অক্টোবর ইণ্ডিয়া গেজেটে লর্ড আরউইনের যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তাহাতে বলা হইল, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি একথা

সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিবার অধিকার পাইয়াছি যে, তাঁহাদের মতে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি এবং ১৯১৭ সালে যে ঘোষণা করা হইয়াছে, এই উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।" বড়লাটের এই ঘোষণা মডারেটদের আশাবাদী করিয়া তুলিলেও জাতীয় কংগ্রেস আরও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি লাভের জন্য তাঁহার নিকট এক পত্র লেখেন। এই পত্রে লেখা হইল—"আমরা মনে করি, কবে ডোমিনিয়ন মর্য্যাদায় পৌছান যাইবে তাহা আলোচনা করার পরিবর্ত্তে ভারতের জন্য ডোমিনিয়ন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহ্বান করা হইতেছে।" বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বা বড়লাট কাহারও নিকট হইতে এই জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া গেল না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ১৯২৯ সালে পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতির লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং গোল টেবিল বৈঠক বয়কট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলনের আহ্বান জানাইল। ইতিমধ্যে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের পীড়নক্লিষ্ট ভারতে কমিশনের রিপোর্ট প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। জাতীয়তাবাদীদের কথা ছাড়িয়া দিলাম, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট মডারেটদের পর্য্যন্ত আশাহত করিল এবং প্রস্তাবিত বৈঠকে তাহাদের যোগদান সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল। কংগ্রেসের যোগদানের আশা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বৃটিশ ভারতের পক্ষ হইতে অন্ততঃ মডারেটগণ যাহাতে বৈঠকে আসেন তাহার জন্য প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনালড্ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কমিশনের রিপোর্টকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হইবে না, এবং সাইমন কমিশনের কোন সদস্য বৃটিশ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

প্রধান মন্ত্রীর এই আশ্বাস মডারেটদের খানিকটা আশ্বস্ত করিল এবং তাঁহারা ভারতীয় প্রতিনিধিদলে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

গোল টেবিল বৈঠকের মোট তিনটি অধিবেশন হয়। ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রথম যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সামন্ত ভারতের পক্ষ হইতে ১৬ জন এবং বার্ম্মাসহ বৃটিশ ভারতের পক্ষ হইতে ৫৭ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৩২ সালের নভেম্বরে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গান্ধীজী দ্বিতীয় বৈঠকে যোগদান করেন। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ তিনটি সম্মেলনেই যোগদান করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যসমূহ কি মনোভাব পোষণ করে সম্মেলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে তাহা বিবৃত করা হয় নাই। লর্ড আরউইনের বিবৃতির পর (অক্টোবর, ১৯২৯) বিকানীরের মহারাজা এক বক্তৃতায় বলেন যে, “ফেডারেশন শব্দটি রাজন্যসমাজে অথবা দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টে কোনরূপ বিভীষিকা সৃষ্টি করে না। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ফেডারেশনই ভারতীয় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান এবং উহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ; তবে অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং উপযুক্ত সময় দেখা দিলেই ফেডারেশন গঠন করা যাইতে পারে।” অবশ্য বিকানীরের মহারাজার এই উক্তিকে গোটা সামন্ত-ভারতের মত বলিয়া তখনও গ্রহণ করা যায় নাই।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের প্রারম্ভিক আলোচনাকালে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদলের পক্ষ হইতে বিকানীরের মহারাজা আবার ঘোষণা করিলেন যে, দেশীয় রাজ্য ও তাহার শাসকবর্গের অধিকার ও বিশেষ অধিকার সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করা হইলে ভারতীয় রাজ্যসমূহ সর্ব্বভারতীয় ফেডারেশনে যোগদান করিতে সম্মত আছে। বিকানীরের মহারাজার এই উক্তি সম্মেলনে খানিকটা আশার

ভাব সৃষ্টি করিলেও, সামন্ত-ভারত যে অকুণ্ঠভাবে ইহা সমর্থন করে না অচিরেই তাহা টের পাওয়া গেল। পাতিয়ালার মহারাজা ও ঢোলপুরের রাণা দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র মহা যুক্তরাষ্ট্র (কন্‌ফেডারেশন) গঠনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফেডারেশন পরিকল্পনার বিস্তারিত আলোচনা কালে ধরা পড়িল যে, বিশেষ অনুকূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা না পাইলে অনেক নৃপতিই যুক্ত-রাষ্ট্রে যোগদান করিতে প্রস্তুত নহেন। ডেভিড্‌সন কমিটি যে আর্থিক বিলি ব্যবস্থার সুপারিশ করেন, তাহা দেশীয় রাজ্যের অনুকূল হইলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্টের সরাসরি কর ধার্য্য করার অধিকার কোন সামন্তই মানিয়া নিতে চাহেন নাই। নিজেদের অধিকার ও বিশেষ অধিকার বিন্দুমাত্র পরিহার করিতেও তাঁহারা নারাজ ছিলেন।

যাহা হউক, তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিলেন এবং ১৯৩৩ সালের ১৮ই মার্চ্চের ঘোষণায় উহা প্রকাশ করা হইল। পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে লর্ড লিনলিথগোর সভা-পতিত্বে এই প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য একটি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হইল। ভারতের প্রতিনিধিদেরও ইহার আলোচনায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইল। বার্ম্মার ১২ জন প্রতিনিধি বাদে ভারতের পক্ষ হইতে যে ২৮ জন প্রতিনিধি কমিটির আলোচনায় যোগদান করেন তন্মধ্যে সাতজন ছিলেন সামন্ত-সমাজের মুখপাত্র। সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হইল। এই কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী কমন্স সভায় একটি বিল উত্থাপন করা হয় এবং দীর্ঘ বিতর্কের পর পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসেই উহা গৃহীত হয়।

১৯৩৫ সালের আইন :

ভারত শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত রাখিয়া ১৯৩৫ সালের আইনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গোটা ভারতকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে গবর্ণর শাসিত প্রদেশ ও চীফ কমিশনার শাসিত অঞ্চলের যোগদান বাধ্যতামূলক হইলেও, সামন্ত ভারত ইহাতে যোগদান করিবে কিনা তাহা দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তার মতামতের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়। দেশীয় রাজ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলা হইল যে, "বৃটিশ ভারতের অংশ নহে এবং বৃটিশ রাজশক্তির অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত যে কোন ভূখণ্ড—তাহা ষ্টেট্, এষ্টেট্, জায়গীর অথবা অন্য যে কোন নামেই বর্ণিত হউক না কেন, তাহাকে দেশীয় রাজ্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।" এবং দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা বলিতে "যে কোন রাজা, চীফ্ অথবা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা বলিয়া অনুমোদিত যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।" কোন শাসনকর্ত্তা তাঁহার নিজের এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী ও উত্তর পুরুষের পক্ষ হইতে যদি এই মর্ম্মে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার রাজ্য ও প্রজাদের সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং সম্রাট সেই ঘোষণা অনুমোদন করেন, তবে সেই শাসনকর্ত্তার রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্ব্বে বা পরে যে কোন সময়েই এই ঘোষণা করা চলিবে। কোন রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলেই যে যুক্তরাষ্ট্রীয় একতেয়ারের সমস্ত ক্ষমতা যোগদানকারী রাজ্যের উপর প্রযোজ্য হইবে তাহা নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ তালিকা করা হয়, বৃটিশ

ভারত সম্পর্কে আইন সভা তাহার সব কয়টি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের অধিকারী হইলেও, যোগদানকারী রাজ্য সম্পর্কে এই অধিকার তাহার থাকিবে কিনা, তাহা নির্ভর করিবে শাসনকর্ত্তার মতামতের উপর। যোগদানকারী রাজ্য সম্পর্কে ফেডারেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের অধিকারভুক্ত কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন, শাসনকর্ত্তাকে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার অধিকারও দেওয়া হয় এবং ইহা কোন্ সর্ত্তাধীন হইবে তাহাও শাসনকর্ত্তা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করার পরে শাসনকর্ত্তাগণ পরবর্ত্তী ঘোষণা দ্বারা ফেডারেল আইন সভার রাজ্য সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যাহাতে বর্দ্ধিত করিতে পারেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোষণায় যে সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে তাহা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে যাহাতে প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারেন তাহার পথও খোলা রাখা হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ ও ফেডারেল এসেম্বলী নামে দুইটি পরিষদ লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থার আইন সভা গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। বৃটিশ ভারতের ১৫৬ জন ও দেশীয় রাজ্যের অনধিক ১০৪ জন প্রতিনিধি লইয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং বৃটিশ ভারতের ২৫০ জন ও দেশীয় রাজ্যের অনধিক ১২৫ জন প্রতিনিধি লইয়া ফেডারেল এসেম্বলী গঠিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে কোন্ রাজ্য কতজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে তাহা স্থির করিতে গিয়া এক দীর্ঘ সিডিউলে বড় বড় রাজ্যের জন্য এককভাবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রদের জন্য যুক্তভাবে প্রতিনিধিত্বের বন্দোবস্ত করা হয়।

বাটলার কমিটি ও সাইমন কমিশন উভয়েই দেশীয় রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান তাহাদের ইচ্ছাধীন রাখিবার পক্ষে সুপারিশ করিয়াছিলেন। এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা না করার

চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকারও দেওয়া হইল শ'পাঁচেক বৃটিশ অনুমোদিত সামন্ত শাসনকর্ত্তাদের। শুধু তাহাই নহে। এই আইনে দেশীয় রাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংস্থায় যোগদানের সর্ত্ত—এমনকি ফেডারেল আইন সভায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার পর্য্যন্ত সামন্ত সমাজের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইল। ইহার অর্থ বৃটিশ ভারতের জনগণ কেবলমাত্র সামন্ত সমাজের সর্ত্তে এবং তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের সহিত একযোগেই গোটা ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারিত। বলা বাহুল্য, বৃটিশ ভারতের জনগণ সাম্রাজ্যবাদীর ঈপ্সিত এই ফাঁদে পা বাড়াইয়া দেশীয় রাজ্যের জনগণকে বাদ দিয়া সামন্ত সমাজের সহিত করমর্দ্দন করিতে রাজী হয় নাই।

আইন প্রবর্ত্তনের সময় যখন আসিল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রথমে আইনের প্রাদেশিক অটোনমীর অংশ কার্য্যকরী করার চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও কংগ্রেস সহ বৃটিশ ভারতের সব কয়টি রাজনৈতিক দলই নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলেন। সাতটি প্রদেশে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়া কংগ্রেস নির্ব্বাচনে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য অর্জ্জন করিল। মন্ত্রিসভা গঠন লইয়া আবার দরকষাকষি আরম্ভ হইল। কয়েকটি প্রদেশে সংখ্যালঘু সুবিধাবাদীদের লইয়া বৃটিশ কর্ত্তারা অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রিসভাও গঠন করিলেন। কিন্তু আইন সভার সম্মুখীন হইবার মত সমর্থন ইহাদের কোন মন্ত্রিসভারই ছিল না। অবশেষে কয়েকটি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি লাভের পর, ১৯৩৭ সালের জুলাই মাস হইতে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিল। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ইহারা শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে। ভারতবাসীর বিনা-সম্মতিতে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করা হইয়াছে এই

অভিযোগের প্রতিবাদে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে তাহারা যুগপৎ পদত্যাগ করিল। যে তিনটি প্রদেশে অন্যান্য দলের মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল তাহারা পূর্ব্ববৎ গদীতে বহাল রহিলেন।

প্রাদেশিক অংশ কার্য্যকরী হইবার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। দেশীয় রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সম্মত না হইলে এই অংশ কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ১৯৩৫ সালের আইনে সুস্পষ্ট বিধান ছিল,—যে সময়ে (১) দেশীয় রাজ্যের অর্দ্ধেক জনসংখ্যায় প্রতিনিধিত্বের অধিকারী এবং (২) প্রস্তাবিত রাষ্ট্রীয় পরিষদে অধিক ৫২ জন প্রতিনিধি মনোনয়ন করিতে পারেন এইরূপ রাজন্যবর্গ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যোগদানে সম্মত হইবেন, তখনই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই দুইটি সর্ত্ত পূর্ণ হইতে পারে এইরূপ সামন্ত নৃপতি কোন কালেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে চাহেন নাই। গোল টেবিল বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে যে উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল ক্রমেই তাহা উবিয়া যাইতে লাগিল। অবশ্য এইরূপ দেশীয় রাজ্য যোগদানে সম্মত হইলেই যুক্তরাষ্ট্র চালু হইত, একথা মনে করিবার কোনই কারণ নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পরিকল্পিত এই অন্তঃসারশূন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে মৌলিক কারণে কংগ্রেসের বিরোধিতা ইহাকে চিরকাল কাগজে কলমের প্রস্তাবাকারে রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

১৯৩৫ সালের ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের বিরোধিতার মূল কারণ এই প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্টের অপ্রতুল ক্ষমতা। ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টসমূহ যে অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন, এই প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও অধিকার তাহার তুলনায় ছিল অকিঞ্চিৎকর। এই সঙ্কীর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে আপত্তির সঙ্গে ছিল

ফেডারেল আইন সভায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংখ্যানুপাতের অধিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিত্বের বিধান সম্পর্কে আপত্তি। কংগ্রেস পক্ষ হইতে দাবী জানান হইল যে, দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতে যে সমস্ত প্রতিনিধি ফেডারেল আইন সভায় আসন গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের সকলকেই জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইতে হইবে। প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কংগ্রেসের এই দাবী সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত সমাজের চক্রান্তের মূলে কুঠারাঘাত করিল। দেশীয় রাজ্যের জনগণকে তাহারা সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে দূরে রাখিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। এই পরিকল্পনা সফল হইলে ভারতের দশ কোটি নরনারীকে যেমন স্বৈরাচারের ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জিত রাখা যাইত,— তেমনি সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে প্রতিক্রিয়ার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জাতীয়তাবাদের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শোপলব্ধির পথ কণ্টকিত করা সম্ভব হইত। রাজন্যবর্গ এবং তাহাদের অনুগ্রহপুষ্ট ভাগ্যান্বেষী সুবিধাবাদীর দল অনায়াসে সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রজীবনে সাম্রাজ্যবাদীর ঈপ্সিত ভূমিকা অভিনয় করিতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইলে এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, কংগ্রেসের বিরোধিতার মুখে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাও ছিল না। আটটি প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেসের করায়ত্ত। এই আটটি প্রদেশের প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা যে কোন সময়েই তাহারা অচল করিয়া দিতে পারিত। কংগ্রেস প্রদেশসমূহ হাইকমাণ্ডের নির্দ্দেশে যদি ফেডারেশনে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিত তবে ইহা চালু হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বস্তুতঃ, ফেডারেল পরিকল্পনাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের ধরনে গড়িয়া না তুলিলে, কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাসমূহ যে

ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিত তাহা একরূপ সুনিশ্চিত। মুসলিম লীগও ফেডারেশনের বিরোধিতা করিয়াছে। তাহাদের বিরোধিতার কারণ ভিন্ন—সর্ব্বভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় হিন্দু প্রাধান্যের কল্পিত শঙ্কা হইতে উদ্ভূত।

গোল টেবিল বৈঠকের সময় রাজন্যসমাজের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে সর্ত্তাধীন উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল ফেডারেল ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কালে ক্রমেই তাহা স্তিমিত হইয়া আসে। বিকানীরের মহারাজা প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে অসতর্কভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন, কোন কালেই তেমন উচ্ছ্বাস ভরা প্রশস্তি আর প্রতিধ্বনিত হয় নাই। মৌখিকভাবে রাজন্যবর্গ কোনকালেই ফেডারেশনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ফেডারেল কাঠামোর অপরিহার্য্য ব্যবস্থা,—ফেডারেল ফিনান্স, ফেডারেল আইন, প্রভৃতি সম্পর্কে লণ্ডনে ও ডেভিডসন কমিটির সহিত অলোচনা কালে ক্রমান্বয়ে ফেডারেশন সম্পর্কে তাহাদের উৎসাহ কর্পূরের মত উবিয়া যাইতে লাগিল। যখন ফেডারেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসিল গোটা রাজন্য সমাজ তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক দেশীয় নৃপতিরও সম্মতি মিলিল না। বড় বড় রাজ্যসমূহ গড়িমসি করিতে লাগিল। নরেন্দ্র সমাজের মধ্যে যাঁহারা 'প্রগতিশীল' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, এবং গোল টেবিল বৈঠকে যাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রাজন্য সমাজের মুখপাত্রগণ নৃপতিদের এই মনোভাবের সমর্থনে তাহাদের "নানা অসুবিধার" কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বহু বর্ষব্যাপী বাধ্যতা-মূলক স্বাতন্ত্র্যের ফলে রাজন্যসমাজের মধ্যে একযোগে কাজ করিবার মত মনোভাব তখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই; তা ছাড়া ফেডারেশনের

আর্থিক ও আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা স্থিতাবস্থা হইতে ভিন্ন ধরণের ; সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে তাহাদের মনে একটা শঙ্কা ও সন্দেহ বিদ্যমান ছিল ইত্যাদি।

কিন্তু গড়িমসির আসল কারণ ইহা নহে। মিঃ উইলিয়ম রয় স্মিথ কথাটা খানিকটা খোলসা করিয়াই বলিয়াছেন—"বংশানুক্রমে রাজ্যশাসনের নিশ্চয়তা বৃটিশ সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। এই সমর্থন প্রত্যাহৃত হইবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ নৃপতি তাঁহাদের শাসনতান্ত্রিক অবস্থান নিরাপদ করিয়া লইতে চাহেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ইহা নিরাপদ করিয়া নিবার জন্য দর কষাকষির ইহাই উপযুক্ত সময়। কেননা, জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যস্থলে তাঁহারা এখন 'ভারসাম্য' হিসাবে অবস্থান করিতেছেন। যখন কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদীদের সহিত মোকাবিলা করিতে হইবে তখন এ সুযোগ থাকিবে না।" সাইমন কমিশনও প্রকারান্তরে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন,—"আমাদের বিশ্বাস, যখন তাঁহারা (রাজন্যবর্গ) বুঝিবেন যে, তাঁহাদের অধিকার ও মর্য্যাদা নিরাপদ হইয়াছে কেবলমাত্র তখনই তাঁহারা বৃহত্তর রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্নিবিষ্ট হইতে সম্মত হইবেন।" বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজন্যবর্গের শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা যথাযথ রক্ষার সুব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় রাজ্য শাসনের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রাজাদের হাতেই রাখা হইয়াছিল। কোন্ সর্ত্তে তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবেন তাহা নির্দ্ধারণের ভারও তাঁহাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় ; দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে কেবলমাত্র রাজাদের অনুগ্রহ ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই যাহাতে ফেডারেল আইন সভায় আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর এই স্নেহের দানও রাজন্যসমাজকে আশ্বস্ত করিতে পারিল না। জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গণ-প্রতিনিধিত্বের দাবী তাহাদের বিশেষ শঙ্কিত করিয়া

তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ কংগ্রেসের এই দাবী সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ত ভারতের গোটা চক্রান্তের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। ১৯৩৫ সালের আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় ভারতের দশ কোটি নরনারীকে রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়া সামন্ত ভারতের সহিত বৃটিশ ভারতের জনগণের যে মিলনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল, কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইত। গণ-প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কংগ্রেস কোন আপোষরফা করিবে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না। এই অবস্থায় রাজন্যবর্গ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রাজন্যবর্গের সর্ত্ত মানিয়া নিলেই তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতেন; কিন্তু কোন গণ-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেই সর্ত্ত মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে। প্রতিটি সামন্ত রাজ্য "প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতার" পোক্ত ঘাঁটি। সামন্ত নৃপতিদের স্বৈরাচারী শাসন ও পীড়নে জনসাধারণ মধ্যযুগীয় দাসের মত জীবন যাপন করে। এই সব বজায় রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করা যদি সম্ভব হইত, রাজন্যবর্গ আপত্তি করিতেন না। কিন্তু স্থিতাবস্থার সব কিছু অটুট রাখিবার প্রতিশ্রুতি লাভের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং টালবাহনা অনিবার্য্য।

১৯৩৭ সালে বড়লাটের অনুরোধে সব কয়টি দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্ত জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৩৯ সালে জানুয়ারী মাসে এই সমস্ত প্রস্তাবের উত্তরে বড়লাট রাজন্য-বর্গের নিকট প্রস্তাবিত এক সর্ত্তপত্র প্রেরণ করেন। জুন মাসে রাজন্যবর্গের এক সভায় বড়লাটের এই প্রস্তাবকে "মূলনীতির দিক হইতে অসন্তোষজনক" আখ্যা দিয়া প্রত্যাখ্যান করা হয়। সর্ত্তপত্র বিবেচনা করার সময় আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

সেপ্টেম্বর মাসেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বড়লাট ঘোষণা করিলেন যে, প্রারম্ভিক কাজকর্ম্ম অনেকটা অগ্রসর হইলেও যুদ্ধারম্ভের ফলে এই উদ্যোগ আয়োজন স্থগিত রাখা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

১৯৩৫ সালের আইনে বৃটিশ-পরিকল্পিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টার এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। এই সমাপ্তিকে অসঙ্কোচে ভ্রূণ-মৃত্যু বলা যায়। ভারতীয় জনগণের পূর্ব্বসম্মতি ব্যতিরেকে ভারতবর্ষকে মহাযুদ্ধে লিপ্ত করায় কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের নির্দ্দেশে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিল। মিত্রপক্ষের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে অসহযোগের নীতি ঘোষণা করা হইল। রাজন্যসমাজ ধন জন ও সম্পদবল লইয়া পুনর্ব্বার রাজসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। গোটা ভারতের সমস্যাকে "কোল্ড ষ্টোরেজে" রাখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নাৎসী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

১৯৪২ সালের ক্রীপস-মিশন

যে ভাবে যুদ্ধের মোড় ঘুরিতে লাগিল তাহাতে বৃটেনের পক্ষে বেশীদিন ভারতীয় সমস্যাকে "কোল্ড ষ্টোরেজে" রাখা সম্ভব হইল না। যুদ্ধারম্ভের এক বৎসরের মধ্যে শেষ বৃটিশ সেনাটি পর্য্যন্ত ইয়োরোপের ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইল। নাৎসী অভিযানের মুখে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ নাৎসী অভিযাত্রী বাহিনীর আক্রমণাশঙ্কায় শঙ্কিত। উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্যিক রক্ষা ব্যবস্থাও নির্ভরযোগ্য নহে। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সাম্রাজ্যিক রক্ষা ব্যবস্থা নিপ্পন বাহিনীর তড়িৎ-আক্রমণে পুতুলের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া

পড়িতে লাগিল। ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটির পতন হয়। ৭ই মার্চ্চ ইংরাজ বাহিনী রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিল। মার্চ্চ মাসের মধ্যেই গোটা মালয় উপদ্বীপ ও বার্ম্মার কতকাংশ জাপানীদের কুক্ষিগত হইল। বিভ্রান্ত পলায়নপর ইংরাজ বাহিনী আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের দুর্গম অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল। ইংরাজের পদার্পণের পর ভারতভূমি এই সর্ব্বপ্রথম আবার জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে বাহিরের আক্রমণাশঙ্কার সম্মুখীন হইল। কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যেকার সম্পর্ক তখন এক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহার কোনটাই আশানুরূপ ফল দিতেছিল না। ভারত যদি আক্রান্তই হয়, ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ হইয়া দেশরক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইবে কি? না, রাজনৈতিক দলসমূহের মতানৈক্য ও গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে ভারতভূমি আক্রমণকারীর সহজ শিকারে পরিণত হইবে। বার্ম্মা ও মালয়ের দৃষ্টান্তে উৎসাহ বোধ করিবার কোন কারণ ছিল না। জনসাধারণের আস্থাভাজন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ আশা করা যাইতে পারে, ইহা তখন সুপরিস্ফুট।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতেও ভারতবর্ষ তখন অসামান্য গুরুত্বলাভ করিয়াছে। জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাইতে হইলে ভারতের ঘাঁটি একান্ত প্রয়োজন। রেঙ্গুন ও বার্ম্মা রোড জাপানীদের করতলগত থাকায় চীনে সাহায্য প্রেরণের কোন পথই ছিল না। একমাত্র ভারতের ঘাঁটি হইতেই চীনকে বিমানপথে সাহায্য করা সম্ভব। ভারতবর্ষই তখন

চীনের সহিত বহির্বিশ্বের যোগাযোগ রক্ষা করার একমাত্র পথ। ভারতের এই সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে অক্ষ-শক্তিও অনবহিত ছিল না। ভারতকে কেন্দ্র করিয়াই তখন আন্তর্জ্জাতিক প্রচারকার্য্য আবর্ত্তিত হইতেছিল। ফলে, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ভারতবাসীর আন্তরিক সাহায্য লাভের জন্য নূতন চেষ্টা না করা—জাতীয়তাবাদী ভারতের মনোভাবকে উপেক্ষা করা, বৃটেনের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। বৃটেনের মিত্রশক্তিগণ, বিশেষ করিয়া যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে বৃটেনের মনোভাব পছন্দ করিতেন না। মিত্র মহলে মুখরক্ষার জন্য, বিশেষতঃ আমেরিকার বিরূপ সমালোচনা স্তব্ধ করার জন্য "কোল্ড ষ্টোরেজের" দ্বার উন্মুক্ত করার প্রয়োজন হইল। ১৯৪২ সালের ১১ই মার্চ্চ প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন, "ভারতীয় সমস্যার ন্যায়সঙ্গত ও চূড়ান্ত সমাধানকল্পে" কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা একমত হইয়াছেন এবং এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মতিলাভের জন্য লর্ড প্রিভিসীল (স্যার ষ্টাফোর্ড) শীঘ্রই ভারতে যাইতেছেন। মিঃ চার্চ্চিলের এই ঘোষণা সর্ব্বত্র বিপুল আশার সঞ্চার করিল। সকলেই মনে করিল, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবার হয়ত আন্তরিক চেষ্টাই করিবেন। দম্ভ ও অহমিকার মোহে যে কোন সঙ্গত যুক্তি বা পরামর্শকে এতকাল যাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই, দেশ, জাতি ও সাম্রাজ্যের চরম বিপদের মুখে তাঁহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইবে, আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করিয়া একথা সকলেই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু স্যার ষ্ট্যাফোর্ড নয়াদিল্লীতে তাঁহার ব্যাগ হইতে যখন যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার ন্যায়সঙ্গত চূড়ান্ত সমাধান প্রস্তাব বাহির করিলেন, আশার-সৌধ শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। দেখা গেল, দেশ ও

জাতির চরম বিপদের দিনেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাম্রাজ্যিক নীতি বদলায় নাই।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সম্মতি লাভের জন্য স্যার ষ্ট্যাফোর্ড যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার যে খসড়া প্রস্তাব লইয়া আসেন তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) যুদ্ধোত্তরকালীন স্থায়ী ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব; (২) যুদ্ধকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব। ভারতকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া খসড়া ঘোষণায় বলা হয় যে, নূতন একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের জন্য যুদ্ধাবস্থা শেষ হইবার অব্যাহিত পরে ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে একটি শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন এই সর্ত্তে :— (১) বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশ যদি এই নয়া শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া তাহার বর্ত্তমান শাসনতান্ত্রিক অবস্থা বজায় রাখিতে চাহে তবে ভবিষ্যতে তাহার যোগদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (২) বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদকে ক্ষমতা হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত বিষয়ের জন্য এক সন্ধি-চুক্তি করিতে হইবে। কোন দেশীয় রাজ্য এই শাসনতন্ত্র মানিতে রাজী হউক কি না হউক নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাহার সন্ধি-সর্ত্তের সংশোধন করিতে হইবে। শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য বৃটিশ ভারতে প্রাদেশিক আইন সভার নিম্ন পরিষদের মারফতে পরোক্ষ নির্ব্বচনের ব্যবস্থা করা হইলেও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য "তাহাদের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নিয়োগের আহ্বান জানাইবার" প্রস্তাব করা হয়। পরিশেষে, যুদ্ধোত্তরকালীন এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হওয়া পর্য্যন্ত ভারত সরকারের সহিত

সহযোগিতা করার জন্য "ভারতের প্রধান প্রধান অংশের নেতৃবর্গকে" আমন্ত্রণ জানান হয়।

যুদ্ধকালীন গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের তাৎপর্য্য কিম্বা তাহার ত্রুটিবিচ্যুতি আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। যুদ্ধোত্তর কালের স্থায়ী সমাধানে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হয় তাহাই আমাদের বিচার্য্য। খসড়া ঘোষণায় দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তিনটি ব্যবস্থা করা হয়;—(১) দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদে যোগদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (২) বৃটিশ ভারতে জনসংখ্যার যে অনুপাতে শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা সেই অনুপাতে নির্দ্ধারিত হইলেও তাঁহারা "মনোনীত প্রতিনিধি" হইবেন এবং বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের সমান অধিকারসম্পন্ন হইবেন; (৩) কোন দেশীয় রাজ্য যদি নূতন শাসনতন্ত্র মানিতে অস্বীকার করে তবে তাহার সহিত যে সন্ধি আছে নূতন পরিস্থিতির দরুণ তাহার সর্ত্ত যথাসম্ভব পরিবর্ত্তন করা হইবে। ১৯৪২ সালের ২৯শে মার্চ্চ সাংবাদিক বৈঠকে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড বলেন,—"দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ কি ভাবে নির্ব্বাচিত হইবে তাহা স্থির করার ভার রাজন্যবর্গের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইবে এই যে, গণ-পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য (বৃটিশ ভারতের) নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইবেন এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য হইবেন দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রতিনিধি।" এই ব্যবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, বর্ত্তমান সন্ধিচুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী তাঁহারা দেশীয় রাজ্যকে গণপরিষদে যোগদানে বাধ্য করিতে পারেন না, কিম্বা একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে তাহাদের প্রতিনিধি ঠিক করিবার পরামর্শ দিতে পারেন না। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের ভাষায়, "বৃটিশ ভারতের

উপর আমাদের যতটা অধিকার আছে দেশীয় রাজ্যের উপর ততটা নাই।”

স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের এই সাফাই ভারতবাসী বিশ্বাস করিতে পারে না। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে যখনই প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সার্ব্বভৌম শক্তি হিসাবে রাজন্যবর্গ সম্পর্কে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই,—এইরূপ নজীরের অভাব নাই। বরং এই কথাই বলা যায় যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্বের নীতি অনুসারে রাজন্য-সমাজ বৃটিশ ভারত অপেক্ষা কার্য্যতঃ কোন দিক হইতেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কম নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন না। এই অবস্থায় দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা,—প্রতিনিধি প্রেরণের পদ্ধতি সম্পর্কে রাজন্যবর্গের নিকট কোনরূপ সুপারিশ করিতে পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিলেন। ক্রীপস্ প্রস্তাবের এই ত্রুটি সম্পর্কে কেবলমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রজাসম্মেলনই প্রতিবাদ জানান নাই,—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবেও এই গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে।

ক্রীপস্ প্রস্তাবে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গণতন্ত্র ও জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-বিরোধী যে প্রস্তাব করা হয়, মূলনীতির দিক হইতে ১৯৩৫ সালের আইনে পরিকল্পিত ফেডারেশনের সহিত তাহার কোন পার্থক্য নাই। ১৯৩৫ সালের আইনের ফেডারেশনে যোগদান করা না করা দেশীয় রাজ্যের যেমন ইচ্ছাধীন ছিল, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ্ কিম্বা তৎপরবর্ত্তী ইউনিয়নে যোগদানও তেমনি দেশীয় রাজ্যের তথা রাজন্য-সমাজের ইচ্ছাধীন রাখা হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার ব্যবস্থায় ফেডারেশনে যোগদানের সর্ত্ত নির্দ্ধারণের ক্ষমতা রাজন্য সমাজকে দেওয়া হইয়াছিল। ক্রীপস্ সাহেবের প্রস্তাবেও এই অধিকার প্রকারান্তরে বজায় রাখা হয়। দেশীয় রাজ্য শাসনতন্ত্র

রচয়িতা পরিষদে যোগদান করিয়াও নয়া শাসনতন্ত্র সম্মত ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার পাইয়াছিল। ফেডারেল ব্যবস্থার বিধিবিধান মনঃপুত না হইলে তাহারা অবশ্যই এ অধিকার প্রয়োগ করিত। সুতরাং ফেডারেল কাঠামোর মধ্যে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে, ফেডারেশন সম্পর্কে তাহাদের সর্ত্ত মানিয়া নিতে হইত। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে উভয় পরিকল্পনাতেই মনোনয়ন ব্যবস্থা মঞ্জুর করা হয়। উভয় পরিকল্পনাতেই দেশীয় রাজ্যের নয় কোটি নরনারীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। সুতরাং যে যুক্তি বলে ফেডারেশন পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হইয়াছে যুদ্ধকালীন বৃটিশ মন্ত্রিসভার স্থায়ী সমাধান প্রস্তাব সম্পর্কেও তাহার সমস্ত যুক্তিই প্রযোজ্য। এ ছাড়া ক্রীপস্ প্রস্তাবের আরও কয়েকটি অনিষ্টকর দিক ছিল। পরে সরিয়া দাঁড়াইবার অবাধ সুযোগ লইয়া সামন্ত স্বার্থের যে সমস্ত প্রতিনিধি প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ আসিতেন স্বভাবতঃই তাঁহারা ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রকে প্রতিক্রিয়াশীল করিবার চেষ্টা করিতেন এবং বৃটিশের সহিত সন্ধি চুক্তির কালে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও বন্ধন যথা সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করিতেন। ইহাদের সংখ্যা শক্তি কম ছিল না। বৃটিশ ভারতের জন্য যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয় তাহার দরুণ এই অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত স্বার্থের এজেণ্টদের বহু বন্ধু জুটিত। এই অবস্থায়, শাসনতন্ত্রে প্রতিক্রিয়ার কীলক ঢুকাইবার পরেও কোন দেশীয় রাজ্য যদি ইউনিয়ন হইতে সরিয়া দাঁড়াইত, কে তাহাকে বাধা দিতে পারিত? ইউনিয়নে যোগদান করিল না এমন রাজ্যের সহিত কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইবে না এমন কথাত' বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বলেন নাই বরং উল্টা কথাই বলা হইয়াছে।

ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২রা এপ্রিল যে সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেন, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত প্রস্তাবের এইরূপ সমালোচনা করা হয়ঃ—"যুদ্ধকালীন বৃটিশ ক্যাবিনেটের নয়া প্রস্তাবে প্রধানতঃ যুদ্ধাবস্থা অবসানের পর ভবিষ্যতের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতে নীতিগতভাবে ভারতীয় জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করা হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়াও কমিটি এই জন্য দুঃখিত যে, নানারূপ সর্ত্ত আরোপ করিয়া ইহাকে জটিল ও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, এবং এমন কতকগুলি সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে যাহার ফলে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন গুরুতরভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। শাসনতন্ত্র-রচয়িতা পরিষদকে যেভাবে গঠন করা হইয়াছে তাহাতে এই পরিষদে অ-প্রতিনিধিমূলক অংশ যুক্ত থাকায় জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার কলুষিত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়াছে এবং কংগ্রেস বারংবার ঘোষণা করিযাছে যে, গোটা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত অপর কোন মর্য্যাদাই স্বীকার করা যায় না এবং উহা দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থার অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনও মিটান সম্ভব নহে। কমিটি উপলব্ধি করেন যে, প্রস্তাবের মধ্যে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার কথা নিহিত থাকিতে পারে; কিন্তু ইহার সঙ্গে যে সর্ত্ত ও বাধা নিষেধ আরোপিত হইয়াছে তাহা এরূপ যে, প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ত কোন কালেই বাস্তব সত্য হইবে না। ভারতীয় রাজ্যের নয় কোটি নর-নারীর অস্তিত্বের অস্বীকৃতি এবং তাহাদের রাজন্যবর্গের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা গণতন্ত্র ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির বিরোধী। শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব জনসংখ্যার অনুপাতে নির্দ্ধারিত হইলেও, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে জনগণের কোনও অধিকার

থাকিবে না। তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কালে কোন অবস্থাতেই তাহাদের সহিত আলোচনা করার ব্যবস্থা নাই। এইরূপ দেশীয় রাজ্য বহুপ্রকারে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রসার ও পরিপুষ্টির বাধা হইতে পারে, বহুপ্রকারে বিদেশী কর্ত্তৃত্ব জীয়াইয়া রাখিতে পারে,—এমন কি এখানে বৈদেশিক সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার সম্ভাবনাও অস্বীকার করা হয় নাই। অতএব এই সব রাজ্য অনায়াসে দেশীয় রাজ্যের জনগণের স্বাধীনতা তথা গোটা ভারতের স্বাধীনতার চিরন্তন বিপদ হইয়া উঠিতে পারে।" ঘোষণায় প্রদেশসমূহকে ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার যে অধিকার দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়, "এই নূতন নীতি অনায়াসেই দেশীয় রাজ্যের ভারতীয় ইউনিয়নে অন্তর্নিবিষ্ট হইবার পথে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।"

নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলের ষ্টাণ্ডিং কমিটি এই সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহাও কংগ্রেস প্রস্তাবেরই অনুরূপ। যুদ্ধকালীন বৃটিশ মন্ত্রিসভার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ষ্টাণ্ডিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়,—'বৃটিশ ক্যাবিনেট এই অদ্ভুত ধারণা লইয়া প্রশ্নটি বিচার করিতেছেন যে, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান সম্পর্কে একমাত্র তাহাদের এবং রাজন্যবর্গের মতামতই সব কিছু। প্রস্তাবের কুত্রাপি দেশীয় রাজ্যের নয় কোটি নরনারীর উল্লেখ করা হয় নাই। এই স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষার দরুণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব অদ্যাপি কিরূপ তাহা উপলব্ধি করা যায়। ইহা দ্বারা দেশীয় রাজ্যের জনগণকে অপমান করা হইয়াছে এবং এইরূপ অবমাননাকর প্রস্তাবকে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বাধা দেওয়া প্রয়োজন।...এই অবস্থায় কমিটির পক্ষে প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। তৎসত্ত্বেও কমিটি

একথা সুস্পষ্ট ভাবে জানাইতে চাহেন যে, এই প্রস্তাব দেশীয় রাজ্য তথা গোটা ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। কমিটি পুনর্ব্বার জানাইয়া দিতে চাহেন যে, ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হইবার কোন অধিকার রাজন্যবর্গ বা বিদেশী কায়েমী স্বার্থের নাই। দেশীয় রাজ্য এবং প্রদেশ উভয় স্থানেই জনগণ সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অপর সমস্ত স্বার্থকেই জনগণের স্বার্থের অধীন হইতে হইবে।' রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতের বহুধা বিভাগের যুক্তি হিসাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও রাজন্যবর্গের যে সন্ধির কথা বলা হয় তৎসম্পর্কে ষ্টাণ্ডিং কমিটি বলেন,—'একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কেবলমাত্র তিরিশ কি চল্লিশটি রাজ্যের সহিত এইরূপ চুক্তি আছে এবং এই চুক্তি সম্পাদনে দেশীয় রাজ্যের জনগণের কোনও হাত ছিল না। যে অবস্থায় বহুপূর্ব্বে এই চুক্তি করা হয়, আজ সেই অবস্থা বিদ্যমান নাই। আজ জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির পথে সেকালের এই সব চুক্তি প্রতিবন্ধক হইবে ইহা অসহ্য। দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের মৌলিক আদর্শ এই যে, বর্ত্তমান সময়কার দেশীয় রাজ্য ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করিতে হইবে এবং দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।'

—'এই প্রস্তাবের কোথাও দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণের উল্লেখ নাই। দুইটি অবস্থায় দেশীয় রাজ্যকে অবশিষ্ট ভারতের সহিত যোগ দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্র রচনার কালে, দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ইউনিয়নের সদস্য পদ গ্রহণের কালে। কোন অবস্থাতেই জনগণের উল্লেখ করা হয় নাই। রাজন্যবর্গকেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের জনগণ প্রতিটি পর্য্যায়ে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির মারফতে তাহাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবী করে।

তাহাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া যদি কোন সিদ্ধান্ত করা হয়, তবে সেই সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে তাহারা বাধ্য নহে।'

মুসলীম লীগ বরাবরই দেশীয় রাজ্যের প্রশ্ন সম্পর্কে "নিরপেক্ষ মনোভাব" অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে বহু মুসলমানও আছে। লীগ হাইকমাণ্ড কোন কালেই তাহাদের সম্পর্কে মাথা ঘামান নাই। ক্রীপস্ প্রস্তাব সম্পর্কে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি যে সুদীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহার মধ্যেও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে লীগের এই মনোভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রস্তাবের চতুর্থ প্যারায় বলা হইয়াছে,—'দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কমিটির সুচিন্তিত অভিমত এই যে, তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিবে কি দিবে না, কিম্বা তাহারা স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন করিবে কিনা তাহা তাহাদেরই বিচার্য্য বিষয়।'

স্থায়ী সমাধান প্রস্তাবের এই দোষত্রুটির জন্যই ক্রীপস্ মিশন ব্যর্থ হইয়াছে একথা বলা যায় না। ১৯৪২ সালের আলোচনায় এই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা এক গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এখনই কি দেওয়া হইতেছে, অর্থাৎ যুদ্ধকালীন গবর্ণমেণ্টকে কি কি ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হইবে তাহা লইয়াই স্যার ষ্ট্যাফোর্ড এবং আজাদ-নেহরুর মধ্যে বেশী আলোচনা চলিয়াছে; এবং এই সম্পর্কে কংগ্রেসের দাবী যদি পূর্ণ করা হইত, তবে স্থায়ী সমাধানের মৌলিক দোষত্রুটি সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারিত। কিন্তু বৃটিশ প্রস্তাবের মধ্যে কোনরূপ সংশোধনের সুযোগ ছিল না। হয় গোটা প্রস্তাব মানিয়া নিতে হইবে, না হয় গোটা প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। কাজেই বৃটিশ প্রস্তাবের ভাগ্যে যাহা ঘটা উচিত তাহাই ঘটিল। ভারতের প্রায় সব কয়টি রাজনৈতিক দলই উহা প্রত্যাখ্যান করিল। এসব সত্ত্বেও একথা দৃঢ় ভাবেই বলা

যায় যে, যুদ্ধোত্তর স্থায়ী সমাধান সম্পর্কে বৃটিশ কোয়ালিশন সরকারের প্রস্তাব ক্রীপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। এই সমাধান প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মতামত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী ভারত এ সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করে, উহার সহিত বৃটিশ সরকারের প্রস্তাবের কি মৌলিক প্রভেদ বিদ্যমান, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে তাহা সুস্পষ্ট।

ক্রীপস্ দৌত্যের ব্যর্থতার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। বৃটিশ ওয়ার ক্যাবিনেটের "সর্ব্বসম্মত খসড়া প্রস্তাব" সাম্রাজ্যবাদীর মনোভাবের দিগ্ দর্শন। ভবিষ্যৎ ভারতকে তাহারা কি ভাবে গড়িতে চাহেন খসড়া প্রস্তাবের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহারা বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহকে বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার দিলেন। রাজন্যবর্গকেও স্বতন্ত্র থাকার সুযোগ দেওয়া হইল এবং নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাহাদের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করার কথা বলা হইল। অন্য কথায়, ভারতের বুকে এক বা একাধিক ইউনিয়ন গঠনের ছিদ্রপথ রাখিয়া একটি মাত্র ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের সদিচ্ছা প্রকাশ করা হইল। সদিচ্ছার অন্তরালে এই শয়তানীর আঁচ পাইয়া মুসলিম লীগ তাহার উল্লাস চাপিয়া রাখিতে পারে নাই। লীগের প্রস্তাবে সোৎসাহে বলা হইল, "ভারতে দুইটি বা ততোধিক স্বাধীন ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ দিয়া পাকিস্তানের সম্ভাবনাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে, কমিটি এজন্য সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া পারেন না।" শুধু পাকিস্তানই নহে—ক্রীপস্ দৌত্য সফল হইলে ভারতবর্ষে একাধিক রাজস্থান, খালিস্থান, অচ্ছুৎস্থান প্রভৃতি অনেক "স্থানই" গজাইতে পারিত। সহজ কথায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবটি এইরূপ :—সকলে শাসনতন্ত্ররচয়িতা পরিষদে মিলিত হও ; সামন্ত শক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি ও অন্যান্য

প্রতিক্রিয়া শক্তির কাছে নতি স্বীকার করিয়া গোটা ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখ, আর না হয় ভারতবর্ষকে শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে দিতে হইবে। এ এক অদ্ভুত ধরণের শাঁখের করাত। উভয় অবস্থাতেই ভারতের সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ চিরস্থায়ী হইত। সামন্ত শক্তি, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়া শক্তির মনোরঞ্জন করিয়া ঐক্যবদ্ধ ভারতের শাসনতন্ত্র যদি রচিত হইত, তবে গোটা ভারতে প্রতিক্রিয়াশক্তি এমন প্রাধান্য বিস্তার করিতে যে, কোন কালেই ভারতের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ও শোষণ বন্ধ করা সম্ভব হইত না। শোষণ-ক্লিষ্ট ভারতীয় জনসাধারণের বুকের জগদ্দল পাথর কতকটা ভিন্নরূপে আগের মতই জাঁকিয়া থাকিত। আর এ যদি সম্ভব না হইত,—ভাবী শাসনতন্ত্রের বিধান যদি সামন্তস্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকতা-বাদীকে সন্তুষ্ট না করিতে পারিত, তবে তাহারা ইউনিয়ন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া বৃটেনের সহিত স্বতন্ত্র সম্পর্ক স্থাপন করিত। ফলে ভারতে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেকগুলি ইউনিয়ন সৃষ্টি হইত এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফলে অনেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্নেহচ্ছায়া তলে আশ্রয় খুঁজিত। সে ক্ষেত্রেও ভারতের দাসত্ব চিরস্থায়ী হইত।

যাহা হউক, ১৯৪২ সালের প্রস্তাব সামন্ত ভারত সম্পর্কে রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদীর শয়তানী চক্রান্ত আরও খানিকটা স্পষ্টতর করিল। ১৯৩৫ সালের প্রস্তাবিত ফেডারেশনে দেশীয় রাজ্য তথা সামন্ত সমাজকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা দেওয়া হইবে এমন কথা বলা হয় নাই। ১৯৪২ সালের প্রস্তাবের মধ্যে তাহার ইঙ্গিত মিলিল; এবং শ্রমিক দল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অংশীদার হিসাবে এই জঘন্য প্রস্তাবে মত দিয়াছিলেন। পরে ১৯৪৬-৪৭ সালে যখন তাহারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিলেন রাজন্য সমাজকে তাহারা আইনতঃ এবং কূটনৈতিক দিক হইতে "স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম" করিয়া দিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সামন্ত ভারতের অভ্যন্তরে

কোম্পানীর আমল হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সামন্ত ভারতের সহিত বৃটেনের রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাস মোটামুটি ভাবে ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে একটি জিনিস খুবই স্পষ্ট যে, ইংরাজশক্তি যে দেশীয় সামন্ত শক্তির বিলুপ্তির মধ্য দিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করে, পরবর্ত্তী যুগে ইংরাজ তাহাদেরই রক্ষাকর্ত্তা হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই সামন্ত শক্তির বিলোপ সাধনে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর এই ক্ষীয়মান রাজ্য গ্রাস করার নীতি সহসা পরিত্যক্ত হয়। এই বিদ্রোহই বিদেশী প্রভুত্বের গতিরোধ করার জন্য দেশের সাবেক শাসক সামন্ত সমাজের সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টা। বিদ্রোহ দমনের পর সামন্ত শক্তিকে বৃটিশ প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে গণ্য করিবার কোন কারণই রহিল না। তৎকালীন প্রগতি শক্তি হিসাবে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সহায়তা করিয়া ছিল জাগ্রত গণশক্তির সম্ভাব্য নূতন নেতা হিসাবে ক্রমে তাহারাই বিদেশী শাসকের সন্দেহ-ভাজন হইয়া উঠিল। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শক্তির পতাকাতলে গণশক্তিকে সংহত করিবার যুগ তখন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন সাম্রাজ্যবাদীর নীতিরও পরিবর্ত্তন ঘটাইল। এই নয়া বিদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে বিদেশী শাসক তখন মিত্র-সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৃটিশ শাসনের বর্ম্ম ও স্তম্ভ হিসাবে নূতন নূতন

সামন্ত শক্তি সৃষ্টির আয়োজন চলিতে লাগিল। যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকে ইংরাজরাজ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছিলেন অতঃপর সেই সামন্ত নৃপতি ও তাহাদের স্বার্থ রক্ষণের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কোম্পানীর আমলে ইংরাজ শক্তি যে আগ্রহ লইয়া সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ক্রমেই তাহা মন্দীভূত হইয়া আসিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বুঝিল যে, রাজত্ব রক্ষা করিতে হইলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে তাহার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন সামাজিক বুনিয়াদ সৃষ্টি করা এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। গোটা ভারতের জন-শক্তি যদি সংহত ভাবে বিদেশী শাসকের সম্মুখীন হইতে পারে তবে এই শাসন ও শোষণ চলিতে পারে না। সুতরাং জন-শক্তির সংহতি নাশের স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীর উপর নির্ভরশীল প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করিতে পারিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই দিক হইতে বিদেশী শাসকের প্রথমেই নজর পড়িল ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের উপর। বৃটিশের সরাসরি কর্ত্তৃত্বাধীন অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদের উপর একান্ত নির্ভরশীল ভূম্যধিকারী ও মহাজন শ্রেণী সৃষ্টি করা হইয়াছিল। রাজন্য সমাজকে দলে টানিয়া গোটা ভারতের শোষণ ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করা হইল।

গোল টেবিল বৈঠকে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদলের উপদেষ্টা অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়মস্ বলেন, "দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ বৃটিশের সহিত তাহাদের সম্পর্কের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। বৃটিশের ন্যায়পরায়ণতা ও অস্ত্রবলের উপর তাহাদের অনেকেরই অস্তিত্ব নির্ভরশীল। অষ্টাদশ শতাব্দী এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের যুদ্ধের সময় ইংরাজ শক্তি যদি ইহাদের সাহায্য না করিত তবে আজ

অনেকেরই অস্তিত্ব থাকিত না। বর্ত্তমান সময়ের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে তাহাদের প্রীতি ও আনুগত্য বৃটেনের পরম সম্পদ। ...... এই সমস্ত সামন্ত রাজ্যের অবস্থা বিশেষ রক্ষাকবচের মত। অনির্ভরযোগ্য এক দেশে ইহারা বন্ধুভাবাপন্ন দুর্গশৃঙ্খলের ন্যায়। শক্তিশালী অনুগত দেশীয় রাজ্যসমূহ থাকায় বৃটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সারা ভারতকে আন্দোলিত করিতে পারিবে না।" (আর, পি, দত্ত, ইণ্ডিয়া টু-ডে: পৃঃ ৩৫৯-৬০)। অতএব বৃটিশ রাজশক্তি কেন এই সামন্ত সমাজকে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর নহে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রচারকদল বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়াই বিদেশী শাসক ইহাদের নিশ্চিহ্ন করে নাই। ইহা আদৌ সত্য নহে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর প্রয়োজনেই ইহাদের অস্তিত্ব আছে, এবং সাম্রাজ্যিক স্বার্থে যতটুকু প্রয়োজন কেবলমাত্র ততটুকু ক্ষমতা ইহাদের হাতে রাখিয়া বাকী আর সব কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছে। ভারতে বিদেশী বুর্জ্জোয়া শাসন বজায় রাখার জন্য সামন্ততান্ত্রিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিক্রিয়া শক্তির সমর্থন আবশ্যক বলিয়াই ভারতের রাষ্ট্রজীবনে অদ্যাপি এই মৃত-যুগের কলঙ্কচিহ্ন অবশিষ্ট আছে। ছি-আশী বছর পূর্ব্বের কার্ল মার্কস্ বলিয়াছিলেন, 'যেদিন ইহারা (দেশীয় রাজ্য) কোম্পানীর অধীন অথবা উহা দ্বারা রক্ষিত হইল, সেইদিনই ষ্টেট হিসাবে কার্য্যতঃ ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইল।...যে সর্ত্তে তাহাদের বাহ্যিক স্বাধীনতা বজায় রাখিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত ধ্বংসের সর্ত্ত। ...... অতএব আজিকার আসল সমস্যা 'দেশীয় রাজ্য' রক্ষার সমস্যা নহে, ইহা 'রাজন্যবর্গ ও তাহাদের রাজদরবার' বজায় রাখার প্রশ্ন। রাজন্য সমাজ বর্ত্তমান যুগের নিন্দনীয় বৃটিশ ব্যবস্থার

শক্ত ঘাঁটি এবং ভারতের অগ্রগতির প্রধানতম বাধা।' (ইণ্ডিয়া, টু-ডে পৃঃ ৩৫৭)।

প্রগতি শক্তির সহিত সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রাম যতই তীব্র হইতে লাগিল,—জনশক্তির চাপে সাম্রাজ্যবাদী যখন পিছু হটিতে বাধ্য হইতেছিলেন, তখন রাজনৈতিক ক্ষমতাহীন এই মৃতযুগের জীবাশ্মের প্রশ্ন তুলিয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের অগ্রগতিকে কতভাবে ব্যাহত ও কণ্টকিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে, বর্ত্তমান শতাব্দীর ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

১৯২৯ সালে বাটলার কমিটি "বিদ্রোহ ও বিপ্লবের" কবল হইতে রাজন্য সমাজকে রক্ষার করার পবিত্র দায়িত্বের কথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন, "দেশীয় রাজ্যসমূহকে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের কবল হইতে রক্ষা করার সে দায়িত্ব সার্ব্বভৌম শক্তির রহিয়াছে তাহা সন্ধি ও সনদের সর্ত্ত এবং সম্রাটের প্রতিশ্রুতি হইতে উদ্ভূত...রাজন্য সমাজের অধিকার ও মর্য্যাদা অক্ষতভাবে বজায় রাখার জন্য সম্রাট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহার মধ্যে নরেন্দ্র সমাজকে নিশ্চিহ্ন করার এবং অপর কোনরূপ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রাজন্য সমাজকে সাহায্য করার দায়িত্বও নিহিত আছে।"

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কোন কালেই এই পবিত্র দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হন নাই। কিন্তু এই ক্রীড়নকদের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবে বৃটিশ শক্তি পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় "বর্ত্তমান দুনিয়ার সব চাইতে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।" দেশীয় রাজ্যের অতীত ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার আত্মজীবনীতে বলিয়াছেন:—ইহারা অবশ্যই বৃটিশ সার্ব্বভৌমত্বের অধীন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র তাহাদের স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থসাধনের জন্যই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও প্রাচীন জগতের এই সামন্ততান্ত্রিক ঘাঁটিসমূহ এত কম সংস্কার সাধন

করিয়াছে যে, তাহা দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্থির ও অচঞ্চল, স্রোতোবেগ মন্থর। গতিশীলতা ও পরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত যে কোন নবাগত এখানে নিদ্রালুতায় আড়ষ্ট হইয়া আসিবে। অজ্ঞাতে তাহার প্রাণের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া পড়িবে। মনে হইবে এ বুঝি মায়া ;—চিত্রপটের মত সময় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং বারম্বার একই অপরিবর্ত্তনীয় দৃশ্য চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। অনেকটা অজানিতে তাহার মন সুদূর অতীতে চলিয়া যাইবে। ছেলেবেলার স্বপ্নের কথা মনে পড়িবে। মানস চক্ষে ভাসিয়া উঠিবে বর্ম্মাচ্ছাদিত বীর ও সুন্দরী বীরাঙ্গনার ছবি, ভাসিয়া উঠিবে গগনস্পর্শী কেল্লার ছবি,—মনে পড়িবে বাস্তবমর্য্যাদাহীন দুরন্ত সাহসিকতা, আত্মমর্য্যাদা বোধ ও গরবের কথা, মৃত্যুভাবনাহীন বিস্ময়কর বীরত্বকাহিনী। বিশেষতঃ নবাগত যদি রাজপুতানায় যায়…… ।"

—"কিন্তু এই দৃশ্য মিলাইয়া যায়।—এক বেদনাময় অনুভূতি হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে কষ্টবোধ হয়। এই অচঞ্চল কিম্বা মন্থরগতি জলরাশির তলদেশ স্থির,—বদ্ধজলার মত। দেহমন যেন সব দিক হইতে আড়ষ্ট হইয়া আসে। জনগণের চরম অনগ্রসরতা ও দুঃখদুর্দ্দশার পার্শ্বে রাজপ্রাসাদের চোখ-ধাঁধান জৌলুস এক বিস্ময়কর দৃশ্য। রাজা ও রাজপরিবারের প্রয়োজন ও বিলাসব্যসনের জন্য রাজ্যের কত ধনসম্পদ ঐ প্রাসাদের মধ্যে চলিয়া যায় ; আর জনকল্যাণের জন্যই বা কতটুকু অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু ইহাদের জন্য এই যে বেহিসাবী খরচ করা হইতেছে তাহার প্রতিদানে ইহারা কি দেয় ?"

—"এক বিস্ময়কর কুহেলিকা এই দেশীয় রাজ্যসমূহকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিলে এখানে উৎসাহ লাভের আশা নাই ; বড় জোর একখানা সাহিত্য-বিষয়ক

অথবা আধা সরকারী সাপ্তাহিক বাহির করা যাইতে পারে। বাহিরের সংবাদপত্রের প্রবেশও প্রায়শঃই নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি রাজ্যে ছাড়া সর্ব্বত্রই অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্নের সংখ্যা নগণ্য। দাক্ষিণাত্যের এই কয়েকটি রাজ্যে শিক্ষিতের শতকরা গড় বৃটিশ ভারতের চাইতে অনেক বেশী। দেশীয় রাজ্য হইতে প্রধানতঃ তিন প্রকারের সংবাদ পাওয়া যায়,—বড়লাট যখন রাজ্য পরিদর্শনে যান তখনকার জাঁকজমক, অনুষ্ঠানাদি এবং পারস্পরিক গুণগানের বিবরণ, রাজার জন্মতিথি উৎসব কিম্বা বিবাহের ব্যয়বাহুল্যের ফিরিস্তি কিম্বা কিষাণ বিদ্রোহের কাহিনী। বিশেষ আইন পাশ করিয়া রাজাদের এমন কি বৃটিশ ভারতেও সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে সামান্যতম সমালোচনা করা হইলেও কঠোরহস্তে তাহার মুখবন্ধ করা হয়। জনসভা যে কি জিনিষ তাহা একরূপ অজ্ঞাত এমন কি সামাজিক সভাসমিতিও প্রায়শঃই নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাহিরের কোন বিশিষ্ট নেতা রাজ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলে প্রায়ই তাহাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ অসুস্থ হইয়া স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কাশ্মীর যাইবার মনস্থ করেন। তাঁহার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি কাশ্মীর সীমান্ত পর্য্যন্ত গেলেন; কিন্তু সেখানেই তাঁহাকে থামান হইল। এমন কি মিঃ জিন্নাকেও হায়দারাবাদ রাজ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বাড়ী হায়দারাবাদ সহরে হইলেও অনেকদিন তাঁহাকে নিজগৃহে যাইতে দেওয়া হয় নাই।" (আত্মজীবনী পৃঃ ৫৩০-৩২)।

১৮৯১ সালে ভারত সরকার এক নির্দ্দেশ দ্বারা দেশীয় রাজ্যে সংবাদপত্র মুদ্রণ সম্পর্কে এক কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। আদেশে বলা হইল যে, বৃটিশ ভারতের অংশ ব্যতীত যে সমস্ত অঞ্চল সপরিষদ

বড়লাটের নিয়ন্ত্রণাধীন তথায় পলিটিক্যাল এজেন্টের লিখিত অনুমতি ব্যতীত সাময়িকী কিম্বা অন্য যে কোনও প্রকারের সংবাদপত্র প্রকাশ বা মুদ্রিত করা চলিবে না। বৃটিশ ভারতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে যাহাতে অবাধ সমালোচনা হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আরও কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করিয়া উহা ১৯৩৪ সালের ষ্টেট্‌স প্রোটেকশন এ্যাক্টে বিধিবদ্ধ করা হইল।

অবাধ স্বৈরাচার:—এসিয়ার ইতিহাসে স্বৈর শাসনের বহু দৃষ্টান্তই আছে, কিন্তু সামন্ত নৃপতিবৃন্দ বৃটিশ রক্ষণাধীনে যেরূপ শাসন চালাইয়াছেন, ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলা ভার। অবশ্য দেশীয় রাজ্যের মধ্যে এমন কয়েকটি রাজ্য আছে যাহাদের শাসন ব্যবস্থা সমাজ-কল্যাণের দিক হইতে বৃটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থার চাইতে নিকৃষ্ট নহে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তার করিয়া দুই চারিটি দেশীয় রাজ্য বৃটিশ শাসনাধীন ভারত অপেক্ষা কয়েকটি বিষয়ে অগ্রগামী হইয়াছেন ইহাও সত্য। কয়েকটি রাজ্যে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া স্বৈরাচারকে খানিকটা মার্জ্জিত করা হইয়াছে ইহাও অনস্বীকার্য্য। কিন্তু সামন্ত ভারতের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অধিকাংশ রাজ্যেই অবাধ স্বৈরাচার বিরাজমান—জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা ও উৎপীড়ন অবর্ণনীয়। অতীতের স্বৈরাচারী শাসকদের বহিরাক্রমণ ও বিদ্রোহের শঙ্কায় শঙ্কিত থাকিতে হইত। এই শঙ্কা স্বভাবতঃই তাহাদের স্বৈরাচারের একটা মাত্রা নির্দ্দেশ করিত। কিন্তু বৃটিশ রক্ষণাধীন ভারতীয় সামন্ত সমাজ এই বিষয়ে নিঃশঙ্ক। রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রজাদের প্রতি তাহারা যদৃচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিত। কুশাসনের দায়ে অভিযুক্ত হইলে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইবে,—এই যে নীতির কথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন, রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি আনুগত্যের 'অভাব না হইলে

শুধু প্রজাপীড়নের অভিযোগে এই নীতি প্রযুক্ত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষ্টাণ্ডিং কমিটি ১৯৩৯ সালে সামন্ত ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,—"অতি সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া ছোট বড় সমস্ত দেশীয় রাজ্যেই ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী-শাসন বিরাজমান। কুত্রাপি আইন সঙ্গত শাসনের বিধান নাই। প্রজাদের করভার অত্যধিক ও দুর্ব্বহ। ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত ব্যয় সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট থাকে না। যেখানে উহা নির্দ্দিষ্ট, সেখানেও ঐ বরাদ্দ মানিয়া চলা হয় না। পক্ষান্তরে, একদিকে চলিয়াছে রাজন্যবর্গের ব্যয়বহুল বিলাস-ব্যসন, অপরদিকে আছে জনসাধারণের চরম দুঃখদুর্দ্দশা। দারিদ্র্য-পীড়িত দুঃস্থ জনসাধারণ কায়ক্লেশে যে অর্থোপার্জ্জন করে তাহা দ্বারা রাজন্যবর্গ প্রদেশে ও বিদেশে বিলাসব্যসনে ডুবিয়া থাকেন। এই অবস্থা চলিতে পারে না। কোন সভ্যসমাজই ইহা বরদাস্ত করিতে পারে না।"

দেশীয় রাজ্যের বাজেটের বরাদ্দের প্রতি দৃকপাত করিলেই সামন্ত ভারতের প্রকৃত অবস্থা মালুম হয়। শ্রীযুত এ আর দেশাই তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"ইংলণ্ডেশ্বর জাতীয় রাজস্বের প্রতি ষোলশ' পাউণ্ডে এক পাউণ্ড পাইয়া থাকেন; বেল্‌জিয়ামের রাজা পান প্রতি হাজারে এক পাউণ্ড; ইতালীর রাজা প্রতি পাঁচশতে এক পাউণ্ড; ডেনমার্কের রাজা প্রতি তিনশত পাউণ্ডে এক পাউণ্ড; জাপসম্রাট প্রতি চারশত ইয়েনে এক ইয়েন। কিন্তু কোন রাজাই ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণীর ন্যায় রাজ্যের আয়ের প্রতি সতের টাকায় এক টাকা, গায়কোয়াড় বা নিজামের ন্যায় প্রতি তের টাকায় এক টাকা কিম্বা কাশ্মীর ও বিকানীরের ন্যায় প্রতি পাঁচ টাকায় এক টাকা পান না। বিশ্ব একথা

জানিতে পারিলে লজ্জায় অধোবদন হইবে যে, রাজ্যের রাজস্বের প্রতি দুই বা তিন টাকায় এক টাকা নিয়া থাকেন এমন রাজার সংখ্যা দুই চারিজন নহে। (ইণ্ডিয়া টু-ডে পৃঃ ৩৬২)

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বিকানীর রাজ্যের প্রচুর প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। মিঃ আর, পি, দত্ত তাঁহার ইণ্ডিয়া টু-ডে পুস্তকে (পৃঃ ৩৬২-৬৩) উহার ১৯২৯-৩০ সালের বাজেট উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্যের বাজেটে কিরূপ "বানরের ভাগের" ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নে এই বাজেট উদ্ধৃত হইল :—

সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন	১২,৫৫,০০০ টাকা
রাজপুত্রের বিবাহ	৮২,০০০ "
বিল্ডিং ও রাস্তা	৬,১৮,৩৮৪ "
রাজপ্রাসাদের সম্প্রসারণ	৪,২৬,৬১৪ "
রাজপরিবার	২,২৪,৮৬৪ "
শিক্ষা	২,২২,৯৭৯ "
মেডিক্যাল সার্ভিস	১,৮৮,১৩৮ "
জনকল্যাণ	৩০,৭৬১ "
স্বাস্থ্য	৫,৭২৯ "

রাজা, রাজপরিবার ও রাজপ্রাসাদের জন্য এই বাজেটে যে বরাদ্দ করা হইয়াছে, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, জনকল্যাণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহার চারিভাগের এক ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছে মাত্র। জামনগরের ১৯২৬-২৭ সালের দশ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্বের মধ্যে জামসাহেবের ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য মাত্র সাত লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ করা হয়; কিন্তু শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয় শতকরা এক পাউণ্ড দশ শিলিং এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য শতকরা এক পাউণ্ডও নহে।

দাস-প্রথাও আছে ঃ

এই কদর্য্য স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাধীনে জনসাধারণের দুরবস্থা কতদূর হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। সব কয়টি রাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা কৃষিপ্রধান। কিন্তু ভূমি ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভূমি ব্যবস্থার প্রতি স্তরে কায়েমী স্বার্থের বাসা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে হতভাগ্যের দল জমি চাষ করে—ফসল ফলায়, জমিতে তাহাদের স্বার্থ গৌণ। তাহাদের অবস্থা ভূমি-দাসের মত। অধিকাংশ রাজ্যই শিল্পের দিক হইতে অনগ্রসর। যে কয়েকটি রাজ্যে খানিকটা শিল্পোন্নতি হইয়াছে, তথাকার শ্রমিকদের দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজা বেনামদার হিসাবে অথবা রাজপরিবারের কর্ত্তারা এই শিল্পের মালিক। বিদেশী ও বৃটিশ ভারতের পুঁজিপতিদের সহযোগিতায়ও সামন্ত ভারতের 'সস্তা শ্রমিকদের' যতভাবে সম্ভব শোষণ করা হয়। শ্রমিক কল্যাণ আইন কাগজেপত্রে কিছু কিছু থাকিলেও তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে কাহারও বিশেষ মাথা ব্যথা নাই। সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের আভাষ পাইলে সর্ব্বপ্রকারে তাহার মাথা ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করা হয়।

বহু রাজ্যে অদ্যাপি দাস ব্যবস্থা বিদ্যমান। মিঃ পি, এল, চুড়গর বলেন, রাজপুতানার কয়েকটিতে এবং কাথিয়াবাড়সহ পশ্চিম ভারত ষ্টেট্স এজেন্সীর বহু রাজ্যে অদ্যাপি দাস শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে। ১৯২১ সালের আদমশুমারী অনুসারে একমাত্র রাজপুতানা ও মধ্যভারতে চাকর ও দারোগা শ্রেণীর ১৬০,৭৩৫ জন দাস ছিল। ('ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেস আণ্ডার বৃটিশ প্রোটেকশন' হইতে 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' পুস্তকে উদ্ধৃতঃ পৃঃ ৩৬৩)। আপখোরাকী বাধ্যতামূলক বেগার খাটাইবার রীতি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। চুড়গর বলেন,—"বেথ ও বেগার

প্রথা প্রায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যেই বিদ্যমান। মজুর ও কারিগর প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর শ্রমিকদেরই রাজা ও তাহার কর্ম্মচারীদের জন্য কাজ করিতে বাধ্য করান হয়। বিনিময়ে যে মজুরী দেওয়া হয় তাহাতে জীবনধারণের মত খাদ্য সংগ্রহ করাও সম্ভব নহে। এই সমস্ত প্রজাদের যে সময়ে ইচ্ছা এবং যতদিন ইচ্ছা কাজ করিতে বাধ্য করান হয়। তরুণী কি বৃদ্ধা, বিবাহিত, অবিবাহিত কিম্বা বিধবা স্ত্রীলোকগণও রেহাই পায় না। এই সমস্ত পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক যদি ঠিকমত কাজ করিতে না পারে, কিম্বা অসমর্থ হয় তবে তাহাদের বেত মারা হয় কিম্বা অন্যভাবে অকথ্য উৎপীড়ন করা হয়। লেখক (চুড়গর) নিজেই জানেন যে, যাট বছরের দরিদ্র বৃদ্ধাদের একজন কনেষ্টবল নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। প্রকাশ্য রাস্তায় বাঁশের লাঠি দিয়া ইহাদের প্রহার করা হয়। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা অসামর্থ্যের দরুণ বেগার খাটার দায় হইতে অব্যাহতি লাভের মিনতি জানাইয়াছিল।"

উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব এবং অপর দুইজনকে লইয়া উড়িষ্যা রাজ্য তদন্ত কমিটি নামে একটি বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। উড়িষ্যার কোন দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টই এই কমিটির সহিত সহযোগিতা করেন নাই। এমন কি ঢেঙ্কানল ও কিয়োঞ্ঝর রাজ্যে যে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় বিস্ময়করভাবে তাহা চুরি যায়। জনসাধারণের সাক্ষ্যপ্রমাণাদির উপর নির্ভর করিয়া মহাতাব কমিটি যে রিপোর্ট দেন তাহাতেও বেগার প্রথার কথা বলা হয়। মহাতাব কমিটি বলেন,—এই সব রাজ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন অস্তিত্বই নাই। সম্প্রতি ময়ূরভঞ্জ ও নীলগিরির ন্যায় রাজ্যে জনসভা করার ও প্রজামণ্ডল গঠনের অধিকার দিয়া আংশিকভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে। রাজস্ব সম্পর্কে বলা হয়,—

ষ্টেট্ বাজেটে রাজার গৃহস্থালীর খাতে যে বরাদ্দ করা হয়, তাহা ব্যতীত রাজন্যবর্গ ও তাঁহাদের অফিসারগণ এমন বহু উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহার মারফতে জনসাধারণের জন্য বরাদ্দ অর্থের বহু টাকা বেমালুম রাজার কোষাগারে চলিয়া যায়। এই সব রাজ্যে "বেথি" প্রথাও প্রচলিত আছে। এই প্রথা অনুসারে কোন কোন চাষীকে বৎসরের মধ্যে একশতদিন পর্য্যন্ত রাজা বা তাঁহার কর্ম্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটিতে হয়।

দেশীয় রাজ্যের ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে পি, এল, চূড়গর বলেন,— "রাজা, প্রধানমন্ত্রী বা ষ্টেট্ কোন প্রজার ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিলে তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই। রাজা নিজের খুশীমত যে কোনও প্রজার অধিকার ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে তিনি যত টাকা ইচ্ছা জরিমানা করিতে পারেন; এবং উহা আদায়ের জন্য সম্ভাব্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। বিনা অভিযোগে কিম্বা বিনা বিচারে যে কোনও প্রজাকে তিনি যতকাল ইচ্ছা কারাগারে আটকাইয়া রাখিতে পারেন।"

রাজপ্রাসাদের অপূরণীয় খাই মিটাইবার জন্য দীন দরিদ্রকে যে দুর্ব্বহ করভার বহন করিতে হয় চূড়গর তাহারও বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়াছেন :—"নবনগর রাজ্যে যে ভাবে করধার্য্য করা হয় তাহা হইতে দেশীয় রাজ্যের ট্যাক্স সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়। প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এইরূপ ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়া থাকে। প্রথম তালিকায় বৃত্তি, শ্রমিক, কারিগর, গবাদি পশু, বাগদান, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু ও সৎকারের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করার ব্যবস্থা আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, হস্তচালিত শিল্পের ন্যায় নগণ্য বৃত্তিকেও ট্যাক্স হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই। অথচ এই সব বৃত্তি

হয়ত একজন দরিদ্র ও নিঃস্বম্বল বিধবার অন্নবস্ত্র সংস্থানের একমাত্র উপায়।”......

“জমির উপর ট্যাক্সের কথা ধরা যাউক। যেখানে নগদ টাকায় খাজনা দিবার রীতি আছে তথায় প্রতি একরে তিন টাকা হারে খাজনা ধার্য্য করা হয়। যদি ফসল দিয়া খাজনা দিতে হয় তবে ফসলের এক-চতুর্থাংশ দিতে হয়। বস্তুতঃ এই হারের অনেক বেশী আদায় করা হয়। রাজার ভাগে ফসলের প্রায় আড়াই ভাগের ভাগ পড়ে। অন্যান্য ট্যাক্স বাবদ শতকরা দশভাগ ফসল আদায় করা হয়। সুতরাং চাষীর ভাগে মাত্র অর্দ্ধেক ফসল থাকে। ইহা ব্যতীত তাহাদের চীফের বিবাহ কিম্বা তাঁহার পরিবারের কাহারও বিবাহের সময়েও অবশ্যই সাহায্য করিতে হইবে, এবং চীফের কোন পুত্র জন্মিলে নজরানা দিতে হইবে—চীফের স্ত্রী বা মাতার অন্ত্যেষ্টির ন্যায় অনুষ্ঠানের কালেও টাকা জোগাইতে হইবে।” (“ইণ্ডিয়া টু-ডে”তে উদ্ধৃত পৃঃ ৩৬৪)।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দুই শতাব্দী যাবৎ ভারতের সমাজ জীবনে সর্ব্বপ্রযত্নে এই সামন্ত কলঙ্ককেই জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। মিঃ আর, পি দত্তের ভাষায়—সামন্ত ভারতে যে চূড়ান্ত উৎপীড়ন ও দারিদ্র্য বিদ্যমান বর্ত্তমান দুনিয়ায় কুত্রাপি সেরূপ নাই। কেন না ইহার মধ্যে একদিকে যেমন আছে দাসপ্রথার চিহ্নসহ বর্ব্বরোচিত সামন্ততান্ত্রিক উৎপীড়ন, অপর দিকে আছে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা ও শোষণের পূর্ণাভিব্যক্তি। উভয়ের একত্র সমাবেশে এই সব রাজত্বে তুলনাহীন উৎপীড়ন ও দারিদ্র্যের উদ্ভব হইয়াছে। (ইণ্ডিয়া টু-ডে পৃঃ ৩৬৪)।

সামন্ত স্বৈরাচারের চূণকাম :

বৃটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে বর্ত্তমান শতাব্দীতে খানিকটা গণতান্ত্রিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন কালেই সামন্ত ভারতের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার-ব্যবস্থা এবং ১৯৩৫ সালের আইন "ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি" সম্পর্কিত উভয় প্রস্তাবেই সামন্ত ভারতকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার-সাধনের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। রাজন্যসমাজ পূর্ব্বের ন্যায় স্বৈরাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন কিম্বা স্বৈরাচারকে খানিকটা চূণকাম করিয়া ভদ্রস্থ করিবেন তাহা স্থির করার ভার তাঁহাদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই স্বাধীনতা রাজন্য-সমাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অধিকাংশ রাজাই গতানুগতিকতা বহাল রাখেন। সামান্য কয়েকজন, বিশেষ করিয়া বৃহত্তর রাজ্যের শাসকগণ দেশের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া স্বৈরাচারকে খানিকটা চূণকাম করিবার জন্য "উপদেষ্টা কমিটির ন্যায় সঙ্কীর্ণ ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রতিনিধিমূলক পরিষদ গঠন করিলেন।"

শাসন প্রণালী অনুসারে জোসেফ চেইলী রাজন্যসমাজকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) যে সামান্য কয়েকজন নৃপতি শৃঙ্খলা ও ন্যায় বিচার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের আদর্শ অনুযায়ী রাজ্যশাসন করেন এবং যাঁহারা জনসাধারণের কল্যাণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয়।

(২) যে সমস্ত রাজা শাসন ব্যবস্থার কথঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করিয়াছেন, আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, বিচারক নিয়োগ করিয়াছেন

এবং তাঁহাদের শাসনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য উজীর নিয়োগ করিয়াছেন।

(৩) যাঁহারা এখনও মনে করেন যে, তাঁহারাই রাজ্য, ইহার সম্পদ তাঁহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অধিবাসীরা তাঁহাদের দাস এবং তাঁহাদের একমাত্র কাজ আমোদপ্রমোদে মাতিয়া থাকা।

সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এইরূপ রাজ্যের সংখ্যা সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইলেও চেইলীর শ্রেণী বিভাগের ভিত্তি অদ্যাপি অভ্রান্ত।

যে কয়েকটি রাজ্যে "জনসাধারণকে শাসন ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে" ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মহীশুর, হায়দরাবাদ, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, বরোদা ও কাশ্মীর তাহাদের অন্যতম। এই সমস্ত রাজ্যে প্রতিনিধিমূলক পরিষদও আছে। কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাহাদের সমালোচনার অধিকার দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ইহাদের কাহারও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার পর্য্যায় অতিক্রম করে নাই। ভোটাধিকার এত সঙ্কুচিত যে, শতকরা দশজন অধিবাসীও তাহা ভোগ করে না। তা ছাড়া, কোন রাজাই জনগণের সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকার করেন নাই। ১৯২৩ সালে মহীশুরে দেওয়ান স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহার রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়,—"মহীশুরের সমস্ত ক্ষমতা, একতেয়ার ও কর্ত্তৃত্ব বস্তুতঃ মহারাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং তাঁহারই নামে উহা প্রযুক্ত হয়। অতএব, মহারাজার নিকট হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়াই শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব।" মহীশুর কমিটি সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে এই যে মূলনীতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শাসন সংস্কারের নমুনা :[১]

মহীশুর বহু বিষয়ে সামন্ত ভারতের দৃষ্টান্তস্বরূপ। ১৮৬২ সালে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিটির শাসনতন্ত্র রচিত হইলেও, "জনসাধারণের মতামতের সহিত সরকারী কার্য্যাবলীর অধিকতর সামঞ্জস্য বিধানের" প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ১৮৮১ সালে প্রতিনিধি পরিষদ গঠন করা হয়। অতঃপর "আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বে-সরকারী অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের" পরামর্শ গ্রহণের জন্য ১৯০৭ সালে ব্যবস্থাপক সভা গঠন করা হইল। মজার কথা এই যে, রাজচক্রবর্ত্তী তখন মহীশুরের এই সিদ্ধান্তকে বিশেষ সুনজরে দেখেন নাই। প্রস্তাবটি অনুমোদন করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী যে পত্র লেখেন তাহাতে বলা হয়, "আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যে ব্যবস্থাই করা হউক না কেন, মহীশুরের সমস্ত আইনের চূড়ান্ত দায়িত্ব একমাত্র মহারাজার এবং এই সমস্ত আইন নিয়ন্ত্রণের অধিকার সপরিষদ বড়লাটের আছে।"

১৯৩৮ সালে মহীশুরের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য মহারাজা একটি স্পেশ্যাল কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুসারে মহীশুর ১৯৩৯ সালে যে শাসনতন্ত্র পাইল বৃটিশ ভারত তাহা পাইয়াছে ১৯২০ সালে,—মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিফর্ম্মস্ পরিকল্পনায়।

১৯৩৯ সালের ৬ই নভেম্বর রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা যে নয়া-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয় তাহা মোটামুটিভাবে এইরূপ :—মহীশুর প্রতিনিধি পরিষদে ৩১০ জন সদস্য থাকিবে। ব্যবস্থাপক সভার ৬৮ জন সদস্যের

(১) নিম্নে বিভিন্ন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পর তাহার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত শাসন ব্যবস্থার কথা প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হইয়াছে।

মধ্যে ৪৪ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবে, উভয় পরিষদের আয়ুষ্কাল হইবে চারি বৎসর। প্রতিনিধি পরিষদ আইন সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি কোন বিলের নীতির বিরোধিতা করেন তবে গবর্ণমেণ্ট "সাধারণতঃ" পরিষদের মত মানিয়া চলিবেন। কোন বিল পরিষদে সংশোধিত আকারে গৃহীত হইবার পর গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে উহা মূল আকারে (পরিষদের সংশোধন প্রস্তাব বাদ দিয়া) ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিতে পারিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভার অনুমোদন লাভের পর পুনরায় পরিষদে পেশ না করিয়া মহারাজার অনুমোদনসহ উহা আইনে বিধিবদ্ধ হইতে পারিবে। আইন সভার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া এক বৎসরের জন্য গবর্ণমেণ্টকে জরুরী আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া হয়। প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইল। মুসলমান ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই আলাদা প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইল।

নূতন শাসন পরিচালকমণ্ডলী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, দেওয়ান সহ পাঁচজন সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে। দুইজন মনোনীত জনপ্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় স্থান লাভ করিবেন এবং তাঁহাদের পক্ষে কোন দপ্তরের কার্য্যভার গ্রহণের প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না।

ত্রিবাঙ্কুর ঃ ১৮৮৮ সালে সর্ব্বপ্রথম ত্রিবাঙ্কুরের শাসন পরিষদ গঠিত হয়। কমপক্ষে পাঁচজন এবং উর্দ্ধ সংখ্যায় আটজন সদস্য লইয়া গঠিত এই সভায় দুইজন বে-সরকারী মনোনীত সদস্য ছিল। ইহার কোনও শাসন ক্ষমতা ছিল না। রাজা শাসনপরিষদের সহিত আলোচনা না করিয়া যে কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিতেন। পরিষদের কোন সদস্য যদি ব্যয়সাপেক্ষ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিতেন তবে সেই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেওয়ানের সম্মতি লইতে হইত।

১৮৯৮ সালে পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া কমপক্ষে আটজন এবং উর্দ্ধে পনরজন করা হয়। বে-সরকারী মনোনীত সদস্য সংখ্যাও দুই-পঞ্চমাংশ করা হইল। রাজপরিবার বা রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কিছু করিবার অধিকার ইহার ছিল না। ১৯১৯ সালে পরিষদকে আবার পুনর্গঠিত করা হইল। কয়েকজন সদস্য মনোনয়নের অধিকার রাখিয়া গবর্ণমেণ্ট এইবারে জনসাধারণকে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দেন। ১৯২১ সালে পরিষদের সদস্য সংখ্যা আবার বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৩২-৩৩ সালের পর শ্রীচিত্র ষ্টেট্ কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা হয় ৩৭ জন (২২ জন নির্ব্বাচিত ও ১০ জন সরকারী কর্ম্মচারী সহ ১৫ জন মনোনীত) ; ১৯০৪ সালে গঠিত শ্রীমূলম পপুলার এসেম্বলীর সদস্য সংখ্যা হয় ৭২ জন (৬২ জন বে-সরকারী সদস্য এবং ১০ জন সরকারী কর্ম্মচারী)। বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যে ১৪ জন মনোনীত সদস্য ছিল। রাজ্যের দেওয়ান উভয় পরিষদের সভাপতি ছিলেন। উভয় পরিষদেরই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল। বাজেট সম্পর্কেও উভয়কেই আলোচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আর্থিক বিষয় সম্পর্কে কাউন্সিলের চাইতে এসেম্বলীর ক্ষমতা ছিল বেশী। ত্রিবাঙ্কুরের বিচার বিভাগও সুব্যবস্থিত। রাজ্যে একটি হাইকোর্টও আছে।

কোচিন : কোচিন রাজ্যের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার মন্ত্রিসভায় একজন নির্ব্বাচিত মন্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯২৫ সালে যে আইন পরিষদ গঠন করা হয়, ১৯৩৮ সালের কোচিন শাসন আইনে তাহার সদস্য সংখ্যা ৫৮ জন করা হয় (৩৮ জন নির্ব্বাচিত, ১২ জন মনোনীত সরকারী কর্ম্মচারী এবং ৮ জন মনোনীত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি)। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আইন পরিষদকে কোনরূপ আলাপ আলোচনার অধিকার দেওয়া হয় নাই :—

(১) কোচিনের রাজপরিবার।
(২) রাজচক্রবর্ত্তী বা অন্যান্য রাজ্যের সহিত কোচিনের রাজার সম্পর্ক।
(৩) বৃটিশের সহিত সন্ধি দ্বারা যে সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়।
(৪) রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী।
(৫) হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্য্যাবলী।
(৬) অপরাধী প্রত্যর্পণ।
(৭) মহারাজার কর্ত্তৃত্বাধীন দেবমন্দিরসমূহ।

এই আইনে নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত কিন্তু পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল একজন মন্ত্রীর হস্তে কৃষি, সমবায়, কুটীর শিল্পের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতি ও পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা পরিচালনা ভার অর্পণ করা হয়। কোচিন রাজ্যের বিচার ব্যবস্থাও সুব্যবস্থিত।

হায়দারাবাদ: বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদের আইন পরিষদ সর্ব্বপ্রথম গঠিত হয় ১৮৯৩ সালে। ছয় জন সরকারী কর্ম্মচারীকে লইয়া প্রথম পরিষদ গঠন করা হয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে উহার সদস্যসংখ্যা কুড়িজন করা হয়; তন্মধ্যে ৭ জন বেসরকারী সদস্য ছিলেন। এই বে-সরকারী সদস্যদের দুইজন জায়গীরদার ও ভূম্যধিকারীদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন। দুজইন নির্ব্বাচন করিতেন হাইকোর্টের আইনজীবীরা। বাকী আর তিন জন প্রজাদের মধ্য হইতে মনোনয়ন করা হইত। ১৯২১ সালে নিজাম তাঁহার শাসন পরিষদ গঠন করেন। ১৯২১ সালে এক বিশেষ জারিদা দ্বারা নিজাম বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করেন এবং রাজ্যে একটি হাইকোর্ট গঠন করা হয়।

দেওয়ান বাহাদুর অরুভামাদু আয়েঙ্গারের সভাপতিত্বে ১৯৩৭ সালে একটি "রিফর্ম্ম কমিটি" গঠন করা হয়। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে এই সম্পর্কে সরকারী আদেশ প্রকাশিত হইল। নিজামের শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা পূর্ব্বের মতই স্বৈরাচারী ধরণের রাখা হয়। সরকারী আদেশ-নামায় নিজামকে একাধারে রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ের শিরোমণি এবং "জনগণের সার্ব্বভৌম অধিকারের প্রতীক" বলিয়া অভিহিত করা হয়। যৌথ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে কমিটি একটিমাত্র আইন পরিষদ গঠনের সুপারিশ করেন। ৮৫ জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইবে। তন্মধ্যে ৪২ জন সদস্য নির্ব্বাচিত এবং ২৮ জন মনোনীত হইবেন। ৩ জন খাসমহলের প্রতিনিধিত্ব করিবেন এবং ৫ জন থাকিবেন প্রধান প্রধান জমিদারীর প্রতিনিধি। রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা মাত্র এগার জন হইলেও আইন সভায় তাহাদের হিন্দুদের সমান প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের পরিবর্ত্তে কমিটি বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্বের সুপারিশ করেন। আইন প্রণয়নের বিষয়সমূহকে চারিটি তালিকায় বিভক্ত করিয়া আইন পরিষদকে মাত্র কয়েকটি বিষয়ে নিজাম গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বসম্মতিসহ বিল উথাপনের অধিকার দেওয়া হয়।

বরোদা: ভারতে যে গুটি পাঁচেক "প্রগতিশীল" দেশীয় রাজ্য আছে বরোদা তাহাদের অগ্রণী। ১৯০৮ সালে বরোদায় ধারা সভা গঠন করা হয়। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র মহারাজার ছিল। মন্ত্রিগণ ও আইন সভা এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। বিচার সম্পর্কে ভারিস্ত বা হাইকোর্ট রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আদালত। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে "হুজুর ন্যায়সভার" নিকটে আপীল করিবার বিধানও আছে। রাজ্যের শাসন ও বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বরোদায়

কতগুলি ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারও আছে। এই প্রগতিশীল রাজ্যটিতে একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার, ৪৬টি সহুরে পাঠাগার, ১০১৭টি গ্রাম্য পাঠাগার এবং ২৭৬টি ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার আছে।

ধারা সভার সম্প্রসারণ সম্পর্কে একটি কমিটি নিয়োগ করিয়া উহার সুপারিশ ১৯৪০ সালে কার্য্যকরী করা হয়। এই আইনেও আইন প্রণয়নের অধিকার মহারাজার হস্তে রাখা হয়। ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষণা করা হইল যে, দেওয়ান এবং অপর তিনজন সদস্য লইয়া রাজ্যের শাসন পরিষদ গঠিত হইবে এবং ধারা সভার একজন মনোনীত বে-সরকারী সদস্যকে শাসন পরিষদে গ্রহণ করা হইবে। এই সদস্য ধারা সভার আয়ুষ্কাল অর্থাৎ তিন বৎসর পর্য্যন্ত শাসন পরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন। ধারা সভার সদস্য সংখ্যা ৬০ জন হইবে। তন্মধ্যে ৩৭ জন সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি থাকিবে। বরোদা সহর ছাড়া অপর কোন সহরই স্বতন্ত্র প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে না। সভায় দেওয়ান সহ ৯ জন সরকারী সদস্য এবং ১৪ জন মনোনীত সদস্য থাকিবে। ইহার ফলে এই সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যগণ সুনিশ্চিত সংখ্যাধিক্য লাভ করিল। ১৯৪০ সালের বরোদা আইনের এই সব বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে ধারা সভার কোন এক্তেয়ার থাকিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হয় :—(১) রাজ্যের সেনাদল, (২) রাজপরিবার, (৩) মহারাজার সহিত অন্যান্য রাজ্যের সন্ধি ও সম্পর্ক, (৪) ঋণ-গ্রহণের নিয়মাবলী। এছাড়া, মহারাজা অপর যে কোন বিষয় সম্পর্কেও আইন সভাকে আলোচনা করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন বলিয়া এক পাইকারী মন্তব্য জুড়িয়া দেওয়া হয়।

ইন্দোর : ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে হোলকার এক শাসনতন্ত্র সংস্কার কমিটি নিয়োগ করেন। ইন্দোরের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা

কি ধরণের হইবে, কি ভাবেই বা আইন সভার সম্প্রসারণ করা যায়, সেই সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য এই কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে হোলকার নিম্নোক্ত আদেশ জারী করেন,—নির্ব্বাচিতের সংখ্যাধিক্য সহ ৫০ জন সদস্য লইয়া আইন সভা গঠিত হইবে। ইহাতে ৩৪ জন নির্ব্বাচিত ও ১৬ জন মনোনীত সদস্য থাকিবে। মনোনীতদের আটজন সরকারী কর্ম্মচারী হইবেন। বাকী আটজন বে-সরকারী মনোনীতের মধ্যে হরিজন ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকিবে। হোলকার আইন সভার সভাপতি নিযুক্ত করিবেন। আইন সভা সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবে। আইন সভা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে, বিল পাশ করিতে পারিবে এবং বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবে, কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার কোন অধিকারই তাহার থাকিবে না,—

(১) রাজ্যের রাজপরিবার।

(২) রাজচক্রবর্ত্তী বা অন্যান্য রাজার সহিত হোলকারের সম্পর্ক।

(৩) সে সমস্ত বিষয় সন্ধি-চুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(৪) সেনাবাহিনী।

(৫) রাজ্যের শাসনতন্ত্র।

(৬) সরকারী কর্ম্মচারী।

(৭) সঙ্গত মনে করিলে হোলকার অন্য যে কোন বিষয়ের আলোচনাও নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

শাসনতন্ত্রের পুনঃ সংস্কার সম্পর্কে ছয় বৎসর পরে বিবেচনা করা হইবে। নির্ব্বাচিত বেসরকারী সদস্যদের মধ্য হইতে মন্ত্রী গ্রহণের প্রশ্ন নয়া শাসনতন্ত্রের সফলতার উপর নির্ভর করিবে। ইন্দোরের শাসন-

তন্ত্রে সংরক্ষিত বিষয়ের তালিকা যত ব্যাপক অন্য কোন দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্রেই ততটা নাই।

গোয়ালিয়র: ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে সিন্ধিয়া ঘোষণা করিলেন যে, গোয়ালিয়রের প্রজাপুঞ্জ "সৎনাগরিকের মৌলিক অধিকার-সমূহ ভোগ করিবে"; অর্থাৎ "শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিধানাবলীর গণ্ডীর মধ্যে" সভা সমিতি করার, মতামত প্রকাশের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ভোগ করিবে। মজলিস্-ই-আম ও মজলিস্-ই-কানুনের পরিবর্ত্তে প্রজাসভা ও সামন্ত সভা গঠন করা হইবে। প্রজাসভায় ৮৫ জন সদস্য থাকিবে; উঁহাদের ৫০ জন নির্ব্বাচিত ও ৩৫ জন মনোনীত হইবেন। মনোনীতদের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ১৫ জনের বেশী হইতে পারিবে না। একটি ভোটাধিকার কমিটি গঠন করা হইবে। উভয় পরিষদের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। সামন্ত সভার সদস্য সংখ্যা ৪০ জন হইবে, তন্মধ্যে ২০ জন মনোনীত হইবেন।

প্রজা সভা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার প্রস্তাব গ্রহণের, বিল উত্থাপনের এবং ষ্টেট্ বাজেটের প্রধান প্রধান বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনার অধিকারী হইবেন। কিন্তু নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার কোন অধিকার তাহার থাকিবে না:—

(১) রাজা, রাজপরিবার, রাজপ্রাসাদ, ও রাজার নিজস্ব তহবিল।
(২) বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিষয়।
(৩) সেনা বাহিনী ও তাহার বাজেট।
(৪) ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়।
(৫) শাসনতন্ত্র।

নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কেও মহারাজার ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হয়:—

(১) শাসনতন্ত্রের সংশোধন, উহা বাতিল ও স্থগিত রাখা।

(২) ভেটোর ক্ষমতা।

(৩) জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা।

প্রজা সভায় গৃহীত কোন বিল, সামন্ত সভা ও মহারাজার অনুমোদন লাভ করিলেই আইন বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু সামন্ত সভায় উত্থাপিত আইনের জন্য কেবল মহারাজার অনুমোদন আবশ্যক। গোয়ালিয়র শাসনতন্ত্রের এই বিধান অদ্ভুত।

কাশ্মীর: জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রজা সভা ৭৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। ৫৯ জন তিন বৎসরের জন্য সদস্য থাকেন; "ষ্টেট কাউন্সিলর" বলিয়া অভিহিত বাকী ষোলজন মহারাজার নির্দ্দেশে সাড়ে চারি বৎসর সদস্য থাকেন। কাশ্মীরের প্রজাসভায় বে-সরকারী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য আছে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে ৩৩ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের জন্য মহারাজা ১৪ জন সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৩৯ সালে মহারাজা, বিশেষ বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য আরও ৭টি আসনের জন্য নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। ফলে প্রজা সভায় নির্ব্বাচিতের সংখ্যা ৪০ জন হয়। প্রজা সভায় একটি নির্ব্বাচিত সহকারী সভাপতির পদও সৃষ্টি করা হয়। মন্ত্রীদের আইন সভার কাজে সাহায্য করার জন্য কয়েকটি প্রজা সভা আণ্ডার-সেক্রেটারীর পদও সৃষ্টি করা হইয়াছে। মহারাজার ঘোষণায় আরও বলা হয়,—যে সমস্ত বিষয়ে প্রজা সভার ভোট দিবার অধিকার আছে তৎসংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রিসভার বাজেট প্রজা সভার অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। প্রজা সভা যদি ইহা অনুমোদন না করে কিম্বা ঐ বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে ছাঁটাই প্রস্তাব গ্রহণ করে, তবে মন্ত্রিসভা উহা অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন যদি

তাঁহারা মনে করেন যে, শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ অত্যাবশ্যক।

নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে প্রজাসভার আলোচনা নিষিদ্ধ :—

(১) রাজা, রাজপরিবার ও তাহাদের গৃহস্থালী সংক্রান্ত বিষয়।

(২) রাজচক্রবর্ত্তী, বৈদেশিক শক্তি কিম্বা অন্যান্য রাজ্যের সহিত জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পর্ক।

(৩) গিলগিট্ ও লাদখ্ সংক্রান্ত বিষয়।

(৪) সনদ দ্বারা অনুমোদিত জায়গীরদারদের অধিকার।

(৫) সেনাবাহিনীর সংগঠন, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ।

(৬) ধর্ম্মার্থ বিভাগ।

(৭) প্রাসাদ রক্ষী, রাজপ্রাসাদসমূহ, উৎসব-অনুষ্ঠান, ষ্টেট গ্যারাজ, রাজ্যের আস্তাবল, সম্বর্দ্ধনা ও শিকারখানা সম্পর্কে যে সব বিভাগ আছে তাহাদের কাজকর্ম্ম।

শাসন সংস্কার ও রাজচক্রবর্ত্তী :

বৃটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থা দেশীয় রাজ্যের প্রজাদেরও প্রভাবিত করিতেছিল। ১৯৩৫ সালের আইনে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহে ব্যাপকতর ক্ষমতাসম্পন্ন দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামন্ত ভারতের জনগণও দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলিল। কিন্তু "প্রগতিশীল" রাজ্যের নৃপতিগণ ১৯৪০ সালে তাহাদের রাজ্যে যে সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন, তাহার কোনটিই মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার স্তরও অতিক্রম করে নাই। এজন্য কেবল রাজন্যবর্গকেই দায়ী করা যায় না। দেশীয় রাজ্যের এই

মেকী দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা এবং স্বৈরাচারের জন্য বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর দায়িত্বও বড় কম নহে।

ভারত সচিবের পক্ষে সহকারী ভারত সচিব লর্ড উইণ্টারটন অবশ্য ১৯৩৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রস্তাবে রাজন্যবর্গের অনুমোদন লাভের পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৩৮) সালে আবার এক লিখিত বিবৃতিতে সহকারী ভারত সচিব বলেন,—"রাজন্যবর্গ উদ্যোগী হইয়া শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করিলে রাজচক্রবর্ত্তী বাধা দিবেন না। কিন্তু শাসন সংস্কার সম্পর্কে রাজন্যবর্গের উপর কোন চাপ দিবার অভিপ্রায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই। ভারতীয় রাজ্যসমূহের বিভিন্ন ধরণেব পরিস্থিতিতে কি জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করা উচিত রাজন্যবর্গই তাহা স্থির করিবেন।"

এই বিবৃতিতে দেশীয় রাজ্যের শাসন সংস্কারের প্রধান দায়িত্ব রাজন্যবর্গের বলিয়া উক্ত হইলেও সহকারী ভারত সচিব ১৯৩৯ সালের ৬ই এপ্রিল যে বিবৃতি দেন তাহাতে সমস্যাটির আসল রূপ ধরা পড়ে। রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি রাজন্যবর্গের বাধ্যবাধকতার উল্লেখ করিয়া সহকারী ভারত সচিব কমন্স সভাকে জানান,—"১৯৩৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের জবাবে যে নীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই নয় এবং ইহা মনে করা উচিত নয় যে, রাজা যে ক্ষমতা ভোগ করেন বলিয়া স্বীকৃত তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী উহা অনুমোদন করিবেন। রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন রাজা তাহা অপর কাহারও হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন এই যুক্তি দ্বারা কোন রাজ্যই রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া

গণ্য হইবে না। এই অবস্থায়, বাধ্যবাধকতা পূরণের নিশ্চয়তার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন রাজচক্রবর্ত্তী তাহা অবলম্বনেব অধিকারী থাকিবেন।"

এই বিশদ ব্যাখ্যা হইতে দুইটি জিনিব সুস্পষ্ট হয়। প্রথমতঃ, রাজ্যের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও ক্ষমতা যাহাই হউক না কেন, রাজ্যটি রাজচক্রচবর্ত্তীর প্রতি বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। সহজ কথায়, রাজন্ম্যবর্গকে প্রকারান্তরে এই কথাই জানাইয়া দেওয়া হইল যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ কর্ত্তৃত্বের সমস্ত স্বীকৃত ক্ষমতা আইন পরিষদের হস্তে অর্পণ করিতে চাহেন তাহা হইলেও তাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি বাধ্যবাধকতা-মুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না এবং এই বাধ্যবাধকতা পূরণের নিশ্চয়তার জন্ম রাজচক্রবর্ত্তী যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজা নিজে যে ক্ষমতা ভোগ করেন বলিয়া (রাজচক্রবর্ত্তীর দ্বারা) স্বীকৃত তদপেক্ষা বেশী কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন কোন আইন সভা যদি তিনি গঠন করেন তবে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা করা হইবে না এই নীতি অনুসারে উক্ত আইন সভা রাজচক্রবর্ত্তীর অনুমোদন লাভ করিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইবে না।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস্ কমিটির রিপোর্টে রাজচক্রবর্ত্তীর যে অভিমতের কথা বর্ণিত হইয়াছে এখানে তাহার প্রতিধ্বনি শোনা গেল যে, রাজচক্রবর্ত্তী যতটা "স্বীকার করেন" দেশীয় রাজ্যের কেবল মাত্র ততটুকু অটোনমীই আছে এবং কোন্ রাজ্যের অধীনতা কতটুকু তাহা নির্ণয় করিয়া দিবার ক্ষমতা একমাত্র রাজচক্রবর্ত্তীর। এই কারণেই দেওয়ান স্তার রামস্বামী আয়ার ত্রিবাঙ্কুরের শ্রীমূলম্ পরিষদে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮),—"আইনতঃ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজার পক্ষে তাঁহার অবিভক্ত ক্ষমতা ও একতেয়ার

(রাজ্য শাসন সম্পর্কে) অপর কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত করা সম্ভব নহে।" স্যার ষণ্মুখম চেট্টী স্যার রামস্বামীর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। আইনগত অসুবিধার কথা স্মরণ রাখিয়াও তিনি বলিয়াছেন, সমস্যাটি বিঘ্ন-কণ্টকিত হইলেও সে বিঘ্ন অনতিক্রম্য নহে। রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে একটা বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একটা মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। স্যার ষণ্মুখমের অভিমত সংস্কারপন্থী বাস্তববাদী রাজনীতিকের অভিমত। তৎসত্ত্বেও একথা খুবই সত্য যে, রাজচক্রবর্ত্তীর প্রতি বাধ্যবাধকতা পূরণের দায়িত্ব বহন করিয়া কোন রাজার পক্ষেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। তবে প্রজাধিকার সম্পর্কে রাজনৈতিক বিভাগ ও সামন্তসমাজ বরাবরই একমত,—এইজন্য এ প্রশ্ন কোন কালেই উঠে নাই।

শাসন সংস্কার ও পুনর্ব্বিন্যাস :

দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রশ্নকে দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাসের সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সম্ভব নহে। দায়িত্বশীল এবং আধুনিক ধরণের জনকল্যাণকামী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আর কিছু না হইলেও যে কোন রাজ্যের একটা নিম্নতম জনসংখ্যা, আয়তন এবং বাৎসরিক রাজস্ব থাকা প্রয়োজন। ভারতের ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বুইটি রাজ্যের পক্ষেই আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ, সঙ্গতি ও ক্ষমতার দিক হইতে এককভাবে দায়িত্বশীল এবং আধুনিক মানদণ্ড অনুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। কতগুলি রাজ্যের সম্পদ ও সঙ্গতির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

বাটলার কমিটি তৎকালীন দেশীয় রাজ্যসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) যে সমস্ত রাজ্য নিজ অধিকার বলে নরেন্দ্রমণ্ডলের সদস্য······১০৯টি রাজ্য ;

(২) যাহারা ১২ জন নির্ব্বাচিত সদস্য প্রেরণ করিবার অধিকারী······১২৬টি রাজ্য ;

(৩) এষ্টেট্, জায়গীর ও অন্যান্য প্রকার······৩২৭টি রাজ্য ;

প্রথম দুই শ্রেণীর রাজ্যসমূহের প্রজাদের উপর "কমবেশী কিছু রাজনৈতিক ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের, শাসনের ও বিচারের ক্ষমতা আছে।" কাথিয়াবাড় ও গুজরাটের ৩২৭টি রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ২৮৬টি রাজ্য বিভিন্ন থানায় বিভক্ত। রাজচক্রবর্ত্তীর স্থানীয় প্রতিনিধির অফিসারদের এই সব থানার উপর বিভিন্ন প্রকারের ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কর্ত্তৃত্ব ছিল। এই সব রাজ্যের ১০৯টির আয়তন ১০ হইতে ১০০ বর্গমাইল। ১১৬টির আয়তন ১ হইতে ১০ বর্গমাইল মাত্র। ১৩টি রাজ্যের আয়তন এক বর্গমাইলও নহে! ইষ্টার্ণ ষ্টেটস্ এজেন্সীর মধ্যে যে ৪২টি রাজ্য আছে তাহার মধ্যে ত্রিপুরা, কুচবিহার ও ময়ূরভঞ্জ ছাড়া বাকী আর সবাইর অবস্থাও এইরূপ। পাঞ্জাবের সিমলা পাহাড়িয়া অঞ্চল, খাসিয়া পাহাড় এবং কোলাপুর ছাড়া দাক্ষিণাত্য রাজ্যসমূহের অবস্থাও ভিন্নতর নহে। মধ্যভারত ও রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যের অবস্থাও মোটামুটি ভাবে ঐরূপ।

রাজস্বের দিক হইতেও এই সমস্ত রাজ্যের আয় এক একটি সাধারণ জমিদারীর আয়ের চাইতে বেশী নয়। গুজরাটের চৌদ্দটি রাজ্যের বাৎসরিক আয় (ডাঙ্গ ষ্টেটস্) মাত্র ২৪,২৯৮ টাকা (ষ্টেটস্‌ম্যান

ইয়ার-বুক ১৯৪৬-পৃঃ ১৭১)। ইষ্টার্ণ ষ্টেট্‌স এজেন্সীর ৪২টি রাজ্যের মোট বাৎসরিক আয় ৪,৩৫,৩০,৯১৩ টাকা ; তন্মধ্যে ত্রিপুরা, কুচবিহার ও ময়ূরভঞ্জের আয় এক কোটি সাতষট্টী লক্ষ। উড়িষ্যারও ছত্রিশগড়ের বাকী ৩৯টি রাজ্যের আয় আড়াই কোটি টাকার মত। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা ও ভাওয়ালপুর ছাড়া নাভা, কর্পূরতলা, ফরিদকোট ও সিন্ধুর খয়রাপুর সহ ১৫টি রাজ্যের মোট বাৎসরিক রাজস্ব আনুমানিক ২৪৯·৭৫ লক্ষ অর্থাৎ আড়াই কোটি টাকার মত। পাতিয়ালার আয় এক কোটি তিরাশি লক্ষ। কাজেই জনসংখ্যা এবং আয়তনের দিক হইতেও এই সব ক্ষুদ্র রাজ্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ইউনিট হইবার দাবী করিতে পারে না।

এই সব রাজ্যে শাসন সংস্কার করিতে হইলে ইহাদের পুনর্ব্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। ১৯৩৯ সালের ১৩ই মার্চ্চ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো নরেন্দ্রমণ্ডলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সহযোগিতার ও দল বাঁধিবার আশু প্রয়োজন সমুপস্থিত। ইতিপূর্ব্বে কোন উপলক্ষেই এত বেশী প্রয়োজন দেখা দেয় নাই। কেননা এই সব রাজ্যের সঙ্গতি এত সীমাবদ্ধ যে, আধুনিক মানদণ্ড অনুসারে "প্রজাদের দাবীদাওয়া পূরণ করা ইহাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে। এই অবস্থায় তিনি এই সব রাজ্যকে "শাসন-তান্ত্রিক ব্যাপারে প্রতিবেশীর সহিত যথাসম্ভব মিলিত হইবার" উপদেশ দেন। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া মনে করেন—"অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যকেই বৃটিশ ভারতের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইবে, নতুবা বড়লাটের পরামর্শ অনুসারে সন্নিহিত দেশীয় রাজ্যের সহিত মিলিত হইতে হইবে।" কেবল দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্যই নহে, আধুনিক মানদণ্ড অনুসারে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্যও এই মিলন অপরিহার্য্য। দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন বরাবরই দায়িত্বশীল

গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাসের দাবী জানাইয়াছে।

মিলিত "রাইখ্" গঠনের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীও এই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের স্রষ্টারা শাসকদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন এবং এই সব ক্ষুদ্র রাজ্যকে জার্ম্মাণ রাইখের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া সমস্যার সমাধান করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রজা আন্দোলন ও তাহার লক্ষ্য

সাম্রাজ্যবাদী বেয়নেট-রক্ষিত সামন্ত স্বৈরাচারের বহুমুখী শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষ বরাবরই ছিল। এই অসন্তোষ নানাভাবে আত্মপ্রকাশও করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পূর্ব্বে ইহা সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনেব রূপ পরিগ্রহ করে নাই। মিঃ জে, টি, গুইন "কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্য" নিবন্ধে লিখিয়াছেন,—জাতিগত ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে সমস্ত জিনিষ আবশ্যক কোন রাজ্যেরই তাহা নাই। সীমান্তগুলি স্বভাবতঃ কৃত্রিম ; জাতি, ভাষা অথবা কৃষ্টির পার্থক্যের সহিত সম্পর্কশূন্য। তাছাড়া রাজবংশের সহিত রাজ্যের সম্পর্ক প্রায়শঃই কৃত্রিম অথবা আকস্মিক—কোন সম্পর্কই ১৯০ বৎসরের বেশী নহে। অপর পক্ষে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সহিত বৃটিশ ভারতের ভ্রাতাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধন প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই সুপ্রাচীন এবং বিশেষ শক্তিশালী। অতএব, একথা অনায়াসেই বলা যায় যে, রাজার সহিত প্রজাদের প্রীতির বন্ধন যতটা দৃঢ় বলিয়া প্রচার করা হয় উহা তদপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল। (ইণ্ডিয়া টু-ডে পৃঃ ৩৬০)

দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সহিত বৃটিশ ভারতের জনগণের এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনই তাহাদের রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা জোগাইয়াছে। শ্রী এম, সি, রঙ্গআয়ার সত্যই বলিয়াছেন,—'আজ যদি গণভোট গ্রহণ করা হয়, তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজারা সানন্দে বৃটিশ ভারতের সহিত যুক্ত হইবার পক্ষে মত প্রকাশ

করিবে। কেবল মাত্র বৃটিশের করুণাতেই আজও দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব আছে।' (ইণ্ডিয়া টু-ডে পৃঃ ৩৬০)

বৃটিশ ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি এই কৃত্রিম সীমান্ত রেখা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। প্রজা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলন অতি দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। মৌলিক প্রজাধিকার লাভের সংগ্রামে প্রতিটি তাঁবেদার রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার স্বৈরাচারী বুনিয়াদ কম্পমান।

প্রজা আন্দোলন ও কংগ্রেস :

দেশীয় রাজ্যের এই গণচেতনা জাতীয় কংগ্রেসের নীতিরও ক্রমিক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। কংগ্রেস প্রথমে দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন পরিচালনা করিতে চাহে নাই। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রাজন্য-সমাজের নৈতিক সমর্থন লাভের আশাতেই দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে "হস্তক্ষেপ না-করার" নীতি অনুসৃত হয়।

গান্ধীজীর মতানুসারেই জাতীয় কংগ্রেস প্রথম দিকে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে "নিরপেক্ষতা' অবলম্বন করে। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীজী বলেন,—"এ পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া কংগ্রেস রাজন্য সমাজের উপকার করার চেষ্টাই করিয়াছে।" গান্ধীজী আরও বলেন,—"আমি অনুভব করি এবং জানি যে, তাঁহারা (রাজন্য সমাজ) মনে মনে প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি একজন সাধারণ লোক এবং তাঁহারা ভগবানের কৃপায় বড়লোক—রাজা, এই পার্থক্য ছাড়া আমার ও তাঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। আমি তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করি, তাঁহাদের সকলের সমৃদ্ধি কামনা করি।" (ইণ্ডিয়া টু-ডে পৃঃ ৩৬৬)।

রাজন্য সমাজ সম্পর্কে গান্ধীজীর এই মনোভাবের কারণ তাঁহার রাজন্যপ্রীতি নহে। কিম্বা দেশীয় রাজ্যের আট কোটি নির্য্যাতিত নর-নারীর দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগ সম্পর্কে তিনি উদাসীনও ছিলেন না। গান্ধীজী বরাবর এই মত পোষণ করিয়াছেন যে, ভারতের সমস্ত অনাচার ও দুর্ভোগের কারণ বৈদেশিক শাসন। ইহার অবসান ঘটিলে ভারতের সম্মিলিত শুভবুদ্ধি সমস্ত অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবসান ঘটাইতে পারিবে। কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগের ক্রীড়নক এই সামন্ত সমাজের শুভবুদ্ধির প্রতি গান্ধীজীর এই আস্থা তাঁহার অনুগামীদের অনেকেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল পর্য্যন্ত গান্ধীজীর "স্ব-বিরোধিতার" যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গোল টেবিল বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন—'কংগ্রেস মূলতঃ গোটা ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের মূক, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট জনগণের প্রতিনিধি—ইহারা বৃটিশ ভারতের প্রজা, কি দেশীয় রাজ্যের প্রজা তাহাতে কিছুই আসে যায় না।' এই পদদলিত ও নিপীড়িত জনগণের প্রতিনিধি-স্থানীয় কংগ্রেসের কর্ণধারের পক্ষে একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থাকে সমর্থন করা অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। কাজেই দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গান্ধীজীর "হস্তক্ষেপ না-করার" নীতি জওহরলালজীর নিকট স্ব-বিরোধিতা মনে বলিয়া হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের অবস্থার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—"দেশীয় রাজ্যে যখন এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান তখন কংগ্রেসের পক্ষে প্রজাদের মৌলিক অধিকারের দাবী সমর্থন করা এবং বে-পরোয়া দমন নীতির সমালোচনা করা খুবই উচিত। কিন্তু গান্ধীজী দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসকে এক অভিনব নীতি অনুসরণ করান। দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার ঢাক-ঢাক নীতি তিনি দেশীয় রাজ্যে সংঘটিত বেদনাদায়ক ঘটনাবলী এবং কংগ্রেসের উপর ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট

সমূহের অহেতুক আক্রমণ সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন। মনে হয়, কংগ্রেসের সমালোচনা রাজন্যবর্গকে অসন্তুষ্ট করিবে এবং তাহাদের "দীক্ষিত" করা আরও কঠিন হইবে—এই শঙ্কা হইতেই এইরূপ করা হইয়াছে। ১৯৩৪ সালে দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভাপতি শ্রী এন, সি, কেলকারের নিকট লিখিত এক পত্রে গান্ধীজী এই নিরপেক্ষতা নীতিকে সমীচীন ও বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া অভিহিত করেন এবং দেশীয় রাজ্যের আইনসঙ্গত ও শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাহা বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক। তিনি লিখিয়াছেন, "বৃটিশ আইনে এই সমস্ত রাজ্যের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। বৃটিশ ভারত বলিয়া অভিহিত অঞ্চলের আফগানিস্থান বা সিংহলের নীতি নির্দ্ধারণের যে ক্ষমতা আছে, দেশীয় রাজ্যের নীতি নির্দ্ধারণের তদপেক্ষা বেশী ক্ষমতা নাই। ইহা আদৌ বিস্ময়কর নহে যে, নরমপন্থী প্রজা সম্মেলন এবং উদারনৈতিকেরা পর্য্যন্ত গান্ধীজীর এই অভিমত ও পরামর্শ সমর্থন করিতে পারেন নাই।"

"কিন্তু রাজন্য সমাজ এই অভিমত সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন এবং ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এক মাসের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের জাতীয় কংগ্রেস নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সভাসমিতি ও সভ্যসংগ্রহ বন্ধ করিয়া দেন। এই কাজের সমর্থনে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্ট বলেন যে "দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ" নিজেরাই এই উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, তাঁহারা গান্ধীজীর বিবৃতির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, বৃটিশ ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পর (ষ্টেটস এই আন্দোলনে জড়িত হয় নাই) এবং ভারত সরকার কংগ্রেসকে আইন-সম্মত প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করার পর এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আরও মজার কথা, এই সময়ে ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের প্রধান

রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন কংগ্রেস ও হোমরুল লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার" (পরে তিনি লিবারেল হন)।

—"গান্ধীজী-নির্দ্দেশিত কংগ্রেসের নীতি অনুসারে স্বাভাবিক অবস্থায় কংগ্রেসের উপর ত্রিবাঙ্কুর গবর্ণমেণ্টের এই অহেতুক আক্রমণ সম্পর্কে একটি কথাও বলা হইল না। কয়েকজন লিবারেল নেতা পর্য্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিমত লিবারেলদের চাইতেও সংযত ও নরমপন্থী। নেতৃবৃন্দের মধ্যে সম্ভবতঃ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকেই এই বিষয়ে গান্ধীজীর সহিত তুলনা করা যায়।" সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলও গান্ধীজীর এই হস্তক্ষেপ না করার নীতি সমর্থন করিতেন। ১৯৩৫ সালের ৬ই জানুয়ারী বরোদায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন— "দেশীয় রাজ্য যে সমস্ত বাধানিষেধ আরোপ করিবেন তাহা মানিয়া লইয়াই ভারতীয় রাজ্যের শ্রমিকদের কাজ করা উচিত এবং শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা না করিয়া শাসক ও শাসিতের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত।"

নেহরুজী আরও বলেন,—"গান্ধীজী বরাবরই দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এইরূপ সাবধানী মনোভাব অবলম্বন করেন নাই। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসবের একটি সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। সভাপতি ছিলেন একজন নৃপতি। শ্রোতাদের মধ্যেও বহু নৃপতি ছিলেন। গান্ধীজী তখন সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়াছেন। সর্ব্বভারতীয় রাজনীতির বোঝা তখনও তাঁহার স্কন্ধে পড়ে নাই। অন্তরের অন্তস্তল হইতে তিনি বক্তৃতা করেন এবং রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের হালচাল ও অর্থহীন বিলাসব্যসন পরিহার করিতে বলেন। তিনি বলেন—'রাজন্যবর্গ!

যান—নিজেদের হীরা জহরৎ বিক্রয় করিয়া দিন।' হীরা জহরৎ বিক্রয় না করিলেও তাঁহারা যে চলিয়া গেলেন তাহা খুবই সত্য। শঙ্কিত হৃদয়ে একে একে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে তাঁহারা সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। এমন কি সভাপতিও বাদ গেলেন না। মিসেস্ আনি বেশান্তও সভায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজীর মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনিও সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।"

—"শ্রীএন, সি, কেলকারের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধীজী আরও বলেন—"দেশীয় রাজ্যসমূহ প্রজাদের স্বায়ত্তশাসন (অটোনমী) দিক ইহা আমার অভিপ্রেত। রাজন্যবর্গ নিজেদের শাসিত জনগণের অছি হিসাবে গণ্য করুন এবং অছি হউন আমি তাহাও চাহি।" অছিগিরির মতবাদের মধ্যে যদি কিছু থাকে তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন নিজেকে ভারত সরকারের অছি বলিয়া দাবী করেন আমরা আপত্তি করি কেন? ভারতে তাঁহারা বিদেশী ইহা ব্যতীত আমি কোন প্রভেদই দেখি না। ভারতের জনগণের মধ্যেও দৈহিক বর্ণের, জাতিগত উৎপত্তির এবং সংস্কৃতির প্রায় সমান পার্থক্যই বিদ্যমান।"

—"গত কয়েক বৎসর বহু বৃটিশ অফিসার অতিক্রুত দেশীয় রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অনিচ্ছুক ও অসহায় রাজন্য সমাজের উপর ইহাদের চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকার বরাবর দেশীয় রাজ্যর উপর কঠোর কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে ইহা ব্যতীত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন রাজ্যের অভ্যন্তরেও কর্ত্তৃত্বের ফাঁস কঠোর করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সুতরাং এই সব রাজ্য যখন কোন কিছু বলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারেরই কণ্ঠ। সামন্ততান্ত্রিক পটভূমির পূর্ণ সুযোগ লইয়া ভিন্ন স্বরে উহা বলা হইতেছে মাত্র।"

পরিশেষে জওহরলালজী বলেন,—"আমি উপলব্ধি করি যে, অন্যান্য স্থানের ন্যায় সমস্ত দেশীয় রাজ্যে সব সময় একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব

নহে। বস্তুতঃ বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও আলাদা ভূমি সমস্যা, শিল্প সমস্যা, সাম্প্রদায়িক ও শাসন সমস্যা আছে এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় একই নীতি প্রযোজ্য নহে। কিন্তু অবস্থা দ্বারা কর্ম্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত হইলেও আমাদের সাধারণ নীতি বিভিন্ন স্থানে আলাদা হওয়া উচিত নহে। যে জিনিষ এক জায়গায় খারাপ তাহা অন্যত্রও খারাপ। না হইলে অভিযোগ উঠিবে, প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগ উঠিয়াছে যে, আমাদের কোন দৃঢ় ও সমদর্শী নীতি বা কর্ম্মপন্থা নাই এবং আমরা নিজেদের জন্য ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় আছি।.........

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে টমাস্ পেইন বার্ক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি প্রসঙ্গে আমার তাহার কথা মনে পড়িতেছে।—পেইন বলিয়াছিলেন, "মুমূর্ষু পাখীর কথা বিস্মৃত হইয়া তিনি পালকের জন্য শোক করিতেছেন।" গান্ধীজী কোন কালেই "মুমূর্ষু পাখীর" কথা বিস্মৃত হন না, তবে "পালকের" জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন?"

(আত্মজীবনী পৃঃ ৫৩২—৫৩৪)।

যাহা হউক, কংগ্রেসের নীতির এই স্ব-বিরোধিতা বেশী দিন টেঁকে নাই। জনগণের পারস্পরিক বন্ধন অচিরেই এই ভ্রান্তনীতির বাধ ভাঙ্গিয়া দিল। ঘটনাপ্রবাহ স্ব-বিরোধী মনোভাব বর্জ্জনে বাধ্য করিল। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গান্ধীজীর নীতি কংগ্রেসের একাংশ কোনকালেই সমর্থন করেন নাই। কিন্তু ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের যে গঠনতন্ত্র ছিল তাহাতে কংগ্রেস নেতৃত্বে দেশীয় রাজ্যে কমিটি গঠন করা যায় না। অথচ অসহযোগ আন্দোলনের পর বহু রাজ্যেই বিভিন্ন প্রকৃতির গণ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের অনেকেই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকামী। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কলিকাতা

কংগ্রেস বহু কারণেই জাতির জীবনে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনের পক্ষেও এই অধিবেশন ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বলেন—"দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য অধিবেশনে দাবী উত্থাপন করা হয়। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কলিকাতা প্রস্তাব সেই অবধি অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কেননা ইহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশে পরবর্ত্তী কালে বহু আন্দোলন দেখা দিয়াছে।" (কংগ্রেসের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩২৯)। প্রস্তাবে বলা হইল,—দেশীয় রাজ্যে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস রাজন্যবর্গের নিকট দাবী জানাইতেছে এবং সভাসমিতি করা, বাক্‌স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা জাতীয় প্রাথমিক ও মৌলিক নাগরিক অধিকার সম্পর্কে অবিলম্বে ঘোষণা জারী অথবা আইন প্রণয়নের দাবী করিতেছে। লাহোর কংগ্রেসেও (১৯২৯) দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় এবং কলিকাতার ন্যায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতা ও লাহোর সিদ্ধান্তে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইলেও ইহা দেশীয় রাজ্যের নবজাত প্রজা আন্দোলনকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। এই প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের প্রতি পরোক্ষ নৈতিক সমর্থন জানাইলেও উহাতে সক্রিয়ভাবে কোন ভূমিকা গ্রহণ করিতে চাহে নাই। প্রজা-নেতৃত্ব জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছিল এই প্রস্তাবে তাহা পূর্ণ হয় না।

ডাঃ সীতারামিয়া "কংগ্রেসের ইতিহাসে" এই সময়কার অবস্থা নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—"হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) দেশীয় রাজ্যের প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। স্মরণ

থাকিতে পারে, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে এবং সেখানকার রাজনৈতিক জাগরণ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে একদল কংগ্রেসী গান্ধীজীর সহিত একমত ছিলেন না। সুতরাং ১৯৩৪ সালের ৬ই এপ্রিল এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ, দেশীয় রাজ্য ও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁহার নিজস্ব অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। ইহা কংগ্রেসের একাংশের মতের বিপরীত। দেশীয় রাজ্যের জনগণ তাহাদের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে বাহিরের (!) সাহায্য কামনা করে এই ধারণা বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিল। তাহারা শীঘ্রই তাহাদের ঘর গুছাইয়া নিল এবং কমিটি গঠন করিয়া ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে করাচীতে এক সর্ব্বভারতীয় সম্মেলনে মিলিত হইল। দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের অগ্রগতির পথে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং প্রায় কংগ্রেসের সমাদর্শসম্পন্ন প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত করে। সর্ব্বত্র গণপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাদের অনেকেই এই সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। কয়েকটি রাজ্যের প্রজামণ্ডল বাহিরের প্রজা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত না হওয়াই সমীচীন মনে করিলেন—কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত হইবার কথা তো ওঠেই না। কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি ও প্রজা প্রতিষ্ঠান উভয়ই গঠিত হইল। বস্তুতঃ প্রজারা এক বিভ্রান্তিকর অসুবিধার সম্মুখীন হইল। কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের টান যেমনি অকুণ্ঠ তেমনি আন্তরিক। কিন্তু তাহাদের নিজেদের গবর্ণমেণ্টের সহিত লড়াই করিতে হইতেছিল কেননা উহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহে। কোন কোন রাজার প্রজা প্রতিষ্ঠান গঠনেও আপত্তি ছিল। ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের যে গঠনতন্ত্র ছিল তাহাতে তাহার পক্ষে দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি গঠনের অনুমতি দেওয়া সম্ভব

নহে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কলিকাতা অধিবেশনের পর এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়।"

—"কলিকাতায় সামান্য সুবিধা অর্জ্জন করিয়া দেশীয় রাজ্যের জনগণ পরবর্ত্তী কালে আরও সুযোগ লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা দাবী করিতে লাগিল যে, দেশীয় রাজ্যের জনগণের বোঝা কংগ্রেসই বহন করুক্—অন্ততঃপক্ষে প্রজাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করুক্। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের নিজেরও কতগুলি অসুবিধা ছিল। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের যদি ব্যক্তিগত ভাবে রাজ্যের বাহিরের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সভ্য হইবার সুযোগ দেওয়া হইত তবে উহা দেশীয় রাজ্য এবং তাহার একজন প্রজার সমস্যা হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু রাজ্যে যদি শাখা প্রশাখা সহ নিয়মমাফিক কমিটি গঠন করা হয় এবং তাহারা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার অনুমোদন লাভ করে, তাহার গঠনতন্ত্রও আদর্শ-নির্দ্দেশ পালন করে এবং তাহার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করে, তবে স্থানীয় কমিটির সহিত দরবারের সংঘর্ষ গোটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এখন প্রশ্ন এই যে, কংগ্রেস কি ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের রকমফের স্থানীয় অবস্থার সহিত নিজেকে জড়াইয়া ফেলিবে? বাস্তব রাজনীতির দিক হইতে কংগ্রেসের পক্ষে এই কাজ নিঃসন্দেহে সম্ভব নহে। কাজেই হরিপুরায় এই সমস্যা দেখা দিল যে, দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি গঠনের অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা এবং বৃটিশ ভারতের কংগ্রেস গঠনতন্ত্র দেশীয় রাজ্যেও সমভাবে প্রযোজ্য হইবে কি না। দেশীয় রাজ্যের প্রজা প্রতিষ্ঠান হরিপুরা অধিবেশনের পূর্ব্বে নবশরীতে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়াছিল। তাহারা এই অসুবিধা দূর করার এক সহজ সমাধান

বাহির করিল। ভারত শব্দের অর্থে যাহাতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাসহ ভারতের জনগণ বুঝায় এই মর্ম্মে তাহারা কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ১নং বিধানের সংশোধন দাবী করিল। দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতি সহানুভূতির প্রতীক হিসাবে এবং তাহাদের প্রতি কংগ্রেসের সাহায্যকারী মনোভাব জ্ঞাপনের জন্য দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে বলা হইল। এই কমিটি যাহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি, কৃষকদের অবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ষ্টেটের একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব সম্পর্কে কয়েকটি রাজ্যে বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনের পূর্ব্বে রিপোর্ট দেন তাহার জন্যও দাবী জানান হইল।......ওয়ার্কিং কমিটি হরিপুরায় যে খসড়া প্রস্তাব রচনা করেন তাহার যে অংশে দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি গঠন নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহা লইয়া তুমুল বাদানুবাদ হয়। মহীশুরের দৃষ্টান্ত এবং তথায় যে আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল তাহা হইতে স্বভাবতঃই এই ধারণা হইল যে, কংগ্রেস আপাততঃ মহীশুরের বাহিরে যখন ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিতেছে তখন তাহার পক্ষে এই আইন অমান্য আন্দোলনে জড়াইয়া পড়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে দেশের অন্যত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। ইহাও বলা হইল যে, আইন অমান্য আন্দোলনের প্রশ্নে কংগ্রেস সাহায্যার্থ আগাইয়া যাইতে পারে না ; গঠনমূলক কার্য্যাবলীর প্রশ্ন যদি দেখা দেয় তবে তাহার জন্য যে আলাদা সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান আছে তাহারাই প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে পারে। ইহারা কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলেও অনেকটা স্বাধীনভাবেই কাজ করিতেছে। অতএব ষ্টেট্ কমিটিগুলি কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিলে উহা তাহাদেরই অসুবিধার কারণ হইবে। সময়ের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

সেই পর্য্যন্ত প্রজাদের পক্ষে নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করাই সমীচীন। কংগ্রেস যে কোন সময়েই তাহার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারিবে। প্রজা সম্মেলনের প্রতিনিধিরা এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধিতা করেন। বৃটিশ ভারতের কোন একটি প্রদেশের ন্যায় মহীশুর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার অনুমতি চাহিয়াছিল মাত্র। গণ-সংযোগের যে নীতি সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে তাহার কথাও সকলেই জানিত; সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তে সকলেই বিস্মিত হইল।...ভারতবর্ষকে সামগ্রিক ভাবেই জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। একাংশ অপরাংশকে পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু ৫৬২টি রাজ্যকে আমরা আলষ্টারের মতও থাকিতে দিতে পারি না। ওয়ার্কিং কমিটি দেশীয় রাজ্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠনের উপদেশ দিলে তাহার সুযোগ লইয়া স্বার্থবান পক্ষ নানা ছল চাতুরীর আশ্রয় লইতে পারে এবং অচিরেই বিভিন্ন রাজ্য সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত প্রতিষ্ঠানে ভরিয়া যাইতে পারে। জাতীয় কংগ্রেসই ভারতের মুক্তির একমাত্র বাহক। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানই সমস্ত শক্তির উৎস—সমস্ত জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রাণ কেন্দ্র। কংগ্রেসের এই প্রাণশক্তিকে যদি দেশীয় রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করা না যায়, তবে আমরা দেশীয় রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ বাঁচাইয়া রাখিব। অবশেষে একটা আপোষ হইল। উহাতে দেশীয় রাজ্যে কংগ্রেস কমিটি গঠন নিষিদ্ধ না করিয়া খসড়া প্রস্তাবের পঞ্চম প্যারাকে নিম্নোক্তরূপে সংশোধন করা হইল:—"অতএব কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিতেছে যে, বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্যের কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিবে এবং কংগ্রেসের নামে অথবা তাহার নেতৃত্বে কোন পার্লামেণ্টারী কাজ অথবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিতে পারিবে না। কংগ্রেসের নামে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কেও সংগ্রাম পরিচালনা করা যাইবে না। এই সর্ত্তাধীনে যেখানে বর্ত্তমানে

কংগ্রেস কমিটি আছে তথায় অবশ্যই সংগঠনের কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।"

—"এইখানেই ব্যাপারটির শেষ হইল না। দেশীয় রাজ্যের প্রজা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগহীন কতিপয় সদস্য প্রকাশ্য অধিবেশনে আপোষ মীমাংসা বানচাল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রজা সম্মেলনের মুখপাত্রদের দৃঢ়তায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এইদিন হইতে প্রজা আন্দোলনের কর্ম্মী এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অধিকতর মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় —মোটামুটিভাবে সমস্ত বিষয়েই উভয়ে একমত পোষণ করিতে থাকেন। দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ, স্বতন্ত্র রেল লাইন দিয়া যে দুইটি ট্রেণ চলিতেছিল তাহারা মিলিত হয় এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে এক সম্মিলিত ট্রেণ হিসাবে চলিতে থাকে। দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র উপদেষ্টা।" (কংগ্রেসের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৭৮-৮০)।

এছাড়া হরিপুরা কংগ্রেস দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত সাধারণ নীতি ঘোষণা করেন,—"অবশিষ্ট ভারতের ন্যায় দেশীয় রাজ্যের জন্যও কংগ্রেস একই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দাবী করে এবং দেশীয় রাজ্যকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য করে। উভয়কে কোন মতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দেশীয় রাজ্য সহ গোটা ভারতের পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের লক্ষ্য; কেননা পরাধীনতায় ভারতের একত্ব যেমন রক্ষিত হইয়াছে, স্বাধীনতায়ও তাহা রক্ষা করিতে হইবে।"

"কংগ্রেস কেবলমাত্র সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রই মানিতে পারে যাহাতে দেশীয় রাজ্য অবশিষ্ট ভারতের ন্যায় সমান স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার লইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রাংশ হিসাবে যোগদান করিতে পারে।"

"অতএব, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দাবী করে এবং বহু রাজ্যের বর্ত্তমান অনগ্রসর অবস্থা, স্বাধীনতার চূড়ান্ত অভাব এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমনের প্রচেষ্টার নিন্দা করে।"

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের এই সাধারণ নীতি ১৯৩৮ সালে প্রজা আন্দোলনের নৈতিক শক্তি জোগাইয়াছে মাত্র। দেশীয় রাজ্যে জনগণের এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংগ্রাম প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস তাহাতে জড়াইয়া পড়িতে চাহে নাই। আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম পরিচালনার জন্য প্রজাদের নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ত্রিপুরী অধিবেশনে (১৯৩৯) এই অবস্থার খানিকটা পরিবর্ত্তন ঘটে। ত্রিপুরী প্রস্তাবে বলা হয়ঃ—"কংগ্রেস মনে করে যে, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে হরিপুরা প্রস্তাব আশানুরূপ ফল দিয়াছে। এই প্রস্তাব দেশীয় রাজ্যের জনগণকে সংগঠিত হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার সে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে তাহা দ্বারা ইহার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়। প্রজাদের আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ করার জন্যই হরিপুরা প্রস্তাব গৃহীত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এই নীতি গ্রহণ করা হয়। ইহাকে কোন কালেই বাধ্যবাধকতা হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের পরিচালনা করার এবং তাহাদের জন্য কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রয়োগ করার অধিকার কংগ্রেসের আছে—ইহা তাহার কর্ত্তব্যও বটে। জনগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ দেখা দিতেছে তাহার দরুণ কংগ্রেসের স্বেচ্ছায় আরোপিত সংযম শিথিল করিতে হইতে পারে কিম্বা উহা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করিতে হইতে পারে,—ফলে দেশীয় রাজ্যের জনগণের সহিত কংগ্রেসের মিলন আরও ঘনিষ্ঠতর হইবে।"

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসনীতির এই আংশিক পরিবর্ত্তনকে *সাম্প্রতিক জন জাগরণ—বিশেষ করিয়া রাজকোটের ঘটনাবলীর পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে।* ডাঃ সীতারামিয়া এই পটভূমির নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেনঃ—"হরিপুরায় প্রাণের মিল ঘটিবার পর কংগ্রেসের উপর প্রজাদের আস্থা বাড়িয়া যায়। কংগ্রেসও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আন্তরিকভাবে প্রজাদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। মহীশুরে বল্লভভাই-কৃপালনী মিশনের সাফল্যে দেশীয় রাজ্যের জনগণ আরও আশ্বস্ত বোধ করেন এবং ইহাতে কংগ্রেসকর্ম্মীদের আত্মবিশ্বাস এত বৃদ্ধি পায় যে, দেশীয় রাজ্যকে কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করিবার এক প্রস্তাব ওঠে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অনুভব করিলেন যে, সর্ব্বভারতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য দেশীয় রাজ্যের সমস্যা সমাধানে কংগ্রেস প্রজাদের সুনির্দ্দিষ্ট সাহায্য করিতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের জনগণ সকৃতজ্ঞ ভাবে সর্দ্দার প্যাটেলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। ঘটনাপ্রবাহ যে রীতি চালু করিয়াছে তাহা কায়েম করার জন্য সর্ব্বভারতীয় সমস্যার সমাধানে দেশীয় রাজ্যের রাজা ও প্রজাদের পরামর্শ ও সাহায্যদানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির একটি সাব-কমিটি গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। ইহাও আশা করা গিয়াছিল যে, রাজন্যবর্গ এবং তাহাদের উপদেষ্টাগণ এই কমিটি গঠনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবেন এবং বিনা-দ্বিধায় ইহার সাহায্য গ্রহণ করিবেন। যে কোন কারণেই হউক, সাব-কমিটি গঠন করা হইল না। কিন্তু কংগ্রেসের উর্দ্ধতন নেতৃবর্গের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। রাজকোটের ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

—"রাজকোট বড় রাজ্য নয়; কাথিয়াবাড়ে যে তিনশ' ষাটটি রাজ্য আছে তাহাদের বৃহত্তমও নহে। ভবনগর, পোর বন্দর, লিম্বদী, ঝাবুয়া,

গোণ্ডাল, নবনগর, রাজকোটের চাইতে বৃহত্তর। কিন্তু রাজকোটে পশ্চিম ভারত দেশীয় রাজ্যের এজেণ্ট জেনারেলের সদর কার্য্যালয় থাকায় ইহাকে কাথিয়াবাড় রাজ্যের রাজধানী বলা যায়। তাছাড়া রাজকোট গান্ধীজীর নাম ও তাঁহার যৌবনের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। গান্ধীজীর পিতা বহু বৎসর রাজকোটের দেওয়ান ছিলেন।... ১৯৩৮ সাল হইতে দেশীয় রাজ্যের প্রজা প্রতিষ্ঠান কয়েকটি মুখ্য রাজ্যে কাজ করিতেছিল। শাসন সংস্কারের আন্দোলন এখানকার ন্যায় অন্যত্রও দমননীতির সম্মুখীন হইতেছিল। রাজকোটের সত্যাগ্রহ দেওয়ান বীরবলের কঠোর দমন নীতির সম্মুখীন হয়। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে এমন একটা অবস্থা দেখা দিল যে, কংগ্রেসপন্থীরা হরিপুরা ও দিল্লী প্রস্তাবকে আরও শিথিল করার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। দিল্লী প্রস্তাবে (১৯৩৮, সেপ্টেম্বর) নিখিল ভারত কংগ্রেস তাহার সামর্থ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিরপেক্ষতা নীতির কথা ঘোষণা করে। ইহাতে বলা হইল—"হস্তক্ষেপ না করার নীতি কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতার স্বীকৃতি মাত্র।" প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস কোন আন্দোলনে যোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। ব্যক্তিগতভাবে যে কেহ যে কোন সাহায্য করিতে পারিবে। এই প্রস্তাব অনুসারে একদল সত্যাগ্রহী রাজকোটের আন্দোলনে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিল। কিন্তু অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছিল। "রাজকোটের সংগ্রাম অনতি-বিলম্বেই ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করিল।"

(কংগ্রেসের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১০৬—১০৭)।

অনতিবিলম্বেই গোটা ভারতের দৃষ্টি রাজকোটের প্রতি নিবদ্ধ হইল। "অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজকোটের সংগ্রামও মূলতঃ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সমর্থিত দায়িত্বহীন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত প্রগতি শক্তির সংগ্রাম। ইহার ফলাফল অবশ্যই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর গতি নির্ণয়

করিবে এবং ভারতের সর্ব্বত্র ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হইবে।" গণ-আন্দোলন দমনের জন্য লাঠি চালনা, গ্রেপ্তার, সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি সুপরিচিত দমননীতি বেপরোয়াভাবে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। ডজন খানেক সংবাদপত্রের প্রচার নিষিদ্ধ করা হইল। বোম্বাইর সত্যাগ্রহী দল রাজ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দী হইলেন। নিখিল ভারত প্রজা সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবলবন্ত রায় মেহতা, সর্দ্দার দুহিতা শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল ও শ্রীমতী মৃদুলা সরাভাই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কর্ত্তৃপক্ষ রাজকোট প্রজা পরিষদকে বে-আইনী ঘোষণা করিলেন। দেশীয় রাজ্যের বাহিরের লোকের আন্দোলনে যোগদান গান্ধীজীকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশীয় রাজ্যের দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে অভিনন্দিত করিয়া দেশীয় রাজ্যের বাহিরের জনগণকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন। এই সময়ে রাজকোটের ঠাকুর সাহেব ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মধ্যে এক চুক্তি হয়। কিন্তু ঠাকুর সাহেব চুক্তিসর্ত্ত পালন করিলেন না। অবস্থা আবার ক্রমাবনতির দিকে চলিল। গান্ধীজী রাজকোট অভিমুখে রওনা হইলেন। ত্রিপুরী অধিবেশন যখন চলিতেছে গান্ধীজী তখন রাজকোটে অনশনে। সুতরাং ত্রিপুরী সিদ্ধান্তকে এই পটভূমিতেই বিচার করিতে হইবে।

রাজকোটের দৃষ্টান্ত ও ত্রিপুরীর সিদ্ধান্তের পর জাতীয় নেতৃবৃন্দ দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। নিখিল ভারত দেশীয়রাজ্য প্রজা সম্মেলনের লুধিয়ানা অধিবেশনে দেশীয় রাজ্য ও প্রাদেশিক রাজনীতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও মতভেদও প্রশমিত হইল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রজা সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিলেন—ডাঃ পট্টভি হইলেন সহ-সভাপতি।

লুধিয়ানা ও উদয়পুর ঃ—দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন দুইটি রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছে—(১) প্রজাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি এবং পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা; (২) সর্ব্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লুধিয়ানায় যে সম্মেলন হয়, তাহার মূল প্রস্তাবের মধ্যে এই উদ্দেশ্য দুইটি প্রতিফলিত হয়। দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশীয় রাজ্যের জনগণের সংগ্রামকে অভিনন্দিত করিয়া সম্মেলন ঘোষণা করে,—ভারতের স্বাধীনতা লাভের বৃহত্তর সংগ্রামের সহিত এই সংগ্রামকে যুক্ত করিবার সময় আসিয়াছে। কেননা ইহা বৃহত্তর সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সম্মিলিত সর্ব্বভারতীয় সংগ্রাম অবশ্যই কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া এই সুপারিশ করা হয়,—যে সমস্ত রাজ্যের জনসংখ্যা বিশ লক্ষের কম এবং রাজস্ব পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কম তাহাদের প্রতিবেশী প্রদেশের সহিত যুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হইলে কেবলমাত্র ২১টি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে এবং বাকী পাঁচশতাধিক বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রজা সম্মেলনের দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টের দাবী দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বিলোপের দাবীও বটে।

লুধিয়ানা অধিবেশনের ছয় মাস পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধের ছয় বৎসরে দেশীয় রাজ্যের জনবল ও ধনবলকে নির্ম্মমভাবে সাম্রাজ্যবাদীর উদ্দেশ্যসাধনে উৎসর্গ করা হইল। ফলে দেশীয় রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে

এবং ভারতে সামন্ত স্বৈরাচারের অবসান ঘটাইবার দাবী সমধিক প্রাধান্য লাভ করে। রাজন্য সমাজ কি ভাবে রাজসেবা করিয়াছে কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। ভুপালের বাজেটের শতকরা চল্লিশ ভাগ, গোয়ালিয়রের মোট রাজস্বের শতকরা বিশভাগ এবং হায়দরাবাদের এক বৎসরের মোট আয় যুদ্ধায়োজনে উৎসর্গিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সৈন্যদল পোষণের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে কোটি কোটি টাকা আদায় করা হইয়াছে। গোয়ালিয়র বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পাঁচটি সৈন্যদল মোতায়েন রাখিয়াছে। এছাড়া বিভিন্ন তহবিলে চাঁদা, দান ও যুদ্ধঋণ ক্রয় করিয়া মুক্তহস্তে কোটি কোটি টাকা জোগান হইয়াছে। ফরিদকোটের ন্যায় রাজ্য, যাহার বার্ষিক আয় মাত্র ২৬লক্ষ টাকা, তাহাকেও ৬০লক্ষ টাকার "ডিফেন্স বণ্ড" ক্রয় করিতে হয়। এই অপচয় এবং জায়গীরদার ও চোরাকারবারীর বর্দ্ধিত শোষণ জনগণকে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিল যে, যুদ্ধক্ষান্তির পর কাশ্মীর হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত সমস্ত রাজ্যে গুরুতর খাদ্য ও ভূমি সঙ্কট দেখা দিল। বৃটিশ ভারতের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনাবলী,—১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকালে নেতৃবৃন্দের মুক্তি, আজাদ হিন্দ মুক্তি আন্দোলন, দেশব্যাপী শ্রমিক কৃষাণ ও যুব আন্দোলন দেশীয় রাজ্যের জনগণের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করিল। দমননীতির বিভীষিকা সত্ত্বেও তাহারা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে এবং দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়পণ আঞ্চলিক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে লাগিল। এই পটভূমিকাতেই প্রজা সম্মেলনের উদয়পুর অধিবেশন (১৯৪৫, ডিসেম্বর) আহূত হয় এবং "স্বাধীন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্যের জনগণ কর্ত্তৃক শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট" গঠন করা প্রজা আন্দোলনের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নেহরুজী তাঁহার

সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"অধিকাংশ রাজ্যকেই অনিবার্য্যভাবে প্রতিবেশী অঞ্চলের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইবে, কেননা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে ইহারা অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসকদের জন্য একটা বৃত্তির বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে এবং যোগ্যতা অনুসারে তাহাদের অন্য কাজে নিয়োজিত করিবার উৎসাহ দান করা যাইতে পারে। অপরাপর যে পনর বিশটি রাজ্য থাকিতে পারে তাহাদের যুক্তরাষ্ট্রের স্বায়ত্তশাসনশীল অংশ হিসাবে থাকিতে হইবে,—রাজন্যবর্গ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাধীনে "শাসনতান্ত্রিক কর্ত্তা" হিসাবে অবস্থান করিতে পারেন। কয়েকজন নৃপতি ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সুপ্রাচীন রাজবংশের বংশধর।"

উদয়পুর অধিবেশনে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়, গণপরিষদে কেবলমাত্র নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী করা হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের নিন্দা করা হয়। জনগণের দারিদ্র্য মোচন করিয়া তাহাদের অধঃপতনের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে সামন্ততান্ত্রিকতার অবসান ঘটান আবশ্যক, সভাপতির অভিভাষণে পণ্ডিতজী একথাও বলেন। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, লুধিয়ানার চাইতে উদয়পুরের সিদ্ধান্ত নরমপন্থী, রাজন্য সমাজের প্রতি আপোষমূলক। পণ্ডিতজীর অভিভাষণের মধ্যেই এই মনোভাব সুস্পষ্ট। রাজন্য সমাজ সম্পর্কে পণ্ডিতজী ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, পোলো খেলার ঘোড়া বাগে রাখার জন্য বা কুকুরের জন্মেতিহাস জানার জন্য যে জ্ঞান আবশ্যক গবর্ণমেণ্টের সমস্যা সমাধান করিতে তদপেক্ষা আরও বেশী কিছু জানা থাকা দরকার। উদয়পুরে ইহাদেরই তিনি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক বংশের উত্তরাধিকারী বলিয়া অভিহিত করেন। "মধ্যযুগের প্রতীক" দেশীয় রাজ্যকে "শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের" আধার বলিয়া অভিহিত করেন এবং

তাহাদের প্রতি আপাততঃ বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিবার উপদেশ দেন। গান্ধীজীও এই কথাই বলিতেন যে, বৃটিশের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভের সংগ্রাম যতদিন চলিবে ততদিন রাজন্য সমাজকে চটান সমীচীন নয়। জওহরলালজী পূর্ব্বে গান্ধীজীর এই মত সমর্থন করিতেন না এবং বলিয়াছেন যে, যতদিন দেশীয় রাজ্য থাকিবে বৃটিশ ভারত বা দেশীয় রাজ্য কুত্রাপি বৃটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটান যাইবে না।

পণ্ডিতজীর এই "নরম সুর" উদয়পুরের আহ্বানের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রজারা বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের দাবী করিতেছিল; উদয়পুর তাহাদের বৃটিশ ভারতের ন্যায় ভোটাধিকার গ্রহণের অনুরোধ জানাইল (শতকরা এগার জনের ভোটাধিকার)। দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে লুধিয়ানায় যে সুস্পষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তাহাও অস্পষ্ট করা হইল। লুধিয়ানা প্রস্তাবের ২০ লক্ষ অধিবাসী ও ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্বের স্থলে "পর্য্যাপ্ত লোক সংখ্যা ও রাজস্বের" কথা বলা হইল। তৃতীয়তঃ রাজন্যবর্গ সম্পর্কে "বন্ধুত্বমূলক" ও "স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার" নীতি অবলম্বনের কথা ঘোষণা করা হয়। চতুর্থতঃ কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা প্রজা সম্মেলনের কোন নির্ব্বাচিত পদ অধিকার করিতে পারিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রজা অন্দোলনের মধ্যে সুনিশ্চিত বিভেদ সৃষ্টি করিল এবং প্রজা সম্মেলনের ভাঙ্গনের পথ পরিষ্কার করিল।

যুদ্ধোত্তর কালে দেশীয় রাজ্যের বিস্ফোরকপূর্ণ পরিস্থিতি সামন্ত সমাজ ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উভয়কেই অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। উদয়পুরের প্রস্তাব তাহাদের খানিকটা আশ্বস্ত করিল। উদয়পুর অধিবেশনের সপ্তাহ দুয়েক পরেই লর্ড ওয়েভেল নরেন্দ্রমণ্ডলকে

আহ্বান করেন এবং কিভাবে তাঁহারা শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদে যোগদান করিতে পারেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। জঙ্গী বড়লাট দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কিছু জনপ্রিয় লোক গ্রহণেরও উপদেশ দেন। ইহার পর দিনই নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলর ভূপালের নবাব এক বাগাড়ম্বরপূর্ণ ঘোষণা করেন। ভূপালের নবাবের এই ঘোষণায় (১৯৪৬, ১৮ই জানুয়ারী) প্রজাদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি অনেক কিছু দিবার আশ্বাসই দেওয়া হয়। চ্যান্সেলর ঘোষণা করিলেন,—"নরেন্দ্রমণ্ডল মন্ত্রী পরিষদের সহিত একযোগে দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন এবং দেশীয় রাজ্যের সঠিক শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদার প্রশ্ন বাদ দিয়া তাঁহারা এ সম্পর্কে নরেন্দ্রমণ্ডলের পক্ষ হইতে অবিলম্বে ঘোষণা প্রকাশ করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদার কথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পার্লিয়ামেণ্টে পুনরুক্ত হইয়াছে এবং রাজপ্রতিনিধিও ইহার পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাহা এই যে,—রাজ্যের পক্ষে কিরূপ শাসনতন্ত্র রাজ্য ও প্রজাদের স্বার্থের দিক হইতে সর্ব্বোত্তম তাহা নির্দ্ধারণ করার দায়িত্ব শাসকের।

"এতদনুসারে নরেন্দ্রমণ্ডলের পক্ষ হইতে তাহাদের পূর্ণ সম্মতিক্রমে চ্যান্সেলর নিম্নোক্ত ঘোষণা করিবার অধিকার পাইয়াছেন।"

—"রাজ্যের ও রাজবংশের অস্তিত্ব কোন ক্রমে ক্ষুণ্ণ বা বিপন্ন না করিয়া রাজার সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যাহাতে শাসনতান্ত্রিক খাতে প্রযুক্ত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করাই লক্ষ্য হইবে। দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টে জনগণের ঘনিষ্ঠ ও কার্য্যকরী সংযোগ সৃষ্টির জন্য নির্ব্বাচিত সদস্যের গরিষ্ঠতাসম্পন্ন জন-প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত নীতির উপর প্রত্যেকটি রাজ্যে

বিস্তারিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কালে প্রতিটি রাজ্যের বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।”

চ্যান্সেলরের ঘোষণায় দেশীয় রাজ্যসমূহকে নিম্নোক্ত মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিবার আহ্বানও জানান হয় :—

(১) আইনের বিধান ব্যতীত কোন ব্যক্তিকেই স্বাধীনতাচ্যুত করা চলিবে না ; কিম্বা তাহার বাসস্থান বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা অথবা উহাতে প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) প্রত্যেকেরই “হেবিয়াস কর্পাস” অনুযায়ী আবেদন করার অধিকার থাকিবে। যুদ্ধকালে, বিদ্রোহ কিম্বা গুরুতর আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সময় এই অধিকার বাতিল করা চলিবে।

(৩) সকলেরই স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের এবং সভা-সমিতি করার অধিকার থাকিবে।

(৪) সকলেরই নিজ নিজ বিশ্বাস ও ধর্ম্মমত প্রচারের অধিকার থাকিবে।

(৫) জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান হইবে।

(৬) কেবলমাত্র ধর্ম্ম বা বর্ণের অজুহাতে কাহাকেও কোন সরকারী পদ লাভের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না ; কিম্বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে বাধা দেওয়া চলিবে না।

(৭) বেগার প্রথা লোপ করিতে হইবে।

শাসন ব্যবস্থার মৌলিক নীতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঘোষণা করা হয় :—

(১) বিচার ব্যবস্থার ভার শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ এবং সুযোগ্য বিচার বিভাগের উপর অর্পণ করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট বনাম প্রজা সংক্রান্ত মামলার অপক্ষপাত বিচারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(২) রাজন্যবর্গকে নিজ নিজ রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক বাজেটকে "সিভিল লিষ্ট" হইতে আলাদা করিতে হইবে এবং এই খাতের ব্যয় সাধারণ রাজস্বের একটা সঙ্গত অংশের বেশী যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) ট্যাক্সের বোঝা যাহাতে অসঙ্গত বা বৈষম্যমূলক না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং রাজস্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ জনগণের কল্যাণের জন্য, বিশেষ করিয়া জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে।

যে সমস্ত রাজ্যে এই ব্যবস্থা অদ্যাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই অবিলম্বে তথায় এই মৌলিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের "বিশেষ সুপারিশ" করা হয়।

পরিশেষে বলা হইল,—"দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়তি এবং দেশীয় রাজ্যের জনগণের উপর বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্বতঃপ্রণোদিত এবং ঐকান্তিক মনোভাব লইয়া এই ঘোষণা করা হইল। বিনা দ্বিধায় এবং কালবিলম্ব না করিয়া এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করাই রাজন্যবর্গের অভিপ্রায়। ইহা অভাবমুক্তি ত্বরান্বিত করুক, ভয় দূর করুক, চিন্তা ও তাহা প্রকাশের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করুক এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহনশীলতা, সেবার আগ্রহ ও দায়িত্ববোধকে সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে দৃঢ়তর ও বর্দ্ধিত করুক।"

ভূপালের নবাবের এই শ্রুতিমধুর কপট ঘোষণা যে কত অন্তঃসারশূন্য আলোয়ারের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিই তাহার সাক্ষী। স্যার এম, পি, বাপনা বলেন—'কূটনৈতিক কারণে এইরূপ ঘোষণা ও বক্তৃতা দেওয়া হয়। আসলে ইহা মূল্যহীন।' তাঁহার উক্তি সপ্রমাণ করার জন্য তিনি বলেন—"এই প্রসিদ্ধ ঘোষণা কার্য্যকরী করার জন্য ভূপালের নবাব তাঁহার নিজের রাজ্যে কি করিয়াছেন?" ভূপালের ঘোষণার পর কয়েকটি রাজ্যে শাসন-সংস্কারের নামে কিছু চুণকামের চেষ্টা করা

হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার কোনটাই আসল সংস্কার নহে। গণ-আন্দোলনকে বিভক্ত করিয়া প্রজামণ্ডলের নরমপন্থীদের দলে টানাই ইহার আসল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সামন্ত সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদীর কূটচক্রান্ত,—এমন কি উদয়পুর অধিবেশনের আপোষমূলক মনোভাবও দারিদ্র্যপিষ্ট জনগণের অসন্তোষ নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। ১৯৪৬ সালের প্রথমার্দ্ধে গোয়ালিয়র, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজ্যে প্রবল গণ-বিক্ষোভ দেখা দিল। উদয়পুর অধিবেশনের অব্যবহিত পরে (জানুয়ারী মাসে) গোয়ালিয়রে কিষাণ ও শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিড়লার নূতন একটি মিলের স্থান করিয়া দিবার জন্য নাগদার শত শত কিষাণকে বাস্তুছাড়া করা হয়। জয়পুরের কৃষকেরা কর বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করে। ফেব্রুয়ারী মাসে আলোয়ারের জঙ্গী মুসলিম কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। প্রজা মণ্ডল, লীগ ও কিষাণ সভা একযোগে আন্দোলন আরম্ভ করেন। লাঠি চার্জ্জ, গ্রেপ্তার ব্যর্থ হইলে বেপরোয়া গুলী চলিতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত কয়েক স্থানে সামরিক আইন জারী করা হয়। এই সময়ে উদয়পুরের ভীলেরাও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই আন্দোলন এত শক্তিসঞ্চয় করে যে, প্রজামণ্ডলের কর্ম্মীদের মধ্যস্থতায় মন্ত্রীদের প্রাণ রক্ষা হয়। যোধপুরে খাদ্যের ও দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টের জন্য আন্দোলন দমন করিতে অশ্বারোহী সেনাদল নিয়োগ করিতে হয়। মার্চ্চ মাসে বাঁশবরা, কিষণগড়, ভরতপুর, পাতিয়ালা ও বিলাসপুরে আগুন জ্বলিয়া ওঠে। এপ্রিল মাসে গণ-আন্দোলন দমনের জন্য ফরিদকোটের অত্যাচার কাহিনী ভারতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। মে মাসে তিন দিনব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট সুন্দরপুরের জীবন অচল করিয়া দেয়, শত শত লোক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। বিকানীরের রাজশক্তি প্রজা আন্দোলন দমনে

ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেন, সৈন্যদল কিষাণ পল্লী বেষ্টন করিয়া বীভৎস পীড়ন চালায়।

এই ক্রমবর্দ্ধমান বৈপ্লবিক সংগ্রাম পূর্ণতা লাভ করে কাশ্মীরে। ১৯৪৬ সালের মে মাসের শেষে কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন ডোগরা স্বৈরাচারের অবসান ঘটাইবার জন্য "কাশ্মীর ছাড়" ধ্বনি তুলিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। দমননীতির বীভৎসতায় এবং গণ-শক্তির দৃঢ়পণ সংগ্রামের বীরত্বপূর্ণ কাহিনীতে গণ-মুক্তির এই যুদ্ধ মহিমময় ও অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১৯৪৬ সালের এই সংগ্রাম প্রজা আন্দোলনের আপোষমুখী ও সংগ্রামমুখী দুইটি অংশের মতভেদের ফল। যুদ্ধকালে কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন কারান্তরালে, সমাজতন্ত্রবাদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কর্ম্মীরা সেই সময় প্রজা আন্দোলনের মধ্যে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। কংগ্রেস নেতারা কারামুক্ত হইয়া জঙ্গী ভাবাপন্ন প্রজা আন্দোলনের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহারা প্রজা আন্দোলনের এই সংগ্রামমুখী মনোভাব সমর্থন করিতে পারেন নাই। আসন্ন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিয়া রাজন্যসমাজকে অধিকতর বিরূপ না করাই তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন। সংগ্রামশীল অংশ এই মনোভাবকে "তোষণনীতি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। উদয়পুর অধিবেশনে কিন্তু এই নীতিই জয়লাভ করে; কেননা প্রজা আন্দোলনের ঊর্দ্ধতন নেতৃত্বের এক বিরাট অংশ কংগ্রেস নেতৃত্বের এই শান্তিকামী মনোভাব সমর্থন করিতেন। প্রজা আন্দোলনের দক্ষিণপন্থী অংশ আন্দোলনকারীদের "দায়িত্বজ্ঞানহীন এজিটেটর" বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন এবং দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলনের প্রসার বন্ধ করার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ভরতপুর রাজ্যের প্রজামণ্ডল সত্যাগ্রহ করার অনুমতি চাহিলে পণ্ডিত নেহরু তাহাদের লেখেন —"নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলরের ঘোষণার পর আমি পরিষদকে সত্যাগ্রহ না করিবার উপদেশ দিব।" গোয়ালিয়রের প্রজামণ্ডলকেও তিনি একই উপদেশ দেন এবং জনগণ রাজন্যবর্গের ঘোষণায় বিশ্বাস স্থাপন না করায় দুঃখ প্রকাশ করেন। কাশ্মীর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে এই মনোভাব আরও কঠোর হয়। দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলনের সাধারণ কাউন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে (জুন ১৯৪৬) সর্দ্দার প্যাটেল "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য শেরে কাশ্মীরের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "জাতীয়তাবাদী ভারতে"র নিকট পণ্ডিত নেহরু ও কাশ্মীরের মহারাজা সাহেব এক। তিনি এমন কথাও বলেন যে, কংগ্রেস ও রাজাদের মধ্যে বিভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে এবং "রাজন্যবর্গকে এখন আমাদের এমনভাবে চালিত করিতে হইবে যেন তাহাদের পতন না ঘটে এবং তাহারা ও আমরা কষ্ট ভোগ না করি।" এই ঘটনার পর রাজনৈতিক বিভাগের দালাল, রামচন্দ্র কাক পণ্ডিত নেহরুকে গ্রেপ্তার ও অপমান করিতে সাহস করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কি ?

নেহরুর কাশ্মীর প্রবেশে বাধাদান, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের দৃঢ়তা এবং কংগ্রেস-সভাপতির আদেশে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন,—এই ঘটনার পর গণ আন্দোলনের বিরোধিতা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের মনোভাব কঠোরতর হয়। মহীশুর, কোটা, গোয়ালিয়র, আলোয়ার, ভরতপুর, ফরিদকোট, পাতিয়ালা, পতৌদি, তেহরি ও বিলাসপুরে সংগ্রাম আরম্ভ করিবার অনুমতি বারম্বার চেষ্টা করিয়াও মেলে নাই। যেখানে আন্দোলন দেখা দিয়াছে মধ্যস্থ প্রেরণ করিয়া তাহা মিটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, না হয় আন্দোলন বন্ধ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আন্দোলন

আরম্ভ করার অপরাধে কয়েকটি কিষাণ ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে রাজপুতানা ও হায়দরাবাদে কিষাণ আন্দোলনের দাবানল জ্বলিয়া উঠে। দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষ্টাণ্ডিং কমিটি (১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে) রাজপুতানা কিষাণ সভার সহিত কাজ করা নিষিদ্ধ করেন এবং হায়দরাবাদের অন্ধ্র মহাসভার অনুমোদন বাতিল করিয়া দেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ছিল কমিউনিষ্ট কর্ম্মীদের করায়ত্ত। এছাড়া কমিটি প্রজামণ্ডল কর্ম্মীদের হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সঙ্ঘ ছাড়া অপর কোন মজদুর সভার সহিত সংস্রব না রাখিবার নির্দ্দেশ দেন। পরিশেষে জঙ্গী প্রজামণ্ডল কর্ম্মীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন বলিয়া ভৎসর্না করিয়া বহিষ্কারের ভীতি দেখান হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত নিয়ম করা হয় যে, আঞ্চলিক কাউন্সিল ও জেনারেল সেক্রেটারীর অনুমতি ছাড়া কোনও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা চলিবে না (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)। রাজন্য সমাজ ও রাজনৈতিক বিভাগ প্রজা নেতৃত্বের এই সংগ্রাম-বিমুখতার সুযোগ লইতে কসুর করে নাই। কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনকে রক্তগঙ্গায় ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।—স্যার রামস্বামী ত্রিবাঙ্কুরে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। হায়দরাবাদের দেশমুখগণ লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও হত্যার তাণ্ডবে নরক সৃষ্টি করিয়াছে। নিম্নোক্ত হিসাব হইতেই ১৯৪৬-৪৭ সালের সামন্ততান্ত্রিক জুলুমের আভাষ পাওয়া যাইবে।

রাজ্যের নাম	মাস	নিহত	গুরুতর আহত
গোয়ালিয়র	জানুয়ারী ১৯৪৬	৬	দুই শতাধিক
আলোয়াড়	এপ্রিল "	৫	প্রায় ৬০ জন
যশল্মীর	এপ্রিল "	১ (কারাগারে)	—
শিকার (জয়পুর)	" "	২	—

রাজ্যের নাম	মাস		নিহত	গুরুতর আহত
বিকানীর	মে	১৯৪৬	১	৭
রামপুর	”	”	৪	২০
কাশ্মীর	মে হইতে	”	১০০-২০০	শত শত
পতৌদি	জুন	”	—	৬ (গুলীর আঘাতে)
রতলাম	”	”	১০	প্রায় ২৫ জন
ভরতপুর	সেপ্টেম্বর	”	১	৬ বা ৭ জন
হায়দরাবাদ	নবেম্বর ও ডিসেম্বর		কমপক্ষে ১৩	শত শত
ত্রিবাঙ্কুর	অক্টোবর—ডিসেম্বর		২০০-৩০০	শত শত
মারবাড়	মার্চ্চ	১৯৪৭	৬	৪০
রেওয়া	”	”	১	৩
আলোয়ার	”	”	২	১০—১১
ইন্দোর	”	”	১	—

মোট নিহত ৩৫০ জনের বেশী, আহত সহস্রাধিক।

(পিপলস্ এজ পত্রিকা, ১৩-৪-৪৭)

রাজন্য সমাজের প্রতি প্রীতিবশে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গণ-সংগ্রাম না করার নীতি সমর্থন করিয়াছেন এই অভিযোগ অসঙ্গত, দলীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত অতিশয়োক্তি। দেশীয় রাজ্যের বৈপ্লবিক বারুদস্তূপ স্ফুলিঙ্গ সংযোগে সামন্ত স্বৈরাচারকে তচনচ করিয়া দিতে পারে, এ কথা তাঁহারা ভালভাবেই অবগত ছিলেন। কিন্তু প্রশ্নটিকে তাহাদের সর্ব্বভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের গণসংগ্রাম অনিবার্য্যভাবেই বৃটিশ ভারতে ছড়াইয়া পড়িত এবং গোটা ভারতের গণসংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। এই আন্দোলন বহুস্থানে অহিংস সংগ্রামের নিয়ম লঙ্ঘন

করিয়া হিংস্র হানাহানিতে রূপান্তরিত হইত, এমন সম্ভাবনাও ছিল। মহাযুদ্ধের প্রভাব, মারণাস্ত্রের প্রাচুর্য্য এবং বিয়াল্লিশের সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দের ঐতিহ্য অহিংসা নীতির কার্য্যকারিতা সম্পর্কে গণমানসে প্রবল অবিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিও তখন চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। স্বার্থবানের অঙ্গুলি হেলনে যে কোন সংগ্রাম সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে রূপান্তরিত হইত। উহার অর্থ, গণসংগ্রাম অচিরেই ভারত জোড়া সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধে পরিণত হইত। প্রতিটি পল্লী ও জনপদ দুইটি যুযুধান শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িত। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মুক্তি-সংগ্রামের আদর্শকে অতলে ডুবাইত দিত—দেখা দিত দেশ-জোড়া নৈরাজ্য।

এই আত্মঘাতী সর্ব্বনাশা সম্ভাবনার কথা স্মরণে রাখিয়াই সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে হইয়াছে। সংস্কারপন্থী মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব বাস্তব রাজনীতির দিক হইতে সাবধানী ও সংযত পন্থা অবলম্বন করিলেন। বৃটিশকে যে অচিরেই ভারত ছাড়িতে হইবে, এ বিষয়ে তাঁহারা নিঃসংশয় ছিলেন। কাজেই আসন্ন ক্ষমতা-হস্তান্তরকে তাঁহারা যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে লর্ড ওয়েভেলের প্রচেষ্টা যুদ্ধক্ষান্তির পরেই শুরু হয়। কোন দিকে বায়ু বহিতেছিল বুঝিতে বিলম্ব হয় না। গান্ধীজীর প্রভাবে প্রতিষ্ঠানগতভাবে কংগ্রেস বরাবরই বিদেশী শাসক ও তাহার সৃষ্ট দেশীয় সামন্ত শাসকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীর বেয়নেটই যে ইহাদের শক্তি ও অস্তিত্বের একমাত্র নির্ভর এ বিষয়ে কাহারও সংশয় ছিল না। কাজেই সাম্রাজ্যবাদকে বিদায় দিবার

আলোচনার কালে কংগ্রেস কৌশল হিসাবে সামন্ত সমাজকে খোঁচাইতে চাহে নাই।

দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনের সংগ্রামমুখী অংশ বিপ্লবের পথে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটাইয়া ক্ষমতা ছিনাইয়া নিতে চাহিয়াছে; আর কংগ্রেস নেতৃত্ব সংস্কারপন্থী মনোভাব লইয়া আলাপ-আলোচনার পথে হস্তান্তরিত ক্ষমতা অধিকার করিতে চাহিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের প্রজা আন্দোলনের মধ্যে এই বিপরীত ধর্ম্মী কর্ম্মপন্থার ছাপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। কোন পন্থা ভারতের পক্ষে অধিক কল্যাণকর হইত তাহার বিচার করিব না, তবে উভয় কর্ম্মপন্থার স্বপক্ষেই যে মূল্যবান যুক্তি ছিল, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

বৃটিশ শাসনের অবসান:

যুদ্ধশান্তির পরেই ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সমাধানের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আগ্রহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৪ সাল হইতেই লর্ড ওয়েভেল ধীর-মন্থর-পদক্ষেপে জট খুলিবার কাজে ব্রতী হন। বৃটেনের আন্তরিকতা সম্পর্কে ভারত পুনঃ পুনঃ যে রূঢ় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে তাহার দরুণ জঙ্গী বড়লাটের প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে কেহ গুরুত্ব দেয় নাই। ইহাকে কালহরণের চাতুরী বলিয়া মনে করিয়াছে। বস্তুতঃ লর্ড ওয়েভেলের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টাকে পুরানো ইমারতকে চুণকাম করার চেষ্টা ছাড়া অপর কোন আখ্যাই দেওয়া যায় না। কিন্তু যুদ্ধোত্তর ভারতের গণ-মানসে তখন এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক জীবনে অবসাদ, হতাশা ও ব্যর্থতাবোধের অবসান হইয়াছে। দুঃসহ বেদনার জঠর হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এক দুর্ব্বিনীত প্রাণ। বিক্ষুব্ধ গণ-মানসে দেখা দিয়াছে নূতন প্রাণচঞ্চল মুক্তিপণ। এই বৈপ্লবিক গণ-জাগরণ বিদ্যুৎ চমকে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যে অতি দ্রুত মুক্তি-সংগ্রামে অভিনব গতিবেগ সৃষ্টি করিতেছিল। সুচতুর ইংরাজরাজ এই আসন্ন ঝঞ্ঝার সঙ্কেতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিলেন। বুঝিলেন গড়িমসি ও দ্বিধার অবসর নাই। নব্য ভারতের এই বৈপ্লবিক জলতরঙ্গ রুধিতে হইলে অবশ্যই এবং অবিলম্বেই একটা কিছু করিতে হইবে।

১৯৪৫ সালের গ্রীষ্মকাল হইতে আপোষ প্রচেষ্টার মন্থরতায় ছেদ পড়িল। মার্চ্চ মাসে জঙ্গী বড়লাট বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিলেন।

জুন মাসে অকস্মাৎ আহমদনগর দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট এক বেতার বক্তৃতায় শাসন পরিষদ পুনর্গঠন সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা প্রকাশ করিলেন। জুলাই মাসে সিমলায় সম্মেলন বসিল; কিন্তু কোন ফল হইল না। ব্যর্থতার দোষ সবিনয়ে নিজে গ্রহণ করিয়া বড়লাট অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সম্মেলন মুলতুবী রাখিলেন। লর্ড ওয়েভেলের এই পরিকল্পনার সহিত দেশীয় রাজ্যের কোন সম্পর্কই ছিল না। বৃটিশ ভারত সম্পর্কেই এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল এবং ইহা "রাজন্য সমাজ ও বৃটিশ রাজশক্তির বর্ত্তমান সম্পর্ককে কোন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিবে না," বেতার ভাষণে বড়লাট একথা সুস্পষ্ট ভাবেই জানাইলেন (১৪ই জুন, ১৯৪৫)। কিন্তু কংগ্রেস পক্ষ তখনই জানাইয়াছিলেন যে, "অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকিবে একথা উপলব্ধি করিলেও ইহা সুস্পষ্ট যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে ব্যবসায়, শিল্প, শ্রমিক প্রভৃতি এমন বহু বিষয় কাজ করিতে হইবে যাহার সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকন্তু পারস্পরিক আলোচনা, পরামর্শ এবং সাধারণ সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্পর্কে বিবেচনা করার সুবিধার জন্য দেশীয় রাজ্যের জনগণ, রাজন্যবর্গ এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সদস্যদের মধ্যেকার আইনগত বাধাও অপসারিত করা আবশ্যক।"

(কংগ্রেসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড—পৃঃ ৬৬৩)।

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা ভারতবাসীর মনে পুনরায় এই বিশ্বাসই দৃঢ়তর করিল যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আপোষ প্রচেষ্টা আন্তরিক নহে। এই ধারণা জাতীয়তাবাদী ভারতের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল এবং গণ-বিক্ষোভ তীব্রতর করিবার ইন্ধন যোগাইল। ইতিমধ্যে বৃটেনের রাষ্ট্রজীবনে এক গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রমিকদল জয়লাভ করিল,—চার্চ্চিল-আমেরী ভারতের

"ভাগ্য-বিধাতার" পদ হইতে অপসৃত হইলেন। নূতন পার্লিয়ামেন্টের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাজকীয় বক্তৃতায় ঘোষণা করা হইল—"আমার গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনগণের নেতৃবৃন্দের সহিত একযোগে অবিলম্বে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।" লর্ড ওয়েভেলকে পুনরায় বিলাতে আহ্বান করা হইল। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নূতন নির্ব্বাচনের কথা ঘোষণা করা হয়। ভারতে ফিরিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে এক বেতার ভাষণে বড়লাট ঘোষণা করিলেন যে, "যত সত্বর সম্ভব শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠন করা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় এবং ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘোষণার প্রস্তাবাবলী গ্রহণযোগ্য কিনা, কিম্বা কোন বিকল্প-পরিকল্পনা অথবা সংশোধিত পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয় কিনা তাহা নির্ণয় করার জন্য আমাকে প্রারম্ভিক ব্যবস্থা হিসাবে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)। বড়লাট বলেন, শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদে দেশীয় রাজ্যসমূহ কিভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার সর্ব্বোত্তম পন্থা নিরূপণের জন্য "দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের" সহিতও আলোচনা করা হইবে। পরদিন প্রধান মন্ত্রী, মিঃ ক্লিমেণ্ট এটলী এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, ক্রীপস প্রস্তাবে পরিকল্পিত শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদের সহিত সন্ধিসর্ত্ত সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। এই সন্ধির মধ্যে ভারতের স্বার্থবিরোধী কোন সর্ত্ত আরোপ করার চেষ্টা করা হইবে না।

বড়লাটের বিবৃতি নিতান্তই নৈরাশ্যজনক বলিয়া গণ্য হইল। কেন না ইহার মধ্যে ভারতের স্বাধীনতার কোন উল্লেখই ছিল না। ওয়েভেলের সেপ্টেম্বর ঘোষণা মূলতঃ ক্রীপস প্রস্তাবেরই পুনরুক্তি। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল। যেমন নব নির্ব্বাচিত

আইন সভাসমূহকে উহা সংশোধন করার প্রয়োজন হইবে কি না তাহা বিবেচনা করার অধিকার দেওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদে দেশীয় রাজ্যের যোগদান করা সম্পর্কে "দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের" সহিত আলোচনা করার উল্লেখ করা হয়। তবে রাজন্যবর্গই এই প্রতিনিধি, না সামগ্রিকভাবে দেশীয় রাজ্যের জনগণ এই প্রতিনিধি, সুস্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। জনগণ যদি প্রস্তাবিত প্রতিনিধি হয় তবে কি ভাবে তাহারা নির্ব্বাচিত হইবে সেপ্টেম্বর ঘোষণায় তাহারও কোন উল্লেখ ছিল না। যাহাই হউক নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) এই সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং প্রস্তাবটি অপর্য্যাপ্ত ও অস্পষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয়।

বোম্বাই অধিবেশন আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবী করেন এবং বিচারাধীনদের পক্ষ সমর্থনের সিদ্ধান্ত করেন। আজাদ হিন্দ বন্দীমুক্তি আন্দোলন যুদ্ধোত্তর ভারতের বিপ্লবীশক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিল। মুক্তিকাম গণশক্তির দুঃসাহসিকতার সে এক বিস্ময়কর ইতিহাস। নির্ব্বিচার গুলীবর্ষণের মুখে কলিকাতায় অটল ছাত্রশোভাযাত্রার সুশৃঙ্খল সত্যাগ্রহ ভারতের মুক্তিসংগ্রামে এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করিল। ২১শে ও ২২শে নভেম্বর কলিকাতার রাজ-পথে গোরা সৈন্য ও সাঁজোয়া গাড়ীর সঙ্গে লড়াই চলিল। লাঠিচার্জ্জে যে কাজ সিদ্ধ হইত এবারে রাইফেলের গুলীবর্ষণ করিয়াও তাহা সিদ্ধ হইল না। যুদ্ধোত্তর বৈপ্লবিক গণ-মানসের ইহা এক চমকপ্রদ পরিবর্ত্তন। পীড়ন এই দুঃসাহসিকতাকে বলীয়ান করে। আঘাত করিলে এই অসমসাহসী বিদ্রোহীরা চতুর্গুণ দৃঢ়তা লইয়া উন্নতশিরে রুখিয়া দাঁড়ায়। পীড়নযন্ত্রেও তখন ফাটল ধরিয়াছে। সিপাহীরা আর নির্ব্বিচারে লাঠিচার্জ্জ করিতে চাহে না। তাহাদের অন্তরেও

অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সৈন্যদল তলব করিতে হয়। সৈন্যদলেও গোরার বেয়নেট ছাড়া কোন ভারতীয়ের উপর নির্ভর করা যায় না। নৌসেনা ও বৈমানিকদের বিদ্রোহে সাম্রাজ্যবাদের শেষ নির্ভরেও ঘুণ ধরার প্রমাণ পাওয়া গেল।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্কেত দেখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও চুপ করিয়া ছিলেন না। সেপ্টেম্বর ঘোষণা কোন আশার সঞ্চার করে নাই দেখিয়া ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ভারতবর্ষে এক সর্ব্বদলীয় পার্লিয়ামেণ্টারী প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন (ডিসেম্বর, ১৯৪৫)। শুভেচ্ছা-মিশনের নামে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে ব্যক্তিগত সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে এই সর্ব্বদলীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হইলেও যুদ্ধোত্তর ভারতের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া তথা ছিদ্রান্বেষণ করাই ছিল এই পার্লিযামেণ্টারী প্রতিনিধিদলের কাজ। মজলিসে, সম্বর্দ্ধনা সভায়, বক্তৃতামুখে এবং সংবাদপত্রে অসংখ্য বিবৃতিপ্রসঙ্গে যুদ্ধোত্তর বৃটেনের "ঐকান্তিকতার" বাণী প্রচার করিয়া প্রতিনিধিদল বিক্ষুব্ধ ভারতকে "ঘুম পাড়াইবার" কম চেষ্টা করেন নাই। পার্লিয়ামেণ্টারী প্রতিনিধিদল প্রেরণের অব্যবহিত পরেই মিলিল মন্ত্রী মিশন প্রেরণের ঘোষণা। প্রধানমন্ত্রী বলিলেন, মার্চ্চমাসে মন্ত্রী মিশন যাত্রা করিবে। মন্ত্রী মিশন ভারতে আসিলেন। তিনমাসব্যাপী সলাপরামর্শ চলিল কিন্তু মতৈক্য হইল না। অবশেষে ১৬ই মে মন্ত্রী মিশন তাঁহার রোয়েদাদ দিলেন। ভারত-বৃটেন আপোষের বুনিয়াদ রচিত হইল। বিপ্লবের পরিবর্ত্তে সংস্কারপন্থী নীতিবাদ ভারতের ভাগ্য-বিধাতা হইল।

ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ও দেশীয় রাজ্য :

সর্বভারতীয় শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে দেশীয় রাজ্য বলিতে কেবলমাত্র রাজন্যসমাজকেই বুঝায় ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত ইহাই ছিল বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অপরিবর্ত্তনীয় রায়। বাটলার কমিটি ও সাইমন রিপোর্ট এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছে। ১৯৩৫ সালের আইন ও ক্রীপস প্রস্তাবে ইহা সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কোন অবস্থাতেই বৃটিশ্ গবর্ণমেণ্ট এই মত পরিবর্ত্তনে সম্মত হন নাই। কেবলমাত্র লর্ড ওয়েভেলের সেপ্টেম্বর ঘোষণায় (১৯৪৫) "দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধির" কথা উল্লেখ করা হয়। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি বলিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কাহাদের বুঝাইতেছেন তাহা অস্পষ্ট থাকিলেও, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ সরকারী মুখপাত্রের ঘোষণায় এইরূপ উক্তি অভিনব। অনেকে ইহাকে নীতি পরিবর্ত্তনের আভাষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড পেথিকলরেন্স ডিসেম্বর মাসে বড়লাটের এই উক্তির ভ্রম সংশোধন করেন। বৃটিশ ভারত ও "দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের" সহিত আলোচনা করার পরিবর্ত্তে ভারতসচিব "বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি ও দেশীয় রাজ্যের" সহিত আলোচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে ব্যাপকতম মতৈক্য লাভের জন্য দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের পরিবর্ত্তে দেশীয় রাজ্যের সহিত আলোচনা করিবার অভিপ্রায় সামান্য ভাবান্তর হইলেও, ভারতবর্ষকে উহা আবার ক্রীপস্ প্রস্তাবের পর্য্যায়ে লইয়া গেল। উহাতেও কেবলমাত্র দেশীয় রাজ্য শব্দটিরই ব্যবহার করা হয়।

জানুয়ারী মাসে (১৯৪৬) লর্ড ওয়েভেল নরেন্দ্রমণ্ডলে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে অবস্থাটা আরও স্পষ্ট হয়। নরেন্দ্রমণ্ডলকে তোষণ করিবার জন্য বড়লাট আশ্বাস দেন যে, দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক

পরিবর্ত্তনের জন্য রাজন্যবর্গের সম্মতি অত্যাবশ্যক এবং গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত তাঁহার বর্ত্তমান সম্পর্ক বজায় রাখিতে ইচ্ছুক। সন্ধিসর্ত্ত অনুমোদিত অধিকার এবং বৃটিশ রাজশক্তির সহিত সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন—"আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আপনাদের সম্মতি ব্যতীত এই সম্পর্ক বা অধিকারের কোন পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় আমাদের নাই। আমার স্থির বিশ্বাস, আপনারা আপনাদের প্রকৃত প্রতিনিধির মারফতে আমার ১৯শে সেপ্টেম্বরের বেতার ঘোষণায় উল্লেখিত প্রারম্ভিক আলোচনায় এবং প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আপনাদের যোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন এবং এই আলোচনা হইতে যে পরিবর্ত্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহাতে অযৌক্তিকভাবে আপনাদের সম্মতি দানে বিরত থাকিবেন না। আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, এই সমস্ত সমস্যা আলোচনাকালে আপনারা এমন কোন মনোভাব অবলম্বন করিবেন না যাহা ভারতের পূর্ণ বিকাশের অথবা আপনাদের প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতির পরিপন্থী।"

যে সমস্ত রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি অপর্য্যাপ্ত তাহাদের সম্পর্কে বড়লাট বলেন যে, প্রজাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই সমস্ত রাজ্যকে তিনি অপর কোন বৃহৎ রাজ্যের সহিত মিলিত হইবার অথবা কয়েকটি ছোট রাজ্য মিলিয়া একটি স্বতন্ত্র ইউনিট গঠন করার পরামর্শ দেন। রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতায় একদিকে নরেন্দ্রমণ্ডলকে যেমন আশ্বস্ত করা হইল যে, তাহাদের সম্মতি ব্যতীত কোন শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন করা হইবে না; তেমনি সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল যে, এই সম্পর্কে প্রজাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিপন্থী কোন

মনোভাব অবলম্বন করাও অনুচিত হইবে। রাজা ও প্রজার স্বার্থের মধ্যে উভয়কূল রক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে চাহেন, বড়লাটের ভাষণের মধ্যে তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। বস্তুতঃ মন্ত্রী মিশনের ঘোষণাতেও এই মধ্যপন্থা অনুসরণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

মন্ত্রী মিশনের স্মারক-লিপি : পরিকল্পনা প্রকাশের পূর্ব্বে মন্ত্রী মিশন নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সলরের নিকট দেশীয় রাজ্যের সন্ধি ও সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। ১২ই মে'র স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করা হয়। বড়লাটের জানুয়ারী বক্তৃতায় প্রকাশিত অভিমতের পুনরুল্লেখ করিয়া এই লিপিতে বলা হইল,—"কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তৃতার পূর্ব্বে রাজন্যবর্গকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের সম্মতি ব্যতীত বৃটিশ রাজশক্তির সহিত তাহাদের সম্পর্ক, কিম্বা সন্ধি ও চুক্তির বলে তাহারা যে অধিকার ভোগ করেন তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছিল যে, আলোচনার ফলে যে পরিবর্ত্তন হইবে তাহাতে রাজন্যসমাজের পক্ষে অযৌক্তিকভাবে সম্মতি দানে বিরত থাকাও উচিত হইবে না। নরেন্দ্রমণ্ডল ইদানীং জানাইয়াছেন যে, অবিলম্বে ভারতের পূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে যে সাধারণ সার্ব্বজনীন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে তাঁহারাও তাহা সমর্থন করেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটিশ ভারতের পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট যদি স্বাধীনতা চাহেন তবে তাহাতেও কোন অন্তরায় সৃষ্টি করা হইবে না। এই সমস্ত ঘোষণার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতের ভবিষ্যতের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই চাহেন যে, কমনওয়েলথের ভিতরে বা বাহিরে ভারত স্বাধীন মর্য্যাদা লাভ করুক। ভারতের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার পথে যে অসুবিধা

আছে তাহা দূরীকরণে সাহায্য করিতেই প্রতিনিধিদল এখানে আসিয়াছেন।”

“যে নূতন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর দ্বারা বৃটিশ ভারত স্বাধীন অথবা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধীন হইবে তাহা চালু হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, সার্ব্বভৌমত্ব বলবৎ থাকিবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন অবস্থাতেই ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সার্ব্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত করিতে পারেন না এবং করিবেন না।”

“ভারতীয় রাজ্যসমূহ ভারতের নূতন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে, এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তাহাদের নিজেদের স্বার্থ এবং ভারতের সামগ্রিক স্বার্থের জন্য তাহারা শাসনতান্ত্রিক কাঠামো রচনায় সাহায্য করিতে এবং উহা সমাপ্ত হইলে উহার মধ্যে যোগ্য স্থান লাভ করিতে সমুৎসুক। ইহার সৌকর্য্যের জন্য তাঁহারা নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে উচ্চতম মানদণ্ড অনুসারে গঠন করিয়া নিঃসন্দেহে নিজেদের অবস্থা শক্তিশালী করিবেন। রাজ্যের বর্ত্তমান সঙ্গতি দ্বারা যেখানে শাসন ব্যবস্থার উপযুক্ত মান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে তথায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাঁহারা নিঃসন্দেহে শাসনতান্ত্রিক ইউনিটগুলিকে সংযুক্ত করিবেন এবং এমন ইউনিট সৃষ্টি করিবেন যেন উহা শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে খাপ খায়। যে সমস্ত গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের মারফতে রাজ্যের জনমতের সহিত ঘনিষ্ঠ ও নিয়ত যোগাযোগ স্থাপন করেন নাই তাঁহারা এক্ষণে যদি উহা করেন, তবে তাঁহাদের অবস্থাও শক্তিশালী হইবে।”

“অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের (বিশেষতঃ আর্থিক বিষয়ের) ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃটিশ ভারতের সহিত দেশীয় রাজ্য-সমূহের আলোচনা চালান আবশ্যক হইবে। কোন রাজ্য নূতন ভারতীয়

শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে যোগদান করুক কিম্বা না করুক এইরূপ আলোচনায় অবশ্যই দীর্ঘ সময় লাগিবে। এমনকি নূতন কাঠামো কার্য্যকরী হইয়া গেলেও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা শেষ না হইতে পারে। অতএব শাসন ব্যবস্থার অসুবিধা দূর করার জন্য দেশীয় রাজ্য ও উত্তরাধিকারী গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কিছুকালের জন্য সমস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তৎকালীন স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য একটা বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও রাজপ্রতিনিধি প্রয়োজন হইলে এই বিষয়ে যথাশক্তি সাহায্য করিবেন।"

"যখন বৃটিশ ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনশীল অথবা স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন এই গবর্ণমেণ্টের উপর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এমন প্রভাব থাকিবে না যে, তাহারা সার্ব্বভৌমত্বের বাধ্যবাধকতা পালন করিতে পারেন। অধিকন্তু তাহারা একথাও কল্পনা করিতে পারেন না যে, এইজন্য ভারতে বৃটিশ সেনা থাকিবে। অতএব, এই অবস্থার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হিসাবে এবং দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতে প্রকাশিত অভিমত অনুসারে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আর সার্ব্বভৌমত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না। ইহার অর্থ এই যে, বৃটিশ রাজশক্তির সহিত দেশীয় রাজ্যের সম্পর্কের দরুণ তাহারা যে অধিকার ভোগ করেন তাহা বিদ্যমান থাকিবে না এবং দেশীয় রাজ্য যে অধিকার সার্ব্বভৌম শক্তিকে সমর্পণ করিয়াছে, তাহা পুনরায় দেশীয় রাজ্যের নিকট ফিরিয়া যাইবে। একপক্ষে দেশীয় রাজ্য এবং অপর পক্ষে বৃটিশ রাজশক্তি ও বৃটিশ ভারতের মধ্যে যে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত ছিল তাহার অবসান হইবে। এই শূন্যস্থান পূর্ণ করিতে হইলে দেশীয় রাজ্যসমূহকে হয় বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী গবর্ণমেণ্টের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে; আর তাহা না হইলে ইহার সহিত নির্দ্দিষ্ট একটা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

মন্ত্রী মিশনের স্মারকলিপির সার কথা এই যে,—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ভারতকে স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে পারেন। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তাহার পক্ষে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের বাধ্যবাধকতা পালন করা সম্ভব নহে। কিন্তু বৃটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী গবর্ণমেণ্টের নিকটও তাহারা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব হস্তান্তরিত করিবেন না। অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বলবৎ থাকিবে, অতঃপর উহা বাতিল হইয়া যাইবে। দেশীয় রাজ্যের সহিত বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন হইবে। দেশীয় রাজ্যসমূহকে নূতন গবর্ণমেণ্টের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া কিম্বা অন্য কোনরূপ রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করিয়া এই শূন্য স্থান পূরণ করিতে হইবে। মন্ত্রী মিশন কোন অবস্থাতেই এই মনোভাব হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। "সার্ব্বভৌম" দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতরাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপন করিলে কিভাবে এই সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে মিশনের মে মাসের সুপারিশে কেবল তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিবৃতির চতুর্দ্দশ প্যারায় বিষয়টি তাহারা আরও পরিষ্কার করিয়া বলেন,—"আমাদের সুপারিশ জানাইবার পূর্ব্বে আমরা বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিতে চাহি। ইহা সুস্পষ্ট যে, কমনওয়েলথের ভিতরে বা বাহিরে বৃটিশ ভারত স্বাধীনতালাভ করার পরে দেশীয় রাজ্যের শাসক ও বৃটিশ রাজশক্তির বর্ত্তমান সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। বৃটিশ রাজশক্তি রাজচক্রবর্ত্তিত্ব নিজ হস্তে রাখিতে অথবা নূতন গবর্ণমেণ্টের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যের পক্ষ হইতে আমরা যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি তাঁহারা সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এই আশ্বাসও দিয়াছেন যে, দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতের এই নূতন পরিবর্ত্তনে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন।

কি ভাবে এই সহযোগিতা করা যায় তাহার সঠিক রূপ নূতন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো রচনার কালে আলোচনার দ্বারা স্থির করিতে হইবে এবং ইহা সমস্ত দেশীয় রাজ্যের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না। সুতরাং পরবর্ত্তী দফায় আমরা বৃটিশ ভারতের প্রদেশ সম্পর্কে যেরূপ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সেরূপ করি নাই।" (ক্যাবিনেট মিশন সংক্রান্ত দলিলপত্র : ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৩)।

গণ-পরিষদের বিধান : মন্ত্রী মিশনের যে-পরিকল্পনায় বৃটিশ ভারতে পরস্পর সম্পর্ক বিশিষ্ট তিন প্রকার গবর্ণমেণ্ট গঠনের সুপারিশ করা হয়,—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, গ্রুপ গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট। এগারটি প্রদেশকে তিনটি দলে বিভক্ত করা হয়,—উত্তর-পশ্চিম গ্রুপ মধ্য-দক্ষিণ গ্রুপ ও উত্তর-পূর্ব্ব গ্রুপ। কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হস্তে মাত্র তিনটি ক্ষমতা অর্পিত হয়—বৈদেশিক সম্পর্ক, যানবাহন ও দেশরক্ষা এবং এই তিনটি বিষয় পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের ক্ষমতা। দেশীয় রাজ্যসমূহকে এই কেন্দ্রীয় সংস্থার সহিত যুক্ত করা হয়; অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক মাত্র এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে ক্ষমতা অর্পিত হইবে তদ্ব্যতীত সমস্ত ক্ষমতাই দেশীয় রাজ্য গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। এগারটি প্রদেশ, চীফ কমিশনার শাসিত অঞ্চল ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া পরিকল্পিত ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠনের সুপারিশ করা হয়। প্রতি দশলক্ষ জনসংখ্যা পিছু একজন করিয়া প্রতিনিধি—এই ভিত্তির উপর উহার সদস্য সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়। প্রস্তাবিত পরিষদের মোট ৩৮৫ জন সদস্যের মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহ উর্দ্ধে ৯৩ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন বলিয়া স্থির হয়। বৃটিশ ভারতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে

প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইলেও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন দেশীয় রাজ্য ও গণ-পরিষদের পারস্পরিক আলোচনার ফলাফলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯ দফার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হইল—"গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এই প্রতিনিধি সংখ্যা বৃটিশ ভারতে যে ভিত্তির উপর গণনা করা হইয়াছে তদনুসারে ৯৩ জনের বেশী হইবে না। কিন্তু কি ভাবে এই প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হইবেন তাহা আলাপ আলোচনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে। প্রারম্ভিক অবস্থায় একটি আলোচনাকারী কমিটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিবে।"

গণ-পরিষদের কার্য্য নিয়ামক সুপারিশে বলা হইল যে, গণ-পরিষদে মিলিত সদস্যগণ প্রারম্ভিক কার্য্যাবলীর পর তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবেন এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রাদেশিক ও গ্রুপ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন। অতঃপর সকলে মিলিত হইয়া ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণও গণ-পরিষদে অংশ গ্রহণ করিবে।

রাজন্য সমাজের পক্ষ হইতে নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্টাণ্ডিং কমিটি জুন মাসে তাঁহাদের বোম্বাই অধিবেশনে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। চ্যান্সেলর ভূপালের নবাব বড়লাটের নিকট ১৯শে জুন যে পত্র লেখেন এবং ষ্টাণ্ডিং কমিটির পক্ষ হইতে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তাহাতে নরেন্দ্রমণ্ডল মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাকে অভিনন্দিত করেন এবং এই সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত প্রকাশের ভার রাজন্য সমাজের এক সাধারণ অধিবেশনের সিদ্ধান্তের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ভূপালের নবাবের পত্রে বলা হইল—"ষ্টাণ্ডিং কমিটি মনে করেন যে, পরিকল্পনাটিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ আলোচনার এক সঙ্গত ভিত্তিও রচিত হইয়াছে। তাঁহারা সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের ঘোষণা অভিনন্দিত করেন এবং মনে করেন যে, অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ের জন্য কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন; অবশ্য একথা তাঁহাদের ঘোষণাতেও উল্লেখিত হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রস্তাবিত আলোচনা হইতে যে পূর্ণাঙ্গ চিত্র উদ্ভূত হইবে তাহার উপরই দেশীয় রাজ্য ও ষ্টাণ্ডিং কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।" (মন্ত্রী মিশন সংক্রান্ত দলিলপত্র পৃঃ ৬৩)।

ষ্টাণ্ডিং কমিটি একটি আলোচনাকারী কমিটিও নিয়োগ করেন এবং বড়লাটের নিকট সদস্যদের নাম প্রেরণ করেন। সংবাদপত্রে কমিটির পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত বিবৃতি দেওয়া হয়:—"মন্ত্রী পরিষদ ও শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে, নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্টাণ্ডিং কমিটি, মন্ত্রী মিশন ও বড়লাটের ১৬ই মে তারিখের বিবৃতিটি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহারা মিশনের সার্ব্বভৌমত্ব এবং সন্ধি-স্বীকৃত অধিকার সম্পর্কিত স্মারকলিপি ও ২৬শে তারিখের ঘোষণা সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। তাঁহাদের মতে, প্লানটিতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রয়োজনীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আরও আলোচনার সঙ্গত ভিত্তি রচনা করা হইয়াছে। তাঁহারা মন্ত্রী মিশনের সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে ঘোষণা অভিনন্দিত করিতেছেন এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ে কিছুটা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।"

—"পরিকল্পনাটির মধ্যে এমন কয়েকটি বিষয় আছে, যাহার আরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কয়েকটি মৌলিক গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয় আলোচনার দ্বারা মীমাংসার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব ষ্টাণ্ডিং কমিটি বড়লাটের আমন্ত্রণক্রমে আলোচনাকারী কমিটি নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং পরিকল্পনা অনুসারে আলোচনা

করার ব্যবস্থাপত্রের ভার চ্যান্সেলরের উপর ছাড়িয়া দিতেছেন। এই আলোচনার ফলাফল রাজন্যবর্গ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের এক সাধারণ সভার সমক্ষে পেশ করা হইবে।"

—"অন্তর্বর্ত্তীকালের ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি চ্যান্সেলরের নিম্নোক্ত প্রস্তাব কয়টি অনুমোদন করেন,—(১) অন্তর্বর্ত্তীকালের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি স্পেশাল কমিটি গঠন করা যাইতে পারে; (২) অর্থনৈতিক ও আদালতগ্রাহ্য বিরোধসমূহ অধিকার হিসাবে সালিশী আদালতে প্রেরণ করা যাইবে; (৩) ব্যক্তিগত ও রাজবংশগত প্রশ্নে উভয়পক্ষসম্মত পদ্ধতি পূরাপূরিভাবে কার্য্যকরী করিতে হইবে এবং রাজপ্রতিনিধি সাধারণতঃ চ্যান্সেলর এবং অন্যান্য কয়েকজন নরেন্দ্রের সহিত আলোচনা করিবেন—যদি অবশ্য সংশ্লিষ্ট রাজ্য কোন আপত্তি না করে; (৪) যে সমস্ত বিষয় এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই সেই সম্পর্কে দেশীয় রাজ্যের সম্মতিক্রমে আশু মীমাংসার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং রেলওয়ে, বন্দর ও শুল্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ত্তমান বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অনুরোধক্রমে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে আশু সিদ্ধান্তের জন্য কমিটি চ্যান্সেলরকে আলোচনা চালাইবার কর্ত্তৃত্ব দিতেছেন।"

বিবৃতিটির উপসংহারে আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কার সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের সুপারিশ অনুমোদন করিয়া দেশীয় রাজ্যসমূহকে বারোমাসের মধ্যে চ্যান্সেলরের ঘোষণা অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের আহ্বান জানান হয়। (মন্ত্রী মিশন সংক্রান্ত দলিলপত্র পৃঃ ৬৪)।

নরেন্দ্রমণ্ডলের এই সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য লর্ড ওয়েভেল তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাইয়া ভূপালের নবাবের নিকট লিখিত

পত্রে (২৯শে জুন, ১৯৪৬) বলেন—"ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে রাজন্যবর্গের মনোভাবকে মন্ত্রী মিশন এবং আমি অভিনন্দিত করিতেছি ; এবং ভারতের নূতন শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে দেশীয় রাজ্যের উপযুক্ত অংশ গ্রহণের সর্ব্বোত্তম পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের সুপারিশ সম্বন্ধে ষ্টাণ্ডিং কমিটি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার জন্য বিশেষ সাধুবাদ দিতেছি। আমাদের স্থির বিশ্বাস, যখন দেশীয় রাজ্যের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসিবে তখন সেই সিদ্ধান্তও একই প্রকার বাস্তবতাবোধ এবং মীমাংসাকামী মনোভাবের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হইবে। (মন্ত্রী মিশন সংক্রান্ত দলিলপত্র পৃঃ ৬৫)।

কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ঃ

যে' পরিকল্পনার বিধানে রাজন্য সমাজের উৎফুল্ল না হইবার কোন কারণই ছিল না। রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বাতিল করার সিদ্ধান্ত বৃটিশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত ভারতে রাজন্য সমাজকে এমন এক মর্য্যাদা দিতে চাহিল যাহা সামান্য কয়েকটি রাজ্য ছাড়া কেহই কোন কালে ভোগ করে নাই। স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার কথা গত দুইশত বৎসরে কেহ কল্পনা করিতেও সাহস করে নাই। অথচ স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ সাংবাদিক সভায় স্পষ্টভাবে বলিলেন—"বিবৃতির চতুর্দ্দশ প্যারায় পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে যে, নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকারী হওয়ার পর রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বহাল রাখা যায় না কিম্বা উহা অপর কাহারও হস্তে অর্পণ করা যায় না। ইহা আমার পক্ষে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই ধরণের চুক্তি বা বন্দোবস্ত দেশীয় রাজ্যের সম্মতি ব্যতীত তৃতীয় কোন পক্ষের হস্তে অর্পণ করা সম্ভব নহে। অতএব তাহারা পুরাপুরিভাবে স্বাধীন হইয়া যাইবে। তবে তাহারা

ইউনিয়নে যোগ দিবার পদ্ধতি স্থির করার জন্য আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে এবং বিষয়টি আমরা দেশীয় রাজ্য এবং বৃটিশ ভারতের দলসমূহের আলোচনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছি।" (কংগ্রেসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট-১৭৪ পৃঃ)। ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের বেতার বক্তৃতাতেও (১৭-৫-৪৬) অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করা হয়: "এই সমস্ত রাজ্য বর্ত্তমানে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে শাসিত এবং প্রত্যেকেরই বৃটিশ রাজ শক্তির সহিত স্বতন্ত্র সম্পর্ক আছে। সকলেই উপলব্ধি করেন যে, বৃটিশ ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে ইহাদের অবস্থা প্রভাবিত না হইয়া পারে না। অনুমিত হয়, তাহারা শাসনতন্ত্র রচনায় অংশ গ্রহণ করিতে এবং সর্ব্বভারতীয় ইউনিয়নে অংশ গ্রহণ করিতে চাহিবে। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা কোন আগাম সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, কেন না ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে দেশীয় রাজ্যের সহিত আলোচনা দ্বারা উহা স্থির করিতে হইবে।"

বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব মুক্ত ভারতে দেশীয় রাজ্যের এই মর্য্যাদা গোটা ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় তাহাদের তৃতীয় পক্ষের মর্য্যাদায় উন্নীত করিল। এই ব্যবস্থায় গণ-পরিষদে মিলিত বৃটিশ ভারতের জন প্রতিনিধিদের নয়কোটি ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ সর্ব্বভারতীয় সম্পর্ক নিরূপণের জন্য তাহাদেরই পীড়ক শ' ছয়েক সামন্ত নৃপতির মতামতের উপর নির্ভর করিতে হইত। দেশীয় রাজ্যসমূহ সর্ব্বভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিবে কিম্বা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিবে তাহা নির্ভর করিত গণ-পরিষদ ও রাজন্য সমাজের ভবিষ্যৎ আলোচনার ফলাফলের উপর। এই আলোচনার মধ্যে দেশীয় রাজ্যের জন-প্রতিনিধিদের স্বভাবতঃই কোন স্থান ছিল না। বৃটিশ ভারতের জন-প্রতিনিধিদের রাজন্য সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গেই আলোচনা চালাইতে হইত এবং ইচ্ছুক দেশীয় রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদানের পদ্ধতি এই আলোচনার ফলাফলের উপর

নির্ভর করিত। রাজন্য সমাজই যখন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি তখন যদি মীমাংসা করিতে হয়, প্রতিটি দেশীয় রাজ্যকে যদি প্রস্তাবিত ইউনিয়নের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে হয়, তবে রাজন্য-সমাজ বাঞ্ছিত আপোষ মীমাংসা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই আলোচনায় বৃটিশ পক্ষ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন না সত্য, কিন্তু ভারতে তাঁহারা সসৈন্যে উপস্থিত ও কর্ত্তৃত্ব সম্পন্ন থাকাকালেই আলোচনা চলিবে। অতএব, রাজনৈতিক বিভাগের অদৃশ্য হস্ত অবশ্যই রাজন্য সমাজের বেনিয়া মনোবৃত্তিকে শক্তিশালী করিবে। বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যক্রম যখন সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট নয়। মন্ত্রী মিশন অবশ্য বলিয়াছেন, সরাসরি বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব মুক্ত ভারতে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বহাল রাখা সম্ভব নহে—এজন্য তাঁহারা কোন রাজ্যে সৈন্য মোতায়েন রাখিতেও পারেন না। কিন্তু কোন রাজ্য, বিশেষতঃ সীমান্ত অঞ্চলের কোন রাজ্য যদি স্বেচ্ছায় ইউনিয়নে যোগ না দেয় এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিতে চাহে তবে তাহার সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজচক্রবর্ত্তিত্ব হইতে স্বতন্ত্র ধরণের কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবেন না কুত্রাপি এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। কেনই বা দেশীয় রাজ্যের স্থান একমাত্র সর্ব্বভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট করা হইল না? যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ছাড়া "ভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক সম্পর্ক" স্থাপনের অনিশ্চিত সম্ভাবনাপূর্ণ ছিদ্র পথ রাখা হইল কেন? কাজেই নরেন্দ্রমণ্ডল মন্ত্রী মিশন ও বড়লাটকে সাধুবাদ জানাইলেও যে পরিকল্পনার দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত বিধান জনচিত্তে নানা সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করিল। ইহার অস্পষ্টতা ভারতবর্ষকে পূর্ব্ব ইয়োরোপের বলকান অঞ্চলের ন্যায় বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রনিচয়ে বিভক্ত করার কূটকৌশল বলিয়া প্রতিভাত হইল। ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার ভাষায়—"আসল সত্য কথাটা অবশেষে প্রকাশ করা হইল যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব রাজন্য

সমাজকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার অর্থ এক কলমের খোঁচায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি আলষ্টারের পরিবর্ত্তে ছোট বড় ৫৬২ টি আলষ্টার স্থষ্টির ব্যবস্থা করিলেন।" (কংগ্রেসের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৯৬ পৃঃ)।

এই অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২৪শে মে তারিখের প্রস্তাবে বলা হইল: "দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বিবৃতিটির বিধানাবলী অস্পষ্ট এবং বহু জিনিষই ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য রাখা হইয়াছে। যাহা হউক, ওয়ার্কিং কমিটি সুস্পষ্ট ভাবে জানাইতে চাহেন যে, গণ-পরিষদ ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইতে পারে না। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি প্রেরণের পদ্ধতি যথাসম্ভব প্রদেশে অনুসৃত পদ্ধতির অনুরূপ হইতে হইবে। কমিটি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, বর্ত্তমান সময়েও কয়েকটি রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করিয়া জনগণের মনোবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। দেশীয় রাজ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ; কেননা ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কয়েকটি রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট এবং যাহারা রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাঁহাদের কাহারও নীতির মৌলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। (মন্ত্রী মিশন সংক্রান্ত দলিলপত্র: ৩০ পৃ:)।

মন্ত্রী মিশন ও বড়লাটের নিকট কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের বহু পত্রেও এই অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা হয়। মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন পত্রিকায়' (২-৬-৪৬) মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে "গুরুতর ত্রুটি" নিবন্ধে বলেন: "রাজচক্রবর্ত্তিত্বের প্রশ্নের মীমংসা হয় নাই। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হইলে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব শেষ হইয়া যাইবে, এই উক্তি

যথেষ্ট নহে। যদি অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে ইহা বাধা বন্ধহীনভাবে চলিতে থাকে তবে স্বাধীন গবর্ণমেণ্টর পক্ষে ইহা নিতান্ত অসুবিধাকর হইবে। অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে যদি ইহার আদান না হয় তবে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে এবং সম্পূর্ণভাবে দেশীয় রাজ্যের জনগণের মঙ্গলের জন্য ইহা (রাজচক্রবর্ত্তিত্ব) প্রয়োগ করিতে হইবে। জনগণই স্বাধীনতা চাহে এবং তাহার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। জনগণের স্বাধীনতা দমন করার জন্য বৈদেশিক শক্তি রাজন্য সমাজকে সৃষ্টি করেন নাই এই দাবী করা হইলেও, বৈদেশিক শক্তিই তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা স্বাধীনতা চাহেন নাই কিম্বা উহার জন্য সংগ্রাম করেন নাই। রাজন্য সমাজের উক্তি ও বিবৃতি যদি আন্তরিক ও খাঁটি হয় তবে, এই নূতন স্কীমে পরিকল্পিত জনগণের সার্ব্বভৌম অধিকারের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইবার জন্য তাহাদের রাজচক্রবর্ত্তিত্বের এই জন-মঙ্গলকর ব্যবহার সানন্দে মানিযা লওয়া উচিত। ইহা দুই নম্বর ত্রুটি। (কংগ্রেসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট ২০৪ পৃঃ)

প্রজা সম্মেলনের প্রস্তাব :

দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনেব ষ্টাণ্ডিং কমিটি "মন্ত্রী মিশন সংক্রান্ত প্রস্তাবে"—আলোচনাকারী কমিটিতে দেশীয় রাজ্যের প্রজা প্রতিনিধি গ্রহণ এবং নূতন শাসনতন্ত্র চালু না হওয়া পর্য্যন্ত অস্থাযী গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং রাজন্য সমাজ ও দেশীয় রাজ্যের প্রজা প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের দাবী করেন। মন্ত্রী মিশন তাঁহাদের আলাপ আলোচনায় দেশীয় রাজ্যের প্রজা প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করায বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া ষ্টাণ্ডিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হইল :—'দেশীয় রাজ্যের নয় কোটি ত্রিশলক্ষ

ভারতবাসীকে বাদ দিয়া ভারতের জন্য কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব নহে এবং এইরূপ শাসনতন্ত্র দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধিদের উপেক্ষা করিয়াও প্রণয়ন করা সম্ভব নহে। ভারতের এই ঐতিহাসিক সঙ্কট মুহূর্ত্তে দেশীয় রাজ্যের জনগণকে যেভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে এবং যেভাবে তাহাদের পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে সাধারণ কাউন্সিল তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। তৎসত্ত্বেও কাউন্সিল সমস্যাগুলি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন এবং দেশীয় রাজ্যসহ স্বাধীন সম্মিলিত ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। উদয়পুর সম্মেলনে দেশীয় রাজ্যের জনগণের নীতি নির্দ্ধারিত হয়। কাউন্সিল সে নীতি অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। স্বাধীন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনই এই নীতি। অধিকন্তু শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাপকতম ভিত্তির উপর জনপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতীয় ইউনিয়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে কি ভাবে খাপ খাওয়াইতে হইবে সম্মেলন তাহাও বিবৃত করেন।'

—'রাজন্য সমাজের পক্ষ হইতে সম্মিলিত স্বাধীন ভারতের জন্য যে দাবী জানান হইয়াছে—কাউন্সিল তাহাকে সম্বর্দ্ধিত করিতেছেন। স্বাধীন ভারতকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক ভারত হইতে হইবে। অতএব দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠন ইহার স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। ভারতের শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র এবং সামন্ত স্বৈরাচারের সমাবেশ হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, রাজন্য সমাজ ইহা উপলব্ধি করেন নাই বা স্বীকার করিতে চাহেন নাই।'

—'মন্ত্রী মিশন ও বড়লাটের ১৬ই মে তারিখের বিবৃতিতে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্টভাবে দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে।

শাসনতন্ত্র রচনায় তাহারা কি ভাবে কাজ করিবে বিবৃতি হইতে তাহার কোন সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় না। দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ কাঠামো সম্পর্কে কোন উল্লেখই করা হয় নাই। দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান স্বৈরাচারী ও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সহিত গণতান্ত্রিক গণ-পরিষদ বা ফেডারেল ইউনিয়নের সংযোগ কল্পনা করা সম্ভব নহে।'

—'নূতন সর্ব্বভারতীয় শাসনতন্ত্র চালু হইলে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসান হইবে ইহা আনন্দের কথা। রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসানের অর্থ বৃটিশ সার্ব্বভৌম শক্তি ও দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান সন্ধির অবসান। ইহার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির প্রস্তুতির জন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী কালেও রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রয়োগের নীতির মৌলিক পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রী মিশন ও বড়লাটের পরিকল্পনায় প্রদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া গণ-পরিষদ গঠন করা হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ কেবল মাত্র ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র রচনার কালেই অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ যখন প্রাদেশিক ও গ্রুপ শাসনতন্ত্র রচনায় ব্যাপৃত থাকিবেন তখন দেশীয় রাজ্যের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাউন্সিলের মতে এই ত্রুটি সংশোধন করা আবশ্যক। প্রথমাবধিই গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশের প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ যখন প্রদেশিক শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন তখন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ স্বতন্ত্রভাবে মিলিত হইয়া দেশীয় রাজ্যর শাসনতন্ত্রের মূল বিধান সমূহ স্থির করিতে পারিবেন। এজন্য যেখানে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত আইন সভা আছে সেখানকার আইন সভার নির্ব্বাচিত সদস্যদের গণ-পরিষদে সদস্য প্রেরণের নির্ব্বাচক-

মণ্ডলী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যে নূতন নির্ব্বাচনের পরই এই পদ্ধতি অনুসৃত হইতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের আঞ্চলিক কাউন্সিলকে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে হইবে। ইহাতে ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবে।'

—'ভারতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত যদি কোন অস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় সেক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যে, প্রদেশে ও অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে একই নীতি অনুসৃত হওয়া আবশ্যক। এই জন্য অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট, রাজন্যবর্গ ও প্রজাদের প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা দরকার। এই পরিষদ সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় পরিচালনা করিবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে অনুসৃত নীতির সমন্বয় সাধন করিয়া উহার মধ্যে খানিকটা সমতা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন। দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন দ্রুততর করাও পরিষদের অন্যতম কর্ত্তব্য হইবে। দেশীয় রাজ্যের মণ্ডলী গঠন এবং প্রদেশের মধ্যে কতগুলি রাজ্যের বিলোপ সাধনের প্রশ্নও পরিষদ বিবেচনা করিবেন। উত্তরাধিকার, কুশাসন প্রভৃতি প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ট্রাইবিউন্যাল গঠন করা যাইতে পারে।'

—'অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ের শেষে দেশীয় রাজ্যসমূহ একক বা মণ্ডলীবদ্ধভাবে প্রদেশের সমান অধিকারসহ প্রায় তাহাদেরই ন্যায় গণতান্ত্রিক কাঠামো লইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়নে অন্যান্যের সমমর্য্যাদার আসন গ্রহণ করিবে।' (কংগ্রেসের ইতিহাস: দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট ১৯১-৯৩ পৃ:)।

দেশীয় রাজ্যের নয় কোটি ভারতবাসী মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাকে কি চক্ষে দেখিয়াছে এবং গণ-পরিষদের কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে তাহাদের কি ধারণা, প্রজা সম্মেলনের দাবীর মধ্যে তাহা সুস্পষ্ট।

প্রজা সম্মেলন ও জাতীয় কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা স্মরণ করিলে ইহাকে জাতীয়তাবাদী ভারতের অভিমতও বলা চলে। কিন্তু প্রজা সম্মেলনের দাবীর মধ্যে যে গণতান্ত্রিক সুর ধ্বনিত হইয়াছে তাহা রাজন্যসমাজ বা তাহাদের বৃটিশ প্রভু কাহারও মনঃপূত নহে; এবং দেশীয় রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদানের পদ্ধতি সম্পর্কে যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে,—বৃটিশ কর্ত্তৃত্বমুক্ত ভারতে দেশীয় রাজ্যের ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের যে অধিকার রাজন্যসমাজকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই যুক্তিসঙ্গত গণ-দাবী পূর্ণ হইবার সুযোগ কোথায়?

লিবারেলদের দৃষ্টিতে ঃ

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের অপরিবর্ত্তনীয় রোয়েদাদ লিবারেল রাজনীতিকদেরও সন্তুষ্ট করে নাই। বিবৃতিটির অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতির "গঠনমূলক সমালোচনা" করিয়া স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন,—১৬ই মে'র বিবৃতি এবং সন্ধি ও রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের স্মারকলিপি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রতিনিধিদল দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমর্থন করেন :—

(ক) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া একটি সর্ব্ব-ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবে।

(খ) প্রদেশের ন্যায় কোন দেশীয় রাজ্যই ইউনিয়নের বাহিরে থাকিতে পারে না। অর্থাৎ ইউনিয়নে যোগদান না করার অধিকার দেশীয় রাজ্য বা প্রদেশ কাহারও নাই। এই জন্য দেশীয় রাজ্যসমূহ ইচ্ছা করিলে অবশিষ্ট ভারতের গবর্ণমেণ্টের সহিত ফেডারেল সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে কিম্বা উহার সহিত অন্যপ্রকার রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করিতে পারে।

(গ) দেশীয় রাজ্যসমূহকে অন্ততঃ তিনটি বিষয়—পররাষ্ট্র সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবস্থা,—কেন্দ্রীয় পরিচালনার জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(ঘ) যে সমস্ত রাজ্য অবশিষ্ট ভারতের সহিত ফেডারেল সম্পর্ক স্থাপন করিবে তাহারা ইউনিয়নের আইন সভায় এবং শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। বিকল্প রাজনৈতিক বন্দোবস্ত অবশ্যই রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ধরণের হইবে; কেন না যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবস্থা গোটা ভারতের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের পরিচালনাধীন থাকা আবশ্যক।

(ঙ) পরিকল্পনার গ্রুপিং ব্যবস্থার দরুণ দেশীয় রাজ্যের কোন প্রদেশের সহিত মণ্ডলীবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশীয় রাজ্য সমূহ কেবলমাত্র শেষ পর্য্যায়ে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র রচনার কালে গণপরিষদে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(চ) পরিকল্পনাটিতে দেশীয় রাজ্যসমূহকে ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। ফেডারেল সম্পর্ক স্থাপন না করিলেও দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না।

(ছ) অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বহাল থাকিবে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিলে ইহার অবসান হইবে।

(জ) অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে সমস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের জন্য বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইবে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আলোচনা শেষ না হইলে স্থিতাবস্থা-বজায় রাখার জন্য সাময়িক চুক্তি করিতে হইবে। এই সময়ে দেশীয় রাজ্যের উপর বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্বের বিষয়টি সম্পর্কেও সম্ভবতঃ

বিবেচনা করিতে হইবে। কেননা কোন কোন ক্ষেত্রে উহার স্থলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপিত হইবে, কোথাও বা ভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এই অনুমান খুবই সঙ্গত; কেননা ইহার যে কোন একটি সম্পর্ক স্থাপিত না হইলে ভারতের ঐক্য বজায় থাকে না।

অতঃপর রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের স্মারকলিপির সমালোচনা করিয়া স্যার এন, গোপালস্বামী বলেন,—স্মারকলিপিটি বহুদিক হইতে একখানি বিশেষ ধরণের সরকারী দলিল। রাজ-চক্রবর্ত্তিত্বের একতেয়ার এবং এই সম্পর্কে বৃটিশ ভারতের গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্পর্কে যাহার ওয়াকেফহাল তাহারা স্মারকলিপির কয়েকটি সিদ্ধান্তে বিস্মিত হইবেন।............রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব কেবলমাত্র চুক্তিমূলক সম্পর্কই নহে। এই ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রের কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। সন্ধি, চুক্তি ও সনদের অপেক্ষা না রাখিয়া এই একতেয়ার গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজচক্রবর্ত্তিত্বের আওতার মধ্যেই কেবলমাত্র সন্ধি সনদ প্রদত্ত অধিকার ও ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায়। কোন সন্ধি, চুক্তি বা সনদের এমন অর্থ করা যায় না যাহার ফলে একটী দেশীয় রাজ্য রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অধীনতা হইতে অব্যাহতি পায়। রীতি ও প্রয়োজন অনুসারে গোটা ভারতের স্বার্থ কিম্বা দেশীয় রাজ্য এবং তাহার জনগণের স্বার্থের জন্য রাজচক্রবর্ত্তী যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকারী। বৃটিশ রাজশক্তির এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসান হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি দেশীয় রাজ্য কার্য্যকরী নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট না গঠন করিবে এবং প্রদেশের ন্যায় একই ভিত্তির উপর নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যোগদান না করিবে সে পর্য্যন্ত রাজচক্রবর্ত্তিত্বের একতেয়ার অবলুপ্ত হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই যে, ভারতে বৃটিশ ক্ষমতার

অবসান হইলে এই একতেয়ার কাহার উপর বর্ত্তিবে। স্বভাবতঃই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত ভারতের ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট এই কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হইবেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, অতীতে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের সহিত বৃটিশ রাজশক্তির নীতিগত বা আইনগত যে সম্পর্কই থাক না কেন, বৃটিশ ভারতের গবর্ণমেণ্টই বরাবর এই ক্ষমতা-দত্ত অধিকার প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের নূতন ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টেরই উত্তরাধিকারী। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে এই অধিকার নূতন ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উপরেই বর্ত্তিবে এবং ইহার পথে কোন দুরতিক্রম্য বাধাও নাই। দেশীয় রাজ্যের সম্মতি লইয়া এবং রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ন্যায়সঙ্গত সংশোধন করিয়া এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে। কিন্তু এই সম্পর্কিত আলোচনাকে এমনভাবে ব্যবহার করা চলিবে না যাহাতে বৃটিশ রাজশক্তির রাজ-চক্রবর্ত্তিত্বের অবসানে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব জিনিষটিই অবলুপ্ত হইয়া যায় এবং প্রতিটি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার সহ রাজনৈতিক দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। মন্ত্রী মিশনের স্মারকলিপির ভাষায় এই মতবাদ সমর্থিত না হইলেও প্রতিনিধিদলের সদস্যদের ব্যক্তিগত ভাষ্যে এইরূপ উক্তিই করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকৃত অবস্থা স্বভাবতঃই আরও রহস্যময় হইয়া পড়িয়াছে।” * * *

* * * * * * *

“রাজ্য ও রাজাকে বাহিরের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হইতে রক্ষা করিবার এবং রাজা ও তাঁহার ন্যায্য উত্তরাধিকারীর সিংহাসন লাভ সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দেশীয় রাজ্য-সমূহ সুনির্দ্দিষ্টভাবে অথবা প্রকারান্তরে বৃটিশ রাজশক্তির নিকট তাহাদের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সমর্পণ করিয়াছে এবং বৃটিশ রাজশক্তি এইভাবে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ করিয়াছে,—রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সম্পর্কে এই

মতবাদ বাটলার কমিটি এবং উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বহু-পূর্ব্বেই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাজেই রাজন্যবর্গ যে অধিকার রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা পুনরায় তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে এবং অতঃপর তাঁহারা উহা যদৃচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন, স্মারকলিপির এই উক্তি আজিকার দিনে সত্যই বিস্ময়কর। বৃটিশ কর্ত্তৃত্বের বিলুপ্তির পরে দেশীয় রাজ্যসমূহকে যদি এই মতবাদ অনুসারে চলিবার অধিকার দেওয়া হয়, তবে দেশে অবশ্যম্ভাবীরূপে অরাজকতা সৃষ্টি হইবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে যেরূপ ঘটিয়াছে সেইরূপভাবে নূতন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এবং প্রতিটি দেশীয় রাজ্য ফেডারেল কাঠামোর অন্তর্নিবিষ্ট কিম্বা কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের সহিত অন্য কোনরূপ রাজনৈতিক বন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উত্তরাধিকারী গবর্ণমেণ্টকে যদি রাজচক্রবর্ত্তিত্ব ভোগ করিতে দেওয়া হয়, তবে সেই ব্যবস্থা বৃটেনের হাত হইতে ভারতের নিকট শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের তাৎপর্য্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে।"

"ভারতের দেশীয় রাজ্যের সমস্যা সম্পর্কে প্রতিনিধিদলের মনোভাবের গুরুতর ত্রুটি এইখানে যে, তাঁহারা দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটিশ ভারতের নেতৃবৃন্দকে কোন কথা বলিতে দেন নাই। অথচ দেশীয় রাজ্যসমূহকে ভারতের নয়া শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে খাপ খাওয়ান সম্পর্কে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য উভয়েই সমান স্বার্থবান। দেশীয় রাজ্যের সমস্যা কেবলমাত্র বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং রাজন্যবর্গের আলোচ্য বিষয় হইতে পারে না। শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদের গঠন এবং তাহার কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে প্রারম্ভিক আলোচনার মধ্যেও বৃটিশ ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধিদের উপযুক্ত এবং কার্য্যকরী সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। যে

সমস্ত রাজনৈতিক দল অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাভার গ্রহণ করিবেন তাঁহাদেরও এই নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন যে, একদিকে সপরিষদ বড়লাট এবং অপর পক্ষে রাজপ্রতিনিধি ও তাঁহার রাজনৈতিক উপদেষ্টার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষিত হইবে এবং উভয়ে একই সম্মিলিত নীতি অনুসরণ করিবেন। অন্যথায় মতানৈক্য দেখা দিবে এবং চরম অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়া দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ রাজশক্তির দায়িত্ব পালন অসম্ভব হইয়া পড়িবে।" (কংগ্রেসের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড পরিশিষ্ট ১৮৬—৯০ পৃঃ)

* * *

মন্ত্রী মিশনের ২৫শে মে তারিখের ঘোষণায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের জবাব দেওয়া হয়। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে মিশনের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া ঘোষণায় বলা হইল,—গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি কি ভাবে প্রেরণ করা হইবে তাহা দেশীয় রাজ্যের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। প্রতিনিধিদল ঐ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। (মন্ত্রী মিশন সংক্রান্ত দলিলপত্র ২৪ পৃঃ)। সুতরাং অবস্থা যাহা ছিল তাহাই রহিয়া গেল। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বহু ঘোষণারই উত্তরকালে অদল-বদল হইয়াছে—পরিবর্ত্তন হয় নাই শুধু দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত। এই সম্পর্কে প্রথমাবধি তাঁহারা যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্তও তাহা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই।

গণ-পরিষদ-বিভ্রাট :

দেশীয় রাজ্যের আলোচনাকারী কমিটি কবে এবং কোথায় মিলিত হইতে পারিবে বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে ভূপালের নবাব তাহা

জানিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার জবাবে বড়লাট লেখেন যে, গণ-পরিষদের প্রারম্ভিক অধিবেশনের পূর্ব্বে গণ-পরিষদের আলোচনাকারী কমিটি ঠিক করা সম্ভব নহে। "যথাসময়ে আপনাকে বৈঠকের স্থান ও কাল জানাইব।" জুন মাসে ভূপালের নবাব ও বড়লাটের মধ্যে এই পত্রালাপ হয়। ইতিমধ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট ও গণ-পরিষদের প্রশ্ন লইয়া একদিকে কংগ্রেস অপর দিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও লীগের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তাহার ফলে পরবর্ত্তী ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে গণ-পরিষদের কমিটি নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই।

মন্ত্রী মিশনের ঘোষণা প্রকাশের পর অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের পালা শুরু হয়। মুসলিম লীগ কাউন্সিল ৬ই জুনের প্রস্তাবে 'বি' ও 'সি' গ্রুপের ছয়টি প্রদেশের বাধ্যতামূলক মণ্ডলীগঠনের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদে যোগদান করিবার সিদ্ধান্ত করেন। কেন না "এই বাধ্যতামূলক মণ্ডলী গঠনের মধ্যে পাকিস্তানের ভিত্তি নিহিত" ছিল। অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার ভার মিঃ জিন্নার উপর অর্পিত হয়। অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচনের আলোচনায় হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাসাম্য এবং সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্পর্কে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে আবার গুরুতর মতানৈক্য উপস্থিত হইল। হিন্দু- মুসলিম সংখ্যা সাম্য এবং মুসলিম সদস্য মনোনয়নে লীগের একক অধিকার মানিতে কংগ্রেস কোনক্রমেই রাজী হইল না। মন্ত্রী মিশন ও বড়লাট ১৬ই জুনের ঘোষণায় নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের এক সদস্য তালিকা প্রকাশ করেন। মুসলিম লীগ এই বিবৃতির ভিত্তিতে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে সম্মত হইল (লীগ ওয়ার্কিং কমিটির ২৫শে জুনের প্রস্তাব)। ঐদিনই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাবে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে (বড়লাট প্রস্তাবিত)

যোগদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং "স্বাধীন, সম্মিলিত এবং গণতান্ত্রিক ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য" গণ-পরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করেন। মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে লীগের ব্যাখ্যা এবং মন্ত্রী মিশনের "অভিপ্রায়" কংগ্রেস মানিল না। মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি "বাধ্যতার" পরিবর্ত্তে প্রদেশসমূহের "স্বয়ং প্রণোদিত ইচ্ছার" উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেন। জুলাই অধিবেশনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাব অনুমোদন করিল।

মুসলিম লীগ অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু কংগ্রেস অসম্মতি জ্ঞাপন করায় মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবিত গবর্ণমেণ্ট গঠন সমীচীন মনে করিলেন না। কেন্দ্রে সরকারী কর্ম্মচারী লইয়া এক "অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক গবর্ণমেণ্ট" গঠন করিয়া তাঁহারা বিলাতে পাড়ি দিলেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রশ্ন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য শূন্যে ঝুলিতে লাগিল।

মন্ত্রী মিশনের এই আঘাত মিঃ জিন্না ও মুসলিম লীগকে অতি মাত্রায় ক্ষুব্ধ করিল। অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে না দেওয়ায় লীগের "প্রেষ্টিজ" প্রবল আঘাত পায়। 'বৃটিশের বিশ্বাসঘাতকতার' শোধ তুলিবার জন্য মুসলিম লীগ জুলাই মাসের শেষে বোম্বাইয়ে মিলিত হইল এবং মন্ত্রী মিশনের হ্রস্ব এবং দীর্ঘ মেয়াদী উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিল; এবং পাকিস্তানকে পুনরায় "মুসলিম ভারতের" লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহা আদায় করার জন্য 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' আহ্বান জানাইল। ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের আহ্বান জানান হইল। সুহরাবর্দ্দি-মন্ত্রিসভা দিবস পালনের জন্য ছুটি ঘোষণা করিলেন।

মুসলিম লীগের ২৭শে জুলাইর এই প্রস্তাবে সরকারী চক্র আবার আবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। ৬ই আগষ্ট বড়লাট কংগ্রেস

সভাপতির নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহাকে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনে সাহায্য করার আমন্ত্রণ জানান। ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল এবং বড়লাটের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হইল। ১২ই আগষ্ট সন্ধ্যা সাতটায় এই সংবাদ ঘোষিত হয়। ঘটনাচক্র ঘূর্ণিবেগে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ওয়ার্কিং কমিটি মুসলিম লীগকে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। মিঃ জিন্না ইহার মধ্যে "কোন নূতনত্বই" দেখিতে পাইলেন না। তারপর আসিল কলিকাতা, ঢাকা ও শ্রীহট্টের অবিস্মরণীয় হত্যাকাণ্ড। মুসলিম লীগের পাকিস্তান লাভের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সমগ্র ভারতকে স্তম্ভিত করিল। লীগ সভাপতি নির্ব্বিকার। ২৪শে আগষ্ট কংগ্রেস নেতৃত্বে গঠিত লীগ বিহীন প্রথম অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের মন্ত্রীদের নাম ঘোষিত হইল। বড়লাটের সহিত লীগ সভাপতির গোপন আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে ১৫ই অক্টোবর মুসলিম লীগ বোম্বাই প্রস্তাব বহাল রাখিয়া অর্থাৎ মন্ত্রী মিশনের উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বড়লাটের অনুগ্রহে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে প্রবেশ করিল। পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের তিনজন সদস্য পদত্যাগ করিয়া পাঁচজন লীগ সদস্যের আসন করিয়া দিলেন। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সহিত সংখ্যাসাম্য লাভ না করিলেও একই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কার্য্যতঃ দুইটি গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইল। কথাটা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল কংগ্রেসের মীরাট অধিবেশনে। বিষয় নির্ব্বাচনী কমিটিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে (২১শে নবেম্বর, ১৯৪৬) পণ্ডিত নেহরু বলেন,—'মুসলিম লীগ গবর্ণমেণ্টে যোগদান করার পর এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, কংগ্রেস সদস্যগণ দুই দুই বার পদত্যাগ করিবার হুমকি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা অতি দ্রুত ধৈর্য্যের শেষ সীমার দিকে আগাইতেছি। এই অবস্থা যদি চলে, ব্যাপক সংগ্রাম অনিবার্য্য।" জওহরলালজী বড়লাটের সমালোচনা

করিয়া বলেন যে, তিনি "গাড়ীর চাকা ঘুরাইয়া সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করিতেছেন।" মুসলিম লীগকে "রাজার দল" বলিয়া অভিহিত করিয়া নেহরু অভিযোগ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ বৃটিশ অফিসার ও লীগের মধ্যে একটা মানসিক যোগাযোগ আছে।

কংগ্রেস অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগ দিয়াছিল গণ-পরিষদকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য,—সকলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতীয় রিপাবলিকের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। সুতরাং প্রথমাবধিই তাঁহারা এজন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লীগ অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করার সময় আশা করা গিয়াছিল যে, তাহারা অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদানের মৌলিক সর্ত্ত হিসাবে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে এবং আর গোলমাল না করিয়া গণ-পরিষদে যোগ দিবে। বস্তুতঃ লীগের পক্ষ হইতে লর্ড ওয়েভেল এইরূপ প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগ দিবার অব্যবহিত পরেই মিঃ জিন্না এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, লীগ গণ-পরিষদে যোগ দিবে না—পাকিস্তান ও দুইটি গণ-পরিষদই তাহাদের দাবী। ৯ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) গণ-পরিষদের অধিবেশন বসিবে একথা পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছিল; সুতরাং লীগের মনোভাবে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি দেখা দিল। এই সময়, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেস ও লীগের দুইজন করিয়া প্রতিনিধিকে লণ্ডনে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। গণ-পরিষদের উদ্বোধনের দুই দিন পূর্ব্বে বৃটিশ মন্ত্রিসভার ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি প্রচারিত হইল।

ডিসেম্বর ঘোষণায় গ্রুপিং সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের "অভিপ্রায়" সমর্থিত হইল। বৃটিশ আইনজীবীরাও যে উহা সমর্থন করেন তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইল। বিষয়টি যে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার "অত্যাবশ্যক অংশ" তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলা হইল—"এই

ব্যাখ্যা সহ বিবৃতিটির এই অংশকে ১৬ই মে পরিকল্পনার অত্যাবশ্যক অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে যাহাতে ভারতীয় জনগণ এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহা পার্লিয়ামেণ্টের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সম্মত হন। অতএব ইহা গণ-পরিষদের সমস্ত দল কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত।" "যাহাতে মুসলিম লীগের পক্ষে তাহার মনোভাব পুনর্ব্বিবেচনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়" এইজন্য কংগ্রেসকে মন্ত্রী মিশনের এই ভাষ্য গ্রহণ করিতে বলা হইল। অন্যান্য বিবদমান বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেসের ন্যায় মুসলিম লীগকেও ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলার সদুপদেশ দেওয়া হইল। পরিশেষে সুস্পষ্ট হুমকি দেওয়া হইল—"মিলিত কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণ না করিলে গণ-পরিষদের সাফল্যের আশা নাই। ভারতীয় জনগণের এক বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্বহীন গণ-পরিষদ যদি কোন শাসনতন্ত্র রচনা করে-তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই উহা দেশের অনিচ্ছুক অংশের উপর চাপাইয়া দিবার কথা চিন্তা করিতে পারেন না—কংগ্রেসও এই কথাই বলিয়াছে।"

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে গ্রুপিং সম্পর্কে ফেডারেল কোর্টের ভাষ্য মানিবেন না কয়েকদিন পরে ভারত সচিব লর্ড সভায় তাহা সুস্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিলেন (১৭-১২-৪৬)। "আমি একথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, বিষয়টি (গ্রুপিং) ফেডারেল কোর্টে প্রেরণ করা হউক ইহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নয়। ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতিতে ইহা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভাষ্যও উহাই। গবর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, সমস্ত দলেরই এই ভাষ্য মানিয়া লওয়া উচিত। গণ-পরিষদকে বিষয়টি ফেডারেল কোর্টে প্রেরণ করিতে হইবে বলিয়াই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফেডারেল কোর্টের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই কংগ্রেসের অভিমত। অনতিবিলম্বেই উহা করিতে হইবে

আমি ইহা সন্দেহাতীতভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৬ই মে'র বিবৃতি সম্পর্কে তাঁহার ভাষ্যই সমর্থন করেন এবং ফেডারেল কোর্টে আপীল করা হইলেও এই অভিমত পবিবর্ত্তন করিবেন না।" (কংগ্রেসের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড, ৮১৫ পৃঃ)।

ডিসেম্বরের বিবৃতিতে ১৬ই মে বিবৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উহার সহিত "নূতন বিষয়ের" সংযোজনা করা হইয়াছে বলিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অভিমত প্রকাশ করিলেন। বিবৃতিটি কংগ্রেসের সমক্ষে উভয়-সঙ্কট সৃষ্টি করিল। হয় তাহাকে বাধ্যতামুলক গ্রুপিং ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া "গ্রুপ আর্ম্মির" ঝুঁকি লইতে হইবে; না হয় দুইটী গণ-পরিষদ গঠনে রাজী হইতে হইবে। সহজ ভাষায়, হয় বাধ্যতামূলক মণ্ডলী গঠন অথবা পাকিস্তান! ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিবৃতিটির সমালোচনা করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার নিখিল ভারত কংগ্রেসের উপর ছাড়িয়া দিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস ৫ই জানুয়ারীর অধিবেশনে (১৯৪৭) ডিসেম্বর বিবৃতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন—"সংশ্লিষ্ট সমস্ত দলের সদিচ্ছা লইয়া গণ পরিষদ স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র বচনা করুক ইহাই নিখিল ভারত কংগ্রেসের অভিপ্রায়। বিভিন্ন ব্যাখ্যার ফলে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা দূর করার জন্য সেকশনের কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কংগ্রেস কাজ করিবার নির্দ্দেশ দিতেছে। প্রকাশ থাকে যে, ইহা দ্বারা কোন প্রদেশের পক্ষে কোনরূপ বাধ্যতা বুঝায় না এবং ইহা দ্বারা পাঞ্জাবের শিখদের অধিকারও বিপন্ন করা চলিবে না। এইরূপ কোন জবরদস্তি করিবার চেষ্টা করা হইলে যে কোন প্রদেশ বা প্রদেশাংশ জনগণের অভিপ্রায় কার্য্যকরী করার জন্য যে কোনও কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে পারিবে।" (কংগ্রেসের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড, ৮২২ পৃঃ)।

২৯শে জানুয়ারী করাচীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। এক দীর্ঘ প্রস্তাবে লীগ কমিটি কংগ্রেসের প্রস্তাবকে "অসাধু চালাকী" বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং লীগবিহীন গণ-পরিষদকে "অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দিতে" বলা হইল। ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পিত শাসন-তান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এই ঘোষণা করিবার আহ্বান জানাইয়া লীগ কমিটি নূতন করিয়া পাকিস্তান ও তুইটি গণ-পরিষদের দাবী পেশ করিলেন। মুসলিম লীগ যে গণ-পরিষদে যোগ দিবে না, করাচী প্রস্তাবে তাহা সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হইল।

যাহা হউক, মুসলিম লীগের অনমনীয় জিদ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ডিসেম্বর ঘোষণার প্রচ্ছন্ন হুমকি, এবং জিন্না সাহেবের "ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার" হুমকি সহ গণ-পরিষদের অধিবেশন "অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখার" দাবীর কোনটাই গণ-পরিষদের উদ্বোধন বিলম্বিত করিতে পারিল না। পূর্ব্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর গণ-পরিষদের উদ্বোধন হইল। গণ-পরিষদের ৩৮৯ জন সদস্যের মধ্যে দেশীয় রাজ্যের ৯৩ জন সদস্যের পরিষদে যোগদানের মত অবস্থা তখনও হয় নাই। বাকী ২৯৬ সদস্যের মধ্যে ৭৪ জন লীগ সদস্য এবং তুইজন ইউনিয়নিষ্ট সদস্য ছাড়া সকলেই উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগ দেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু গণ-পরিষদের আদর্শ ঘোষণা করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে গণ-পরিষদের আলোচনাকারী কমিটি নিযুক্ত হয়। গণ-পরিষদের আলোচনাকারী কমিটির সদস্য হিসাবে মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার প্যাটেল, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া এবং স্যার এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের নামোল্লেখ করা হয় এবং পরে আরও তিনজন সদস্য গ্রহণ করা হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আলোচনাকারী কমিটি দেশীয় রাজ্যের সদস্য নির্ব্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে যে চুক্তি করিবেন তাহা যথাসময়ে গণ-

পরিষদের সমক্ষে পেশ করিতে হইবে, এই সংশোধন প্রস্তাবসহ মিঃ কে, এম, মুন্সীর মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। পণ্ডিত নেহরু দুঃখ করিয়া বলেন—

"রাজন্যসমাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটির সঙ্গেই "আমাদের আলোচনা করিতে হইবে। আমার মনে হয়, দেশীয় রাজ্যের আলোচনাকারী কমিটিতে জনগণের প্রতিনিধি থাকা উচিত। ঐ আলোচনাকারী কমিটি ঠিকমত কাজ করিতে চাহিলে উহার মধ্যে এখনও জনগণের প্রতিনিধি নিতে পারেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা এজন্য বিশেষ চাপ দিতে পারি না। আমরা এই পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে যথাসম্ভব জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি চাহি। যথা সময়ে তাহার জন্য আমরা চাপ দিব; কিন্তু তাই বলিয়া কাহারও সহিত আলোচনা করিতে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং প্রস্তাবটীর মধ্যে আমরা বলিয়াছি যে, আমরা কেবল নরেন্দ্রমণ্ডল কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটির সঙ্গেই আলোচনা করিব না—দেশীয় রাজ্যের অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিতও সাক্ষাৎ করিব। প্রস্তাবটিতে অন্যান্যের সহিত আলোচনার সুযোগও আছে।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২২-১২-৪৬)।

নেহরুজীর এই উক্তি সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য্য যে, গণ-পরিষদের কমিটিকে নরেন্দ্রমণ্ডলের কমিটির সঙ্গেই আলোচনা করিতে হয়। তবে দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলন তজ্জন্য যে কমিটি গঠন করেন, গণ-পরিষদের কমিটি তাহার সহিত প্রয়োজন মনে করিলেই পরামর্শ করিয়াছেন।

রাজন্যসমাজের গড়িমসি :

গণ-পরিষদ সম্পর্কে এই বিভ্রাট সামন্ত শাসক গোষ্ঠীকে স্বকীয় স্বৈরাচারী স্বার্থ সাধনে চক্রান্ত করার অপূর্ব্ব সুযোগ দিল। রাজনৈতিক

বিভাগ অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের একতেয়ারে ছিল না। এই বিভাগের ঝানু শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী অফিসারদের প্ররোচনায় সামন্ত সমাজ গণ-পরিষদ হইতে দূরে থাকিয়া দেশীয় রাজ্যে সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক ঘাঁটি তৈরী করার চেষ্টায় ব্রতী হইলেন। কয়েকটি দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। ছোট ও মাঝারি গোছের কিছু রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে কন-ফেডারেশন গঠন করিয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসানে বৃটেনের সহিত স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তৎপর হইল। প্রজা আন্দোলন যাহাতে এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোনরূপ কার্য্যকরী প্রতিবন্ধকতা করিতে না পারে তাহার জন্য উহা দমন করিতে বধ-বন্ধনের বিভীষিকা সৃষ্টি করা হইল। অভিসন্ধি গোপন রাখার জন্য রাজন্যসমাজ মুখে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেস ও লীগের মতানৈক্য যতই তীব্র হইতে লাগিল "সর্ব্বসম্মত শাসনতন্ত্র" প্রণয়নের জন্য নরেন্দ্রমণ্ডলের উৎকণ্ঠা যেন ততই বাড়িতে লাগিল। মনে হইল, "সর্ব্বদলসম্মত শাসনতন্ত্রের" জন্য নরেন্দ্রমণ্ডলের আগ্রহ বুঝিবা বৃটিশ মন্ত্রিসভার চাইতেও বেশী। বস্তুতঃ, বৃটিশ মন্ত্রিসভা নূতন বিষয়ের সংযোজনা করিয়া যে পরিকল্পনার যখন রূপান্তর ঘটাইতেছিলেন, নরেন্দ্রমণ্ডলের মুখপাত্র ভূপালের নবাবের তখনও মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার প্রতি কি ঐকান্তিক নিষ্ঠা!

কিন্তু রাজনৈতিক বিভাগের সহযোগে রাজন্যসমাজের এই জাতীয়তা-বিরোধী শাঠ্য বেশী দিন গোপন রহিল না। নভেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেস রাজন্যসমাজ ও রাজনৈতিক বিভাগ উভয়ের উদ্দেশ্যেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিল। মীরাট কংগ্রেসের (২৩শে নভেম্বর, ১৯৪৬) প্রস্তাবে রাজনৈতিক বিভাগের দুষ্টবুদ্ধির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হইল,—

"কংগ্রেস বরাবর দেশীয় রাজ্যের সমস্যাকে ভারতীয় স্বাধীনতার সমস্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করিয়াছে। স্বাধীনতার প্রাগমুহূর্ত্তে এই সমস্যা নূতন গুরুত্ব লাভ করিয়াছে এবং স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতেই তাহাকে বিচার করিতে হইবে। কয়েকজন নৃপতি দেশের দ্রুত পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিজেদের উহার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য যা'হোক কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।"

"কিন্তু কংগ্রেস দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, দেশীয় রাজ্যের বহু নৃপতি এবং তাঁহাদের মন্ত্রিবর্গ কেবলমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এবং শাসনকার্য্যে জনসাধারণের কার্য্যকরী কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের রাজ্য শাসন ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার ন্যায় করিতেছেন না তাহাই নহে; পক্ষান্তরে, তাঁহারা জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাজ্ক্ষা দমন করার চেষ্টাও করিতেছেন এবং এই ভাবে দেশীয় রাজ্য এবং অবশিষ্ট ভারতের জনগণের স্বাধীনতা স্পৃহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতেছেন। ভারতের কয়েকটি বড় দেশীয় রাজ্য বিশেষভাবে এই প্রতিক্রিয়াশীল ও দমননীতির দোষে দোষী; অথচ তাহাদেরই অন্যকে পথ দেখান উচিত ছিল। রাজনৈতিক বিভাগ অদ্যাপি রাজপ্রতিনিধির সরাসরি কর্ত্তৃত্বাধীন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের একতেয়ারের বাহিরে; উহা এখনও এমনভাবে কাজ করিতেছে যাহা প্রতিক্রিয়াশীল এবং জনগণের আশা-আকাজ্ক্ষার বিরোধী।"

"রাজনৈতিক বিভাগকে ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি কংগ্রেস কোনক্রমেই অনুমোদন করে না। কেননা এই বিভাগের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ভারত সরকার বিশেষ স্বার্থবান। কংগ্রেস আশা করে, যত শীঘ্র সম্ভব এই ত্রুটি সংশোধন করা হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ব্যতীত, কিম্বা উহা হইতে স্বতন্ত্র কোন স্বার্থ দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আছে এবং তাহা রাজ-প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন এই দাবী কংগ্রেস স্বীকার করে না—উহা যুক্তিহীন।”

“সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামত জিজ্ঞাসা না করিয়া এবং তাহাদের বিনা-সম্মতিতে দেশীয় রাজ্যের কোন ফেডারেশন গঠন কিম্বা পরস্পর-মিলনের পরিকল্পনা কংগ্রেস অনুমোদন করে না। জনসাধারণের অজ্ঞাতে রাজনৈতিক বিভাগ এই সম্পর্কে গোপনে যে কার্য্যকলাপ চালাইতেছেন তাহা আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি এবং ভারতবাসীর নিজ ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারের পরিপন্থী। কংগ্রেসের দৃঢ় অভিমত এই যে, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে প্রতিটি সিদ্ধান্ত জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গৃহীত হইতে হইবে; এবং তাহাদের উপেক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা তাহারা মানিতে বাধ্য নহে। বিশেষতঃ গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি জনগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে।”

“দেশীয় রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কটের কথা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, দেশীয় রাজ্যের মুক্তি-সংগ্রাম ভারতের বৃহত্তর মুক্তি সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম চলিতেছে, কংগ্রেস তাহার প্রতি সহানুভূতি জানাইতেছে।” (কংগ্রেসের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৮১-৮২-পৃঃ)।

হরিপুরার পর কংগ্রেস এই আবার দেশীয় রাজ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। এবারকার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক বিভাগ। রাজন্যসমাজের স্বৈরাচারের চাইতে রাজনৈতিক বিভাগের দুরভিসন্ধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার কারণও ছিল। এই বিভাগের মধ্যেই রোগের বীজ নিহিত। পর্দ্দার অন্তরাল হইতে

এই বিভাগ যে রোগের বীজাণু ছড়াইত তাহাই অত্যাচার ও উৎপীড়ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিত। সুতরাং রোগের মূল কারণ দূর করিতে না পারিলে ভারতের এক-তৃতীয়াংশে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান কিম্বা দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল না। সীতারামিয়ার ভাষায় —"দেশীয় রাজ্যের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিছক বাগবিন্যাস নহে।··· রাস্তার মোড়ের কাছে আসিয়া কংগ্রেস মোটর চালকের ন্যায় গতিহ্রাস করিয়াছে, মুহূর্তের জন্য আসিয়া বাঁকটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে এবং মন্থরগতিতে বাঁক ঘুরিয়া ক্রমান্বয় গতিবৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল; এবং অতঃপর একদিন যদি কংগ্রেস বিশ্লিষ্ট থাকার নীতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্লাবনের বেগে স্বাধীনতার স্রোতরোধকারী এই আবর্জ্জনাস্তূপ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিত তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না।"

বস্তুতঃ ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনাকালে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ইহাই ছিল কংগ্রেসের আসল মনোভাব। কংগ্রেস বরাবরই এই মত পোষণ করিয়াছে যে, বৃটিশ শাসনের অবসান হইলে সামন্ত স্বৈরাচার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে না। হয় জনগণের অভিপ্রায় অনুসারে ইহাদের যুগোপযোগী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, না হয় গান্ধীজীর ভাষায় "ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।" কাজেই বৃটেন যখন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল কংগ্রেস সামন্ত-সমাজকে যুগোপযোগী করিয়া স্বভাব সংশোধনের সুযোগ দিতে সম্মত হইল। গান্ধীজী তাহাদের "জনসাধারণের অছি" হইবার আহ্বান জানাইলেন। আশা করা গিয়াছিল, কংগ্রেসের এই উদার আহ্বানের বিনিময়ে 'রাজন্য-সমাজ' নিজ নিজ রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল

শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবেন। অতঃপর গণ পরিষদে যোগদান করিয়া স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো রচনা করিবেন। এই সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার দেশীয রাজ্য সম্পর্কিত আপত্তিকর বিধান লইয়া বেশী বাগবিতণ্ডা সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু রাজন্যসমাজের শুভবুদ্ধিই কংগ্রেসের একমাত্র নির্ভর ছিল না। কংগ্রেসের অস্ত্রাগারে গণ-আন্দোলনের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। তাঁহারা ভালভাবেই জানিতেন, প্রয়োজন হইলে বিপথগামী রাজন্যকে শায়েস্তা করা কিছুটা সময়সাপেক্ষ হইলেও আদৌ কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য নহে। এই আত্মবিশ্বাস, এই অমোঘ অস্ত্র তূণীরে রাখিয়াই কংগ্রেস রাজন্যসমাজকে সংশোধনের সুযোগ দিয়াছে।

রাজন্য সমাজও একথা ভাল ভাবেই জানিতেন এবং তৎসত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীর প্ররোচনায় ভারতের জাতীয় স্বার্থ এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীর বেয়নেটের উপর একান্ত নির্ভরশীল এবং তাহারই স্বার্থের ধারক ক্লীব সামন্তসমাজের পক্ষে এ আচরণ আদৌ বিস্ময়কর নহে। নিজেদের বিপন্ন অবস্থা এবং দুর্ব্বলতাব কথা অবগত ছিলেন বলিয়াই নরেন্দ্র সমাজ স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য জোট বাঁধার চেষ্টা করেন। গণ-আন্দোলন সামন্ত স্বার্থকে যাহাতে বিপন্ন করিতে না পারে তাহার জন্য একদিকে যেমন চলিল নির্ব্বিচার দমন নীতি অপরপক্ষে আরম্ভ হইল ভেদবাদের নূতন খেলা;—উদ্দেশ্য গণ-আন্দোলনের সংহতি ও শক্তিকে বিপন্ন ও দুর্ব্বল করা। দেশীয় রাজ্যে ইতিপূর্ব্বে কোন কালেই সাম্প্রদায়িক সমস্যা তীব্র ছিল না; ক্রমে তাহাও তীব্রতর হইয়া উঠিল। শাসন সংস্কার এবং দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের বারম্বার ঘোষিত প্রতিশ্রুতি ধামাচাপা পড়িল। জনকর্ত্তৃত্বসম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট গঠনের নামে আরম্ভ হইল

ধোঁকাবাজী। রাজন্য সমাজের আভ্যন্তরীন নীতি তাহাদের সর্ব্বভারতীয় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের "স্বাধীন" হইবার অধিকার দিলেও এই স্বাধীনতা ভোগ করার মত শক্তি ও সম্পদ অনেকেরই ছিল না; সুতরাং পরস্পর সন্নিহিত কতগুলি রাজ্য যদি ফেডারেশন বা কনফেডারেশন (যুক্তরাজ্য বা মহাযুক্তরাজ্য) গঠন করিতে পারে তবে তাহাদের পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা অসম্ভব নাও হইতে পারে। আর যদি তাহা না হয় তবে তাহাদের পক্ষে নিজেদের অনুকূল দর কষাকষি করিয়া স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ছাড়া "অন্য কোনরূপ রাজনৈতিক সম্পর্ক" স্থাপন করা সহজতর হয়। এ জন্য প্রস্তাবিত গণপরিষদ হইতে দূরে থাক প্রয়োজন। কংগ্রেস-লীগের মতানৈক্য নরেন্দ্র সমাজকে এ বিষয়ে অচিন্তিতপূর্ব্ব সুযোগ দিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতদ্বৈধ যতই ব্যাপকতর হইতে লাগিল নরেন্দ্রমণ্ডলের মুখপাত্র ভূপালের নবাব ততই "সর্ব্বদলসম্মত শাসনতন্ত্রের" জন্য ঐকান্তিকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র-সমাজও বৃটিশ ভারতে একটা মিটমাট না হওয়া পর্য্যন্ত "মনস্থির" করিতে পারিতেছিলেন না। দেশীয় রাজ্যের এই মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ কমন্সসভায় ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি সম্পর্কে বিতর্ককালে বলেন,—গণপরিষদে সমস্ত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যোগদান করুক্, দেশীয় রাজ্যের এই আগ্রহ মোটেই অস্বাভাবিক নহে; কেননা তাহারা কেবলমাত্র একটি সম্প্রদায়ের সহিত আলোচনা করিবার মত অবস্থায় পড়িতে ইচ্ছুক নয়। বস্তুতপক্ষে, মুসলিম লীগের গণপরিষদে যোগদান সম্পর্কে কি ঘটে তাহার উপরেই তাহাদের সহযোগিতা করার ক্ষমতা কতকটা নির্ভর করিবে। (১২-১২-৪৬)

মুসলিম লীগ যোগদান না করার দরুণ দেশীয় রাজ্যের গণপরিষদে যোগদানের অনিচ্ছা রাজন্যসমাজের লীগ-প্রীতির নিদর্শন নহে।

আসলে ইহা কংগ্রেস সম্পর্কে ভীতি এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা। যদি মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ দেয় এবং মন্ত্রী-মিশন পরিকল্পনার দ্বৈত সাম্প্রদায়িক গরিষ্ঠতার বিধান কার্য্যকর হয় তবে হীনবল নামসর্ব্বস্ব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিকাংশ ক্ষমতাই নিজেদের করায়ত্ত রাখা যায় এবং সে ক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্য সামন্তস্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদের নিরুপদ্রব ঘাঁটি হইতে পারে। জোঁট বাঁধিতে পারিলে এ ঘাঁটি আরও পোক্ত হয়। কিন্তু লীগ-বিহীন গণপরিষদে রাজন্য সমাজকে কেবলমাত্র কংগ্রেস সদস্যদের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহারা একই সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও একই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। রাজন্য সমাজের স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কে তাহাদের সকলের মনোভাবই প্রায় একরূপ। গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনেই রাজন্যসমাজ তাহার খানিকটা আঁচ পাইলেন।

গণপরিষদের আদর্শ সংক্রান্ত প্রস্তাবে ভাবী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইল—সার্ব্বভৌম স্বাধীন ভারতীয় রিপাবলিক, ইহার বিভিন্ন অংশ ও গবর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব জনগণের নিকট হইতে উদ্ভূত। জনগণের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার এই আদর্শ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্যের উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত নেহেরু বলেন,—"কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, সাধারণতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার দেশীয় রাজ্যর নরেন্দ্রসমাজকে অসন্তুষ্ট করিতে পারে। ইহা খুবই সম্ভব। কিন্তু আমি সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাহি যে, ব্যক্তিগত ভাবে আমি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নহি। বর্ত্তমান জগতে রাজতন্ত্র একটি দ্রুত বিলীনীয়মান প্রতিষ্ঠান। তথাপি ইহা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রশ্ন নহে। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে আমরা বরাবর এই মত পোষণ করিয়াছি যে, দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণকেও ভাবী

স্বাধীনতায় পূরাপূরি অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যরজনগণ এবং উহার বাহিরের জনসাধারণের স্বাধীনতা দুই রকম হইবে এবং উহা বিচার করার দুইটি মানদণ্ড থাকিবে ইহা আমার কল্পনাতীত।"

অতঃপর পণ্ডিত নেহেরু বলেন,—দেশীয় রাজ্য সমূহ ইউনিয়নের অংশ হইবে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গেই পরিষদকে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে এবং আমি আশা করি, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে পরিষদ দেশীয় রাজ্যের প্রকৃত প্রতিনিধিদের সঙ্গেই আলোচনা করিবেন। আমরা রাজাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাহাদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু যখন আমরা ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিব তখন উহা দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধিদের সহযোগেই করিতে হইবে।......দেশীয় রাজ্য এবং অন্যত্র স্বাধীনতার মানদণ্ড একই হইবে একথা আমরা স্বীকার করিলেও ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, সকল স্থানের গবর্ণমেণ্টও একই ধাঁচের হওয়া উচিত। তবে এই বিষয়টি দেশীয় রাজ্যের সহিত আলোচনাক্রমে তাহাদের সহযোগিতা দ্বারাই স্থির করিতে হইবে। দেশীয় রাজ্যের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের উপর কোন কিছু চাপাইয়া দিবার অভিপ্রায় আমার নাই। গণ-পরিষদেরও তাহা অভিপ্রেত নহে বলিয়া আমি মনে করি। কোন রাজ্যের জনসাধারণ যদি নির্দ্দিষ্ট কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থা চাহে, উহা রাজতন্ত্র হইলেও আমরা বাধা দিব না। ...কি হইবে আমি জানি না। তবে দেশীয় রাজ্যে যদি পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট সহ কোন ভিন্ন ধরণের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনগণের প্রকৃত কর্তৃত্ব থাকে তবে আপত্তি করার কিছুই নাই। জনগণের অনুমোদনক্রমে কোন রাজ্যে যদি নামসর্ব্বস্ব রাজা থাকে

আমি পছন্দ করি বা না করি, অবশ্যই আমি উহার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবনা। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৩-১২-৪৬)।

গণপরিষদের ঘোষণা এবং জওহরলালজীর ব্যাখ্যা রাজন্য সমাজে বিষম আলোড়ন সৃষ্টি করিল। দেশীয় রাজ্যের আলোচনাকারী কমিটির স্যার রামস্বামী আয়ার, মীর মকবুল মহম্মদ প্রমুখ সদস্যগণ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জনগণের সার্ব্বভৌম অধিকার ঘোষণার প্রতিবাদ জানাইলেন। দেশীয় রাজ্য ও অবশিষ্ট ভারতের বৈসাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলিলেন, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা না করিয়া এইরূপ ঘোষণা করা উচিত হয় নাই। এই প্রতিবাদের জবাব দিলেন স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। গণপরিষদে বর্ত্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, ক্যাবিনেট মিশন বলিয়াছেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনগণের নিকট সার্ব্বভৌমত্ব হস্তান্তরের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবেন। সার্ব্বভৌমত্ব ত্যাগ অর্থাৎ বৃটেন ভারতে এক্ষণে যে ক্ষমতা ভোগ করিতেছে তাহার হস্তান্তর বলিতে সমগ্র ভারতের সার্ব্বভৌমত্ব ত্যাগ করা বুঝায়। অতএব মন্ত্রী মিশন যখন ভারতীয় জনগণের নিকট ক্ষমতা ত্যাগের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা উহার মধ্যে দেশীয় রাজ্যের জনগণকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কাজেই বৃটিশ কর্ত্তৃত্বের অবসানে দেশীয় রাজ্য স্বাধীন হইবে বলিয়া মিশনের বিবৃতিতে যে উক্তি করা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ দেশীয় রাজ্যের উপর যে সার্ব্বভৌমত্ব ভোগ করিতেন তাহা দেশীয় রাজ্যের জনগণের নিকট প্রত্যর্পিত হইল। কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের

নিকট যে ক্ষমতা অর্পিত হইবে না, আলোচ্য প্রস্তাবটি সেই সম্পর্কে দেশীয় রাজ্য এবং প্রদেশসমূহকে একই স্তরে রাখিতে চাহিয়াছে; অর্থাৎ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ভারতের অংশ হিসাবে প্রদেশসমূহের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব যেমন সেখানকার জনগণের নিকট হইতে উদ্ভূত, ভারতীয় ইউনিয়নের অংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বও দেশীয় রাজ্যের জনগণের নিকট হইতে উদ্ভূত। ইউনিয়ন বিষয় সম্পর্কিত ক্ষমতা যদি দেশীয় রাজ্যের জনগণের হস্তে থাকে এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমতা থাকে নৃপতির হাতে তবে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হইবে। ভারতের নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রচনার কালে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের ন্যায় দেশীয় রাজ্যের লিখিত শাসনতন্ত্রও (যাহাদের আছে) পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে। যে সমস্ত রাজ্যের লিখিত শাসনতন্ত্র নাই তাহাদের জন্য উহা তৈরী করা প্রয়োজন হইবে। অবশ্য এ কাজ বিলম্বিত করা যাইতে পারে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যদি চাহেন তবে গণপরিষদ ভবিষ্যতে সংশোধনের পথ খোলা রাখিয়া দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান সীমাসহরদ্দ অটুট রাখার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। নৃপতির সহিত একযোগে দেশীয় রাজ্যের জনগণ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবেন উহাতে বর্ত্তমান রাজবংশের উত্তরাধিকারক্রমে গদীলাভের বিধান থাকিতে পারে, এবং এই ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া ইউনিয়ন শাসনতন্ত্রে একটি বিধান সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে এই সর্ত্ত থাকা প্রয়োজন যে, উত্তরাধিকারক্রমে গদীয়ান বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে যতশীঘ্র সম্ভব বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজা হইতে হইবে।*

ভারতীয় সামন্ত সমাজের প্রায় সকলেই নিজেকে সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তির উৎস বলিয়া মনে করিতেন। কাজেই গণপরিষদের এই মূলনীতি তাঁহাদের বিষম উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল। ২৯শে জানুয়ারী (১৯৪৭) দিল্লীতে রাজন্য সমাজের এক সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কতগুলি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দাবী করা হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দাবী সমূহ অন্যতম :—

(১) দেশীয় রাজ্যের সার্ব্বভৌমত্ব রাজন্য সমাজের।

(২) রাজন্য সমাজের পক্ষে গণপরিষদে যোগদান বাধ্যতামূলক নহে। গণপরিষদে যোগ দেওয়া হইবে কিনা প্রত্যেকটি রাজ্য তাহা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবে; কিন্তু যোগদান করিলেও ইহার সিদ্ধান্ত তাহাদের উপর বাধ্যতামূলক নহে; গণপরিষদ কর্ত্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র প্রত্যেকেই গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করিতে পারিবে।

(৩) রাজন্য সমাজের আলোচনাকারী কমিটিই দেশীয় রাজ্যের একমাত্র মুখপাত্র।

(৪) দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার গণপরিষদ বা কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের থাকিবে না। (পিপলস্ এজ, ১৩-৪-৪৭)।

রাজন্য সমাজের গড়িমসি এবং মুসলিম লীগের অনমনীয় জিদ একযোগে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা একরূপ অসম্ভব করিয়া তুলিল। মুসলিম লীগ যোগ না দিলে যেমন প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র রচনা করা যায় না, তেমনি তাহার এবং রাজন্যসমাজের অনুপস্থিতিতে ইউনিয়ন শাসনতন্ত্র রচনা করাও অসম্ভব। গণ-পরিষদের কাজে এক অদ্ভুত অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। এই বিরক্তিকর অবস্থা বেশীদিন সহ্য করা চলে না। মুসলিম লীগের

করাচী প্রস্তাবের পর অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে লীগ সদস্যদের অবস্থান অবিলম্বেই চ্যালেঞ্জ করা হইল। এই সম্পর্কে উভয় দল এবং বড়লাটের মধ্যে এবং বড়লাট ও বৃটিশ মন্ত্রিসভার মধ্যে যে পত্রালাপ হইয়াছে তাহা গোপন থাকিলেও ইহার প্রকৃতি অনায়াসেই অনুমান করা যায়। করাচী প্রস্তাবের পর সপ্তাহ তিনেক যাইতে না যাইতেই শোনা গেল, লর্ড ওয়েভেল বড়লাটের পদ হইতে অপসৃত হইতেছেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) এই সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশের দুইদিন পরেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিলেন,—১৯৪৭ সালের জুন মাসে বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিতেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ২০শে ফেব্রুয়ারীর এই নাটকীয় ঘোষণায় বলা হইল,—"মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের সমস্ত দলের সহযোগিতায় রচিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত কর্ত্তৃপক্ষের হস্তেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব অর্পণ করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানে এইরূপ শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার কোন সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা যায় না। বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থা অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল এবং ইহা বেশীদিন চলিতে দেওয়া যায় না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চাহেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা করাই তাহাদের সুনির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায়।"

কাহার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে তাহার আভাষ দিয়া ঘোষণায় বলা হইল,—"যদি এইরূপ হয় যে, নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে পূরাপূরি প্রতিনিধিমূলক গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইল না, তবে বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা কাহার হস্তে অর্পণ করা হইবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। সে ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা বৃটিশ ভারতের কোনরূপ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমগ্রভাবে অর্পিত হইতে পারে,

অথবা কয়েকটি অঞ্চলে ইহা বর্ত্তমান প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট অর্পিত হইতে পারে কিম্বা ভারতীয় জনগণের সর্ব্বোত্তম স্বার্থ-সম্মত এবং সঙ্গত উপায়ে অন্য যে কোন ভাবেও অর্পিত হইতে পারে।" দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে মন্ত্রী-মিশনের অভিমতের পুনরুক্তি করিয়া বলা হইল যে, বৃটিশ ভারতের কোন গবর্ণমেণ্টের নিকট রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ক্ষমতা বা অধিকার হস্তান্তরিত করা হইবে না! চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসান ঘটাইবার অভিপ্রায়ও নাই, তবে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ রাজশক্তির সম্পর্ক চুক্তিদ্বারা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় অস্পষ্টতা থাকিলেও খুব বেশী দ্ব্যর্থ-বোধক অনিশ্চিত বাকচাতুরী ছিল না। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিকল্প প্রস্তাবসমূহ এই ঘোষণার মধ্যে উল্লেখিত ছিল। তবে উহা এমনভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ দৃষ্টি কোন্ হইতে অনায়াসেই নিজেদের অনুকূলে ইহার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারে। কংগ্রেস আশা করিতে পারিত যে, প্রধান রাজনৈতিক দল হিসাবে এবং মুসলমানসহ বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সহিত সংযুক্ত থাকায় তাহার হস্তে ক্ষমতা অর্পণের প্রশ্নই অগ্রে বিবেচিত হইবে। অপর পক্ষে মুসলিম লীগও "পূরাপূরি প্রতিনিধিস্থানীয়" শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া মনে করিতে পারে যে, সে গণ-পরিষদের যোগ না দেওয়া পর্য্যন্ত ইহা পূরাপূরি প্রতিনিধিস্থানীয় হইবে না। অতএব তাহার দাবীও স্বীকৃত হইবে। রাজন্যসমাজও এই ভাবিয়া আনন্দে গদগদ হইলেন যে, চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসান হইবে না; সুতরাং তাহাদের অনাথ হইবার শঙ্কা নাই। ডাঃ সীতারামিয়ার ভাষায়,—"মোটের উপরে বৃটেন ভারত ছাড়িতেছে এই কথা বলা ছাড়া, বৃটেন সমস্ত দলের মতৈক্যের

কোন ব্যবস্থাই করিল না, কেননা কংগ্রেস, লীগ ও দেশীয় রাজ্য প্রত্যেক দলের সম্মুখেই যুগপৎ পুরস্কার ঝুলাইয়া রাখা হইল।" (কংগ্রেসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড; ৮২৬ পৃঃ)।

নরেন্দ্রমণ্ডলে মতদ্বৈধ :

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ফেব্রুয়ারী ঘোষণা ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য না করিলেও ভারত ছাড়িবার দিন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির খানিকটা রূপান্তর হইল। মুসলিম লীগ পাকিস্তান ও স্বতন্ত্র গণ-পরিষদের দাবী জানাইয়া ধ্বনি তুলিল,—"ভারত ছাড়ার পূর্ব্বে ভাগ করিয়া দিয়া যাইতে হইবে।" প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইলে তথাকথিত পাকিস্থানী প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব যাহাতে লীগ ছাড়া অন্য কোন দলের হাতে না থাকে এই দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্যও আন্দোলন আরম্ভ হইল। বাঙ্গলা ও সিন্ধুর কর্ত্তৃত্ব লীগেরই ছিল; পাঞ্জাব ও সীমান্তের ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য "আইন অমান্য আন্দোলন" আরম্ভ হইল। বহিরাগত সমস্যার ছিদ্র-পথে আসামেও তোড়জোড় চলিতে লাগিল। অস্পষ্টতা সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রথমে বিবৃতিটিকে বিজ্ঞজনোচিত ঘোষণা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মোটের উপর, অতঃপর সে গণ-পরিষদের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য দৃঢ়-মনোভাব অবলম্বন করিল। ওয়ার্কিং কমিটি এই ঘোষণা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন উহাতে পুনর্ব্বার মুসলিম লীগ ও দেশীয় রাজ্যকে গণ-পরিষদে যোগদানের আহ্বান জানাইয়া বলা হইল,—ওয়ার্কিং কমিটি বারম্বার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কোনরূপ জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতার স্থান নাই। এই বাধ্যতা ও জবরদস্তির শঙ্কা হইতে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও বিরোধ দেখা দিয়াছে। যদি এই শঙ্কা তিরোহিত হয়, (ইহা হইতে বাধ্য) তবে ভারতের ভবিষ্যৎ স্থির করা এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষা এবং

সকলকে সমান সুযোগ দিবার কাজ সহজতর হইবে। (ফরোয়ার্ড ১৬-৩-৪৭)

কংগ্রেসের আহ্বান লীগ নেতৃত্বের মনে রেখাপাত না করিলেও রাজন্যসমাজের একাংশকে প্রভাবিত করিল। কংগ্রেস ও গণ-পরিষদের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করিল। এই আত্মবিশ্বাসের খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায় জওহরলালজীর গোয়ালিয়র বক্তৃতায়। কতগুলি দেশীয় রাজ্যের দরকষাকষির মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়া নেহরুজী বলেন, "যাহারা এখন গণ-পরিষদে যোগ দিবে না তাহাদের শত্রুরাজ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তাহাদের এই মনোভাবের ফলভোগ করিতে হইবে। ভারতের যতটা অংশ সম্ভব স্বাধীন করাই আমাদের বর্ত্তমান নীতি—সে অর্দ্ধেক বা তিন-চতুর্থাংশ যাহাই হউক। অতঃপর আমরা বাকী অংশ স্বাধীন করার কথা চিন্তা করিব।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৯-৪-৪৭)। এই ঘটনা প্রবাহ রাজন্যসমাজকে সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিল। একদল নৃপতি এতাবৎ অনুসৃত গড়িমসির ভাব পরিহার করিয়া এখনই গণ-পরিরদে যোগ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাজন্যসমাজকে এতকাল গণ-পরিষদ হইতে দূরে রাখিবার যে নীতি রাজনৈতিক বিভাগ সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিতেছিলেন ফেব্রুয়ারী ঘোষণার পর তাহার বুনিয়াদে ফাটল ধরিল। সকলকে দূরে সরাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। রাজনৈতিক বিভাগের সাম্রাজ্যবাদী শাঠ্য অন্ততঃ আংশিক ভাবে ব্যর্থ হইল।

ইতিমধ্যে গণ-পরিষদ ও নরেন্দ্রমণ্ডলের আলোচনাকারী কমিটির মধ্যে গণ-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ সম্পর্কে এক চুক্তি হয়। ২রা মার্চ্চ উভয় আলোচনাকারী কমিটির পক্ষ হইতে এক যুক্ত বিবৃতিতে

চুক্তির সর্ত্ত ঘোষণা করা হয়; এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য একটি যুক্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর এই সম্পর্কে যে ফরমূলা গৃহীত হয়, পণ্ডিত নেহরু গণ-পরিষদে তাহা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—"প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এক যুক্ত-সাব কমিটি সেই সম্পর্কে আলোচনা করেন। সাব কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করিয়া উভয় আলোচনাকারী কমিটি এই ফরমূলা অনুমোদন করেন যে, দেশীয় রাজ্যের মোট প্রতিনিধি সংখ্যার ন্যূন পক্ষে অর্দ্ধেক জন-প্রতিনিধি হইতে হইবে এবং ইহারা আইন সভার নির্ব্বচিত প্রতিনিধি দ্বারা কিম্বা যেখানে আইন সভা নাই সেখানে নির্ব্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে। দেশীয় রাজ্যসমূহ নির্ব্বাচিত সদস্য-সংখ্যা অর্দ্ধেকের যত বেশী সম্ভব বাড়াইবার চেষ্টা করিবেন।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২৯-৪-৪৭)। প্রতি দশ লক্ষ জনসংখ্যায় একজন করিয়া প্রতিনিধি বৃটিশ ভারতে অনুসৃত এই নীতি অনুসারেই দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ভিত্তি অনুসারে যে সমস্ত রাজ্য এককভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে না—মণ্ডলীবদ্ধভাবে তাহাদের প্রতিনিধিত্বের বন্দোবস্ত করা হয়। একটি তালিকায় বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

এই আঁধি-বন্দোবস্ত কংগ্রেসের বহু ঘোষিত নীতির বিরোধী। কেননা ইহার ফলে রাজন্যসমাজের মনোনীত প্রতিনিধি গণ-পরিষদে আসন লাভ করিবে। কিন্তু যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে কংগ্রেসের পক্ষে রাজন্য সমাজকে কিছুটা সুবিধা না দিয়াও উপায়ান্তর ছিল না। গোয়ালিয়রে নেহরুজী সত্যই বলিয়াছেন যে, ন্যায় হউক অন্যায় হউক, নরেন্দ্রমণ্ডল ও গণ-পরিষদের আলোচনাকারী কমিটির মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, গণ-পরিষদ

মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনার সৃষ্টি এবং ঐ পরিকল্পনার সীমার মধ্যে থাকিয়াই উহার কাজ করিতে হইবে। আমি নিজে এক স্বয়ং নির্ব্বাচিত প্লানের মধ্যে কাজ করা পছন্দ করি। কিন্তু কি আমাদের কাম্য, তাহা আশুকার সমস্যা নহে। বর্ত্তমান অবস্থায় কি সম্ভব তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রজামণ্ডলকে গণ-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আহ্বান করা সম্ভব নহে। কেননা পরিষদ বৃটিশ প্লানের সৃষ্টি এবং উহার বাধানিষেধ মানিতে বাধ্য। ইহার একটি বিধান এই যে, রাজন্যসমাজ কর্ত্তৃক উন্মুক্ত দ্বার দিয়াই দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের গণ-পরিষদে প্রবেশ করিতে হইবে। তবে নরেন্দ্রমণ্ডলের আলোচনাকারী কমিটির সহিত চুক্তি করার সময় একথা স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে যে, এই চুক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত অনুমোদনের অধিকার দেশীয় রাজ্যের জনগণের। ইহা খুবই সত্য, কয়েকটি জিনিষ স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা উহা পছন্দ না করিলেও মানিয়া লইয়াছি এই জন্য যে, উহা দেশীয় রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদান সহজতর করিব। (১৮-৪-৪৭)।

ইহা খুবই সত্য বৃটিশ ভারতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে যদি মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইত তবে গণ-পরিষদ অনায়াসেই রাজন্যসমাজের নিকট হইতে অধিকতর গণ-প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু অবস্থা বিপরীত হওয়ায়, কংগ্রেসের দর কষাকষির ক্ষমতা খানিকটা কম ছিল। এই জন্যই তাহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজন্যসমাজকে অর্দ্ধেক প্রতিনিধিত্ব দিতে হয় এবং গণ-পরিষদে যোগদান তরান্বিত করার জন্য দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ ভোটাধিকারকে ভিত্তি করিয়া জন-প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কংগ্রেসের এই ব্যবস্থা গণ-পরিষদে যোগদান করা না করা সম্পর্কে রাজন্যমহলে মতভেদ সৃষ্টি করিল। বোম্বাই'র তাজমহল হোটেলে

১লা এপ্রিল রাজন্যসমাজের যে সাধারণ অধিবেশন হয় তাহাতে এই মতভেদ প্রকট হয়। রাজন্যসমাজ উভয় আলোচনাকারী কমিটির এই চুক্তি সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিলেও, গণ-পরিষদে যোগদানের সময় সম্পর্কে একমত হইতে পারিলেন না। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা প্রকাশের পর নরেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বী দুইটি দলের উদ্ভব হয়। বিকানীর, পাতিয়ালা, যোধপুর, জয়পুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি কতিপয় রাজ্য গণ-পরিষদের কাজে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহেন। আর চ্যান্সেলর ভূপালের নবাব চালিত সাম্রাজ্যবাদী ও লীগ-ঘেঁষা দলটি দেশীয় রাজ্যকে গণ-পরিষদ হইতে দূরে রাখিয়া কংগ্রেসের প্রচেষ্টা সাবোটাস্ করার চেষ্টা করেন। প্রথমে ভূপাল চালিত দলই রাজনৈতিক বিভাগের প্ররোচনায় সাফল্য লাভ করে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ মাসে চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পর নরেন্দ্রমণ্ডলের মতভেদ তীব্রতর হইয়া দেখা দেয়। চ্যান্সেলর বলেন, এই চুক্তি রাজন্যসমাজের সাধারণ সভায় অনুমোদন লাভ না করা পর্য্যন্ত কেহই গণ-পরিষদে যোগ দিতে পারে না। বোম্বাই সম্মেলনে এই প্রশ্ন আবার উঠে এবং বিকানীর-পাতিয়ালার দল অবিলম্বেই গণ-পরিষদে যোগ দিতে চাহেন। ভূপাল চাহেন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের শেষ পর্য্যায়ে যোগ দিতে। অর্থাৎ কংগ্রেসের পক্ষে লীগ বিহীন গণ-পরিষদের কাজ চালান অসম্ভব করিয়া তুলিতে। অবশেষে উভয়দলের মধ্যে এক আপোষ হয় এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী যে কোন সময়ে গণ-পরিষদে যোগদানের অধিকার লাভ করেন। প্রস্তাবের তৃতীয় প্যারায় বলা হইল,—এই সম্মেলন দেশীয় রাজ্য কর্তৃক মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা যথাযথভাবে পালন করিবার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতেছে এবং মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা অনুসারে আহূত গণ-পরিষদের অধিবেশনে ইউনিয়ন

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছুক দেশীয় রাজ্যকে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দিতেছেন প্রকাশ থাকে যে, গণ-পরিষদকে তৎপূর্ব্বে উভয় আলোচনাকারী কমিটির মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তির মৌলিক সর্ত্ত এবং অন্যান্য বিষয়সমুহ অনুমোদন করিতে হইবে। (হিন্দুস্থান টাইমস্, ২-৪-৪৭)

রাজন্যসমাজের এই মতভেদ তৎকালে অনুচিত গুরুত্ব লাভ করে। ভূপাল বিরোধী রাজন্যবর্গ "দেশভক্ত" এবং "প্রগতিবাদী" আখ্যালাভ করেন। কিন্তু ভাবালুতা বর্জ্জিত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মৌলিক বিষয়ে ভূপাল, বিকানীর বা পাতিয়ালার কোন পার্থক্যই ছিল না। ২৯শে জানুয়ারীর দিল্লী প্রস্তাবের মূল দাবী সম্পর্কে সকলেই একমত ছিলেন। স্বৈরাচারী শাসন কায়েম রাখা, প্রজা অধিকারের আন্দোলন দমন প্রভৃতি বিষয়ে ভূপাল-বিকানীরের যে কোন প্রভিদ ছিল না, বিকানীরের মহারাজার এক গোপন সার্কুলার হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বোম্বাই অধিবেশন কালে বিকানীরের মহারাজা নরেন্দ্রদের নিকট যে গোপন সার্কুলার প্রচার করেন তাহাতে স্পষ্ট ভাবেই বলা হয়,—"আমি বলি না যে এখনই কোনরূপ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হউক; কেননা আমি ইহা ভালভাবেই জানি যে, অধিকাংশ রাজ্যের জনগণই এইরূপ ব্যবস্থার উপযোগী নহে। কিম্বা আমি এমন কথাও বলি না যে, আমাদের অন্ধের মত পাশ্চাত্য অথবা অন্য কোনরূপ গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করিতে হইবে।" কিন্তু মতভেদ দেখা দিল গণ-পরিষদে যোদানের "সময়" লইয়া। বিকানীর এখনই যোগদানের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া বলেন যে—"প্রারম্ভিক অবস্থায় আমরা যদি যোগদান করি তবে আমরা উহার সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করিতে পারিব, বিলম্বে উহা সম্ভব নাও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এখন যোগদান

করা হইলে বৃটিশ ভারতের "শান্তিকাম অংশের" সহিত সখ্যস্থাপন করা যাইবে এবং দেশীয় রাজ্যে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করা এবং "গৃহযুদ্ধ" বন্ধ করা সহজতর হইবে। তৃতীয়তঃ, এখন যোগদান করিলে আমরা দেশীয় রাজ্যের জনগণের আনুগত্য ও সমর্থন লাভ করিব এবং সমস্ত পরিস্থিতিকে যাদুমন্ত্রে "শাসক গোষ্ঠীর অনুকূলে" রূপান্তরিত করিতে পারিব। চতুর্থতঃ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন অবস্থায় আমাদের গণ-পরিষদে যোগদান করিতে নিষেধ করেন নাই। পরিশেষে, গণপরিষদে যোগদান করিলেও যে কোন ক্ষতি নাই তাহার উল্লেখ করিয়া বিকানীর-সার্কুলারে বলা হইল—"গণ-পরিষদ স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। গণ-পরিষদে যোগদান করা হইলেও ইহার সিদ্ধান্ত কোন রাজ্যের উপরই বাধ্যতামূলক নহে যে পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্য উহা অনুমোদন না করে। যে কোন রাজ্য ইউনিয়নে যোগ দিতে পারে অথবা বাহিরে থাকিতে পারে।—সম্ভবতঃ এই বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা হয় নাই।" ইহা সত্ত্বেও কেহ যদি "গড়িমসি" করে তবে তাহা দেশীয় রাজ্যের পক্ষে "আত্মহত্যার" সামিল হইবে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বিকানীর বলেন—"আমরা যদি স্থায়ী ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনে সাহায্য না করি তবে বৃটিশ ভারতের শান্তি ও মীমাংসাকামী অংশের প্রভাব ক্রমে পাইবে এবং অনিবার্য্য ভাবে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। যদি বামপন্থীরা ক্ষমতা করায়ত্ত করে তবে দেশীয় রাজ্যের অবস্থা কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। (ফ্রি প্রেস জার্ণাল, ৩-৪-৪৭)। ইহার পর বিকানীর-পাতিয়ালার প্রগতিবাদিতা এবং দেশভক্তি সম্পর্কে টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, ভুপাল-করফিল্ড চক্রান্তের মধ্যে এই মতদ্বৈধের ফলে সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিতে খানিকটা সুফল দেখা দিল। গণ-পরিষদ

এপ্রিল অধিবেশনে চুক্তি অনুমোদন করেন। গোয়ালিয়র অধিবেশনে দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলনও চুক্তি অনুমোদন করেন এবং গণ-পরিষদের তৃতীয় অধিবেশনে কোচিন, উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, বিকানীর, পাতিয়ালা, রেওয়া এবং বরোদা—এই আটটি রাজ্যের প্রতিনিধি যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত নবনগরের জামসাহেব, গেয়ালিয়র রাজ্য, মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা প্রভৃতি এজেন্সীর বহু রাজ্যও গণ-পরিষদে যোগদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাইয়া গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই আশাই প্রকাশ করেন যে, বাকী রাজ্যের প্রতিনিধিগণও অবিলম্বেই এই মহান কার্য্য সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করিবেন। বস্তুতঃ অতঃপর প্রায় প্রতি দিনই নূতন নূতন রাজ্যের গণ-পরিষদে যোগদানের সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল।

শাঠ্যের নূতন খেলা ও গোয়ালিয়র ঃ

রাজন্যসমাজের বোম্বাই অধিবেশনের পর যে কয়েকটি দেশীয় রাজ্য গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে, সংখ্যায় তাহারা বেশী নহে। অধিকাংশ রাজ্যই তখনও "মনস্থির" করিতে পারে নাই। তাহারা তখনও বৃটিশ ভারতের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিতেছিল। এই সময়ে গোয়ালিয়রে দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশন বসে। শেখ আবদুল্লা সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি কারারুদ্ধ থাকায় ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। অন্তবর্ত্তী সরকারের সহ-সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর রাও দেও প্রমুখ বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা এই অধিবেশনে যোগদান করেন। অধিবেশনে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়; তন্মধ্যে উভয় আলোচনাকারী

কমিটির চুক্তি এবং দেশীয় রাজ্যের মণ্ডলীগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চুক্তি সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হইল :—দেশীয় রাজ্য এবং গণ-পরিষদের আলোচনাকারী কমিটির মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তির সর্ত্তাবলী সম্মেলন নিতান্ত অসন্তোষজনক এবং প্রজা সম্মেলনের আদর্শের বিরোধী বলিয়া মনে করেন। তথাপি গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক ঘোষিত আদর্শ অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সহযোগিতা করার ঐকান্তিকতা হইতে সম্মেলন জনগণের স্বার্থ এবং মর্য্যাদার প্রশ্ন বিবেচনা করিয়া প্রজামণ্ডলসমূহকে গণ-পরিষদের নির্ব্বাচনে সহযোগিতা করিতে পরামর্শ দিতে প্রস্তুত আছেন।......সম্মেলন লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বহু রাজা এবং রাজনৈতিক বিভাগ দেশীয় রাজ্য সমূহকে গণ-পরিষদ হইতে দূরে রাখার চেষ্টা করিতেছেন। এই বাধাদানের নীতি গোটা ভারতের স্বার্থ এবং দেশীয় রাজ্যের স্বার্থের-বিরোধী ; সুতরাং উহা সর্ব্বতোভাবে নিন্দনীয় এবং উহা প্রতিরোধ করা আবশ্যক। ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া দরকার যে, দেশীয় রাজ্যের জনগণ গণ-পরিষদের কাজে পূরাপূরিভাবে সহযোগিতা করা সমর্থন করে। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৯-৪-৪৭)।

যে সমস্ত রাজ্য গণ-পরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহাদের অভিনন্দিত করিয়া এবং বিরোধীদের সতর্ক করিয়া দিয়া প্রস্তাবটিতে বলা হয় যে, "যোগদানে ক্রমাগত অনিচ্ছা প্রকাশের অর্থ ভারতের স্বাধীনতার প্রতি শত্রুতাচরণ এবং দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণকে এই মনোভাব এই ভাবেই বিচার করিতে হইবে।"

দেশীয় রাজ্যের মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে উদয়পুর প্রস্তাবের "অস্পষ্টতা" দূর করিয়া সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন—"সম্মেলন মনে করেন, ফেডারেল ইউনিয়নের রাষ্ট্রাংশ হিসাবে আধুনিক ও প্রগতিশীল

শাসন, ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য কমপক্ষে একটি রাজ্যের জনসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ এবং রাজস্ব তিন কোটি হওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত রাজ্যের ইহা আছে কেবলমাত্র তাহারাই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হইবার যোগ্য। অবশ্য উপযুক্ত কারণ থাকিলে বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই এই সব রাজ্যের উপযুক্ত সম্পদ এবং আধুনিক ও প্রগতিশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গতি থাকা আবশ্যক।”

“বাকী যে সমস্ত রাজ্যে এই ব্যবস্থা সম্ভব নহে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উহাদের ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তিতে মণ্ডলীবদ্ধ করিতে হইবে। এই সব মণ্ডলীতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হইবার উপরিউক্ত মান যথাসম্ভব রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। একজন নৃপতিকে শাসনতান্ত্রিক কর্ত্তা নির্ব্বাচিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউনিয়নের এক অখণ্ড রাষ্ট্রাংশ হিসাবে ইহার শাসনকার্য্য চালাইতে হইবে। বাকী রাজ্যসমূহকে সন্নিহিত প্রদেশসমূহের আন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেশীয় রাজ্য হিসাবে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে।” (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৫-৪-৪৭)

স্বাধীন ভারতে দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে সম্মেলনের এই প্রস্তাব ব্যাখ্যা করিয়া ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া সভাপতির অভিভাষণে বলেন, এই প্রস্তাব অনুসারে দশ বারোটি রাজ্য স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিবে; একশত কিম্বা দেড়শত রাজ্য মণ্ডলীবদ্ধ হইতে পারিবে,—বাকী আর সমস্ত রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। ডাঃ সীতারামিয়ার ভাষায় “টবের মধ্যে কেহই সাঁতার কাটিতে পারে না। ইহার জন্য অন্ততঃ একটা পুষ্করিণী দরকার যেখানে সাঁতার কাটা না গেলেও অন্ততঃ অবগাহন করা সম্ভব।” (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৮-৪-৪৭)

প্রস্তাবের চাইতে সম্মেলনে আগত বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বক্তৃতাবলীর মধ্যেই গোয়ালিয়র সম্মেলনের আসল মনোভাব সুপরিস্ফুট। প্রতিনিধির পর প্রতিনিধি রাজন্যসমাজের বর্ব্বর দমননীতি, তাহাদের রাজনৈতিক শাঠ্য ও প্রতিক্রিয়াশীলতার তীব্র নিন্দা করেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশঙ্কররাও দেও ভারতের ঐক্য ও সংহতি বিনাশী রাজন্য সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "রাজন্যসমাজের মধ্যে যাহারা অদ্যাপি ইউনিয়নে যোগ দিতে চাহেন না তাহাদের স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া দরকার যে, জনসাধারণ তাহাদের সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য নহে—তাহারাও নিজেদের পছন্দসই সিদ্ধান্ত করিবার অধিকারী" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৯-৪-৪৭)। চূড়ান্ত সাবধান বাণী উচ্চারিত হইল নেহরুর বজ্রকণ্ঠে—"যাহারা ইউনিয়নে যোগ দিবে না আমরা তাহাদের শত্রুরাজ্য বলিয়া গণ্য করিব।"

লীগ-ঘেঁষা ভূপাল-করফিল্ড চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্য করিয়াই জওহরলালজী এই দ্ব্যর্থহীন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। নেহরুজীর এই সবধানবাণীর পর মুসলিম লীগ নির্ব্বাক থাকিতে পারিল না। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সহকারী-সভাপতির এই ঘোষণা রাজন্যসমাজের মনে বিষম ত্রাস সৃষ্টি করে। লীগ সম্পাদক মিঃ লিয়াকৎ আলী ইহাদের আশ্বস্ত করার জন্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন (২১-৪-৪৭)—'নেহরুজীর অভিমত অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অভিমত নহে। তাঁহার পক্ষে এইরূপ উক্তি করা নিতান্ত অবিবেচনাপ্রসূত হইয়াছে। ইহা মৃত গণ-পরিষদকে বাঁচাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা।......মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন সময়কার ভাষ্য অনুসারে দেশীয় রাজ্যসমূহ বর্ত্তমান গণ-পরিষদের (লীগ বিহীন) সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিতে পারে। দেশীয় রাজ্যের সহযোগিতা দ্বারা এই গণ-পরিষদের প্রহসনে খানিকটা

গুরুগম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করার জন্য পণ্ডিত নেহরু উদগ্রীব হইতে পারেন; কিন্তু কোন রাজ্যকেই তিনি কংগ্রেসের জুলুম মানিতে বাধ্য করিতে পারেন না।' যে সমস্ত রাজ্য গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লীগ-সম্পাদক বলেন—'মাত্র কয়েকটি রাজ্যই কংগ্রেসের ভীতি প্রদর্শনে ঘাবড়াইয়াছে; অধিকাংশ রাজ্য বড়লাট ও ভারতীয় নেতৃবর্গের আলোচনার ফলাফলের প্রতীক্ষা করিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছে। যখন বৃটিশ ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইবে দেশীয় রাজ্য সমূহ তখন সান্নিধ্য বা নিজের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া পাকিস্থান বা হিন্দুস্থানে যোগদান করিতে পারিবে; কিম্বা তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ষ্ট্যাটাস্ লাভ করিতে পারিবে।" দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে লীগ-নীতির এই ব্যাখ্যার পর মিঃ লিয়াকৎ আলী উপসংহারে বলেন, "রাজন্যসমাজ পণ্ডিত নেহরুর এই অর্থহীন হুমকি উপেক্ষা করিবেন বলিয়াই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২১-৪-৪৭)

নবাবজাদার অভয়বাণীর জবাব দিলেন বিকানীরের মহারাজা—"আমি বিশেষ দুঃখিত যে, আমাদের প্রকৃত মনোভাব না জানিয়াই মিঃ লিয়াকৎ আলী খান আমাদের পক্ষে ওকালতি করিতে চাহিয়াছেন।" তাছাড়া গণ-পরিষদে যে সমস্ত রাজ্য যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহাদের প্রতি লীগ সম্পাদকের কটাক্ষের জবাব দিয়া বিকানীরের মহারাজা বলেন—"মাত্র কয়েকটি রাজ্য গণ-পরিষদে যোগ দিতে চাহিয়াছে একথা বলা ভুল। যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য গণ-পরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহাদের কয়েকটি ভারতের গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্য সমূহের অন্যতম এবং ইহাদের জনসংখ্যা দেশীয় রাজ্যের মোট লোক সংখ্যা নয় কোটি ত্রিশ লক্ষের মধ্যে তিন কোটির কম নহে।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ২৪-৪-৪৭)।

মিঃ লিয়াকৎ আলীর "আশ্বাসে" রাজন্যসমাজ জওহরলালজীর তথা কংগ্রেসের হুমকি "উপেক্ষা করিতে" পারিতেন কিনা অচিরেই তাহা প্রমাণিত হইত যদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে আবার নূতন করিয়া কূটনীতির খেলা সুরু করিয়া না দিতেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আসিয়া ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত যে নূতন রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করেন তাহার ফলে দেশ-বিভাগ ও দুইটি গণ-পরিষদের সম্ভাবনা ক্রমেই স্পষ্টতর হইতেছিল। গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ২৮শে এপ্রিল তারিখেই গণপরিষদকে কেবল ভারত বিভাগই নয় কয়েকটি প্রদেশ বিভাগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলেন (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)। ৩০শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত কে, এম, মুন্সী কার্য্যনির্দ্ধারক কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে গণ-পরিষদে বলেন—"দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে······কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দেশ বিভাগ শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হইবে বলিয়াও তিনি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেন (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।

রাজনীতির এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন সাম্রাজ্যবাদের দালাল চক্রান্তকারী রাজন্য সমাজের মনে নবীন উৎসাহ সঞ্চার করিল। নবোদ্যমে তাহারা সংহতি বিনাশী চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃটিশের এই নূতন পরিকল্পনার কথা ইহারা পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারেন নাই একথা বিশ্বাস করা কঠিন। রাজনৈতিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র সমূহ দেশীয় রাজ্যের "স্বাধীনতা", "স্বতন্ত্র ফেডারেশন" ও "কনফেডারেশন" গঠনের অনুকূলে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর মুখপত্র টাইমস্ পত্রিকা লিখিলেন (৩১শে মে, ১৯৪৭)—"বৃটিশ ভারতকে হিন্দু এলাকা ও মুসলমান এলাকায় ভাগ করা ছাড়া, ভূপালের নবাবের ন্যায় ধীর মস্তিষ্ক রাজনীতিকদের উদ্যোগে দেশীয় রাজ্যের যে কনফেডারেশন

গঠিত হইতেছে, নূতন ভারতে তাহারও স্থান হওয়া উচিত।” রয়টারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা নির্লজ্জের মত “নূতন সন্ধির” সুপারিশ জানাইয়া স্পষ্টভাষায় বলিলেন,—“ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসান হইতেছে। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, দেশীয় রাজ্যের সহিত বৃটেনের নূতন বন্দোবস্ত হইতে পারে না; নিঃসন্দেহে কয়েকটি রাজ্য বৃটেনের সহিত যথাসময়ে আলোচনা আরম্ভ করিবে (২রা জুন, ১৯৪৭)।

দেশ বিভাগের নয়াপরিকল্পনার আভাষ এবং সাম্রাজ্যবাদীর প্রচার রাজন্য সমাজকে কতটা দুঃসাহসী করিয়া তোলে কয়েকটি ঘটনা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। মহীশুর ইতিপূর্ব্বে গণ-পরিষদে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। মে মাসের শেষের দিকে সে সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিল। সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের কারণ সম্পর্কে দেওয়ান স্যার রামস্বামী মুদালিয়র বলিলেন,—আগামী সপ্তাহের মধ্যে এমন ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় যাহার ফলে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং কয়েকটি মাত্র ক্ষমতার অধিকারী সম্মিলিত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইতে পারে। যদিও আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করি যে, ইহা হইবে না (হিন্দু, ৩০-৫-৪৭)। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই গোয়ালিয়র এবং বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর রাজ্যসমূহ গণ-পরিষদে যোগদানের পূর্ব্বসিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দেয়। তাহারা ঘোষণা করিল যে, তাহারা এখন গণ-পরিষদে যোগ দিবে না; তবে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিলে তখনই যাহাতে প্রতিনিধি পাঠান যায় এজন্য তাহারা এখনই প্রতিনিধি “মনোনীত” করিয়া রাখিতেছেন। সিমলা পাহাড়িয়া রাজ্য সমূহের কয়েকটি “স্বাধীন” হইবার কথা বলিতে লাগিল যদিও ইহারা সকলেই গণ-পরিষদে যোগ দিবে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিল।

ইষ্টার্ণ ষ্টেট্স এজেন্সী এবং কাথিয়াবাড়ের রাজন্যবর্গ মে মাসের শেষে বৃটেনের হাত হইতে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব গ্রহণের জন্য এবং নিজেদের "স্বাধীনতা রক্ষার জন্য" রাজন্য পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত করেন (টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ২৩-৫-৪৭)। এই সময়ে কাথিয়াবাড় ও রাজপুতানার রাজন্যবর্গ এক মিলিত সভায় "সম্মিলিতভাবে রাজ্য রক্ষার সমস্যা" সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভুপাল-ইন্দোর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের উদ্যোগে স্যার জাফরউল্লা খানকে বিলাত পাঠান হইল; এই সব রাজন্যবর্গ জানিতে চাহেন যে তাহারা মিলিত ভাবে মধ্যভারতে কোন যুক্ত রাজ্য গঠন করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নের মর্য্যাদা দিবেন কিনা এবং তদনুযায়ী তাহার সহিত স্বতন্ত্র চুক্তি করিবেন কিনা। হায়দারাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, কাশ্মীর ও কালাত রাজ্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইবার বাসনা প্রকাশ করিতে লাগিল।

রাজন্যসমাজের মতিগতি যখন এইরূপ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তখনই ৩রা জুনের ঘোষণা প্রকাশ করেন। ভারত বিভক্ত হইল; পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা বিচ্ছিন্ন হইল এবং বিভক্ত ভারত ডোমিনিয়ন মর্য্যাদায় উন্নীত হইল এবং একটি গণ পরিষদের পরিবর্ত্তে দুইটি গণ-পরিষদ জন্মলাভ করিল। মন্ত্রী মিশনের সম্মিলিত ভারতের পরিকল্পনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ৩রা জুনের পরিকল্পনা জন্মলাভ করিলেও দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে মন্ত্রীমিশনের রোয়েদাদই বহাল থাকিল,—"বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টভাবে জানাইতে চাহেন যে, উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত বৃটিশ ভারত সম্পর্কেই প্রযোজ্য; এবং দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে মন্ত্রী মিশনের ১২ই মে তারিখের স্মারকলিপিতে যে নীতির কথা উল্লেখিত হইয়াছে তাহা অপরিবর্ত্তিত থাকিল।" (জুন ঘোষণার অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ)। অর্থাৎ রাজ চক্রবর্ত্তিত্ব উত্তরাধিকারী গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের হস্তে অর্পিত হইবে না; উহা দেশীয় রাজ্যের নিকট প্রত্যর্পিত হইবে। দেশীয়

রাজ্য স্বাধীন থাকিতে বা যে কোন ডোমিনিয়নে যোগ দিতে পারিবে।

সংহতিবিনাশী রাজন্যসমাজের ক্রিয়াকলাপ ভারতে নানারূপ সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করিতেছিল। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকামী দেশীয় রাজ্য ও রাজ্যসমষ্টির সহিত বৃটেন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করিতে পারে এই শঙ্কা ভারতবাসীর চিত্ত আলোড়িত করিতে ছিল। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ৪টা জুন তারিখের সাংবাদিক সভায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব বিবৃত করিয়া বলেন—"দেশীয় রাজ্যসমূহ স্বতন্ত্রভাবে ডোমিনিয়ন রূপে গণ্য হইতে পারে না।" এই মন্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বাতিল হইবার পর দেশীয় রাজ্য সমূহ যে কোন গণ-পরিষদে যোগ দিতে পারিবে, কিম্বা উহার সহিত অন্য যে কোন বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। যদি কোন রাজ্য বৃটেনের সহিত নূতন অর্থনৈতিক বা সামরিক চুক্তির অভিপ্রায় জানায় তবে তিনি এই অনুরোধের কথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন কিন্তু এই প্রশ্ন এখনও উঠে নাই।

অন্যান্য প্রশ্নের জবাবে লর্ড লুই বলেন—"বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কোনরূপ আলোচনা হইতে পারে না। আমরা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব ফিরাইয়া দিতেছি এবং এই দিক হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও উভয় গণ-পরিষদের সহিত তাহাদের চুক্তির জন্য আমরা প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমরা (অর্থাৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট) প্রকৃত পক্ষে কোন নূতন আলোচনা করিতে যাইতেছি না; ভারতে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে গিয়া আমরা যথাসম্ভব আইনসম্মত পথ অবলম্বনের চেষ্টাই করিয়াছি।" অতঃপর বড়লাট বলেন,—ভারতীয় রাজ্যসমূহ ভালভাবেই জানেন কি করিলে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। তাহারা বর্ত্তমান গণ-পরিষদে যোগ দিতে পারেন, কিম্বা ইচ্ছা করিলে

নূতন গণ-পরিষদেও যোগ দিতে পারেন। এ বিষয়ে তাহাদের অবাধ স্বাধীনতা আছে; তবে ভৌগোলিক অবস্থান তাহাদের সিদ্ধান্তকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৫-৬-৪৭)

সাংবাদিক সভায় লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের বিবৃতি হইতে একটা জিনিষ সুস্পষ্ট হইল যে, বৃটেন কোন দেশীয় রাজ্যকে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন বলিয়া স্বীকার করিবে না। কিন্তু কোন রাজ্য যদি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া বৃটেনের সহিত স্বতন্ত্র সামরিক কিম্বা বাণিজ্যিক চুক্তি করিতে চাহে? এ বিষয়ে বড়লাটের জবাব খুব স্পষ্ট নয়। তিনি বলিলেন, এইরূপ কোন অনুরোধ জানান হইলে তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা প্রেরণ করিবেন। বৃটিশ গর্ণেমেণ্ট এ সম্পর্কে কি মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা তখনও অজ্ঞাত। তবে ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার জুন ঘোষণার পর যে বিবৃতি দেন তাহাতে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি কর্ত্তৃক লণ্ডন হইতে প্রেরিত সংবাদ সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইল যে, "বৃটেন এক্ষণে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের কয়েকটির সহিত নূতন সম্পর্ক স্থাপনের কথা চিন্তা করিবে।" স্যার সি, পি তাঁহার বিবৃতিতে বলেন,—"আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কিম্বা অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্রভাবে কোন রাজ্যের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে অস্বীকার করিবে…কিম্বা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ত্রিবাঙ্কুরকে এমন এক অবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য করিবে যাহা তাহার স্বার্থের বিরোধী। আমি সানন্দে ঘোষণা করিতেছি যে, সংবাদপত্র এজেন্সী এই সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেষণ করিয়াছে তাহা ভিত্তিহীন এবং ইহা আমি সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানিতে পারিয়াছি। (টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া ৫-৬-৪৭)।

ডোমিনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন ঃ

ভারত বিভাগ ও ১৫ই আগষ্ট পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেশীয় রাজ্যের ডোমিনিয়নে যোগদানের প্রশ্নটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তুলিল এবং এই সম্পর্কে নূতন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা অনুসারে দেশীয় রাজ্যসমূহের স্ব স্ব ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নিরূপণের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। ইচ্ছা করিলে ইহারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে পারিত। এখন প্রশ্ন দাঁড়াইল,—ভৌগোলিক অবস্থান উপেক্ষা করিয়া কোন নৃপতি যদি উভয় ডোমিনিয়নের যে কোনও একটিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন তবে তাহা স্বীকৃত হইবে কিনা এবং জনগণের মতামত উপেক্ষা করিয়া রাজন্যসমাজ এককভাবে এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন কিনা। ডোমিনিয়নে যোগদান কিম্বা দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে? সার্ব্বভৌমত্ব প্রত্যর্পিত হইলে দেশীয় রাজ্যে কে ঐ প্রত্যর্পিত ক্ষমতার অধিকারী হইবে—জনসাধারণ না রাজন্যসমাজ?

জুন মাসের মাঝামাঝি নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে এই সম্পর্কে ভারতীয় জনসাধারণের সুস্পষ্ট অভিমত প্রতিফলিত হইল। প্রজা সম্মেলনের ষ্টাণ্ডিং কমিটিও দেশীয় রাজ্যের জনগণের মতামত জ্ঞাপন করিলেন। ৩১শে মে তারিখে নয়াদিল্লীতে এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে দেশীয় রাজ্যের সমস্যার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন—"স্বাধীন ভারতে বিড়লা-রাজ বা ভূপালের নবাব-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। স্বাধীন ভারতে পঞ্চায়েৎ রাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপ ভারতে ব্যক্তির মূল্য খুব বেশী নহে। কাজেই কাশ্মীর সম্পর্কে মহারাজা ও তাহার সৈন্য বাহিনীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নহে। সেখানকার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সিদ্ধান্তই ধর্ত্তব্য। হায়দরাবাদ, ভূপাল, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা এবং অন্যান্য রাজ্য সম্পর্কেও এই কথাই

খাটে।” তিনি আন্তরিক আশা প্রকাশ করেন, হিন্দু এবং মুসলিম রাজন্যবর্গ কোন পক্ষ গ্রহণ করিবেন না। ইহারা পক্ষ গ্রহণ করিলে দুর্দ্দিন দেখা দিবে। অতএব রাজন্যসমাজ গণ-পরিষদে যোগদান করিলে সুবিবেচনার কাজ করিবেন। বৃটিশ যদি আন্তরিক হয় তবে তাহাদের দেখা উচিত, অনর্থ সৃষ্টি করিবার মত একজন নৃপতিও যেন ভারতে না থাকে। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১-৬-৪৭)।

জুন ঘোষণা প্রকাশিত হইলে দেখা গেল দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজন্যসমাজের উপর কোনরূপ চাপ দিতে প্রস্তুত নহেন। বড়লাট মাত্র এইটুকু জানাইলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতে দুইটির বেশী ডোমিনিয়ন সৃষ্টি করিতে চাহেন না। কোন দেশীয় রাজ্য বা রাজ্যনিচয়কে তাহারা স্বতন্ত্র ডোমিনিয়ন হিসাবে অনুমোদন করিবেন না।

জুন মাসে নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের চূড়ান্ত অভিমত বিঘোষিত হইল। নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রস্তাবে ঘোষণা করা হইল,—কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণার এবং অবশিষ্ট ভারত হইতে স্বতন্ত্র হইবার অধিকার মানিয়া নিতে পারে না; কেননা এইরূপ সিদ্ধান্ত ভারতের ইতিহাসের গতি এবং জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষার বিরোধী। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া রাজন্যবর্গ জনগণের সহিত একযোগে ভারতীয় ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক অংশ হিসাবে ইহাতে যোগ দিবেন বলিয়া প্রস্তাবে আশা প্রকাশ করা হয়। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৫-৬-৪৭)।

নিখিল ভারত কংগ্রেসের সমক্ষে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—“আমরা ভারতের কোন দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা অনুমোদন করিব না। অধিকন্তু কোন বৈদেশিক

রাষ্ট্র ইহাদের স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া অনুমোদন করিলে ঐ কার্য্যকে শত্রুতাচরণ বলিয়া গণ্য করিব।”

সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে জওহরলালজী বলেন—বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব পরিহার করিলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে; অথবা উহা দেশীয় রাজ্যের নিকট ফিরিয়া যাইবে এমন কথাও বলা যায়। কিন্তু ভারতের প্রধানতম শক্তির মধ্যে খানিকটা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব নিহিত আছে। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক দেশরক্ষা প্রভৃতি কারণে এই সার্ব্বভৌমত্ব বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কেহ যদি মনে করেন ইহা বাতিল হইয়া যাইবে তবে তাহারাই উহা আবার পুনরুজ্জীবিত করিবেন। পণ্ডিতজী সুস্পষ্ট ভাষায় জানান, দেশীয় রাজ্যের সম্মুখে কোন তৃতীয় পন্থা নাই; হয় তাহাদের সমানাধিকার লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে হইবে; না হয় ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত কতকটা সার্ব্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। সমমর্য্যাদায় উভয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। “দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে আমরা ভারতে এমন কিছু ঘটিতে দিতে পারি না যাহার ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে পারে। অতএব, আমি চাহি যে কেবল দেশীয় রাজ্যই নহে, বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহও বিষয়টি উপলব্ধি করুন।” (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৫-৬-৪৭)

দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ষ্টাণ্ডিং কমিটি এক প্রস্তাব প্রসঙ্গে (নয়া দিল্লী, ১২-৬-৪৮) ঘোষণা করেন, রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অবসানে দেশীয় রাজ্যের জনগণই সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী হইবে। কোন নৃপতি যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তবে তিনি কেবল ভারতীয় ইউনিয়ন নহে, রাজ্যের প্রজাদেরও শত্রুতাচরণ করিবেন এবং ঐরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিরোধ করিতে হইবে। কমিটি আশা করেন, আলোচনাকারী

কমিটিদ্বয়ের চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যসমূহ গণ-পরিষদে যোগদান করিবেন। যদি কোন রাজ্য যোগদান করিতে অস্বীকার করে তবে ষ্টাণ্ডিং কমিটি গণ-পরিষদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছেন, তাহারা যেন রাজ্যের জনগণকে গণ-পরিষদে যোগদানের অনুমতি দেন। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।

ভারতের দুইটি-প্রধান গণপ্রতিষ্ঠান সমস্বরে দেশীয় রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাহাদের অভিমত জ্ঞাপন করিলে মিঃ জিন্না দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে লীগের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া এক বিবৃতি দেন। রাজন্যবর্গের পক্ষে ওকালতি করিয়া মিঃ জিন্না বলেন, রাজ-চক্রবর্ত্তিত্বের অবসান হইলে ভারতীয় রাজ্যসমূহ "হিন্দুস্থান গণ-পরিষদ" কিম্বা পাকিস্থান গণ-পরিষদ ইহার যে কোন একটিতে যোগদান করিতে পারিবে অথবা স্বাধীন হইতে পারিবে। "দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে লীগের নীতি সুস্পষ্ট। আমরা কোন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কেন না, এই বিষয়টি মূখ্যতঃ রাজা ও প্রজাদের মধ্যে মীমাংসা করিতে হইবে। কোন রাজ্য যদি পাকিস্তান গণ-পরিষদে যোগ দিতে চাহে, কিম্বা আমাদের সহিত আলোচনা চালাইতে চাহে আমরা সানন্দে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইব। তাহারা যদি স্বাধীন হইতে চাহে কিম্বা পাকিস্তানের সহিত কোন রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনরূপ আর্থিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহে, তবে আমরা সানন্দে তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া উভয়ের স্বার্থসম্মত সম্পর্ক স্থাপন করিব। আমার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, কোন একটি গণ-পরিষদে যোগদান করা ছাড়া দেশীয় রাজ্যের গত্যন্তর নাই এই ধারণা ভ্রান্ত। আমার মতে, ইচ্ছা করিলে তাহারা স্বাধীন থাকিতে পারে। বৃটিশ কমনওয়েলথ, বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট বা অন্য কোন শক্তি ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের কোন

কিছু করাইতে পারে না। এইরূপ করাইবার কোন অধিকারও তাহাদের নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন, বৃটিশ ভারতের কোন গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট তাহারা রাজচক্রবর্ত্তিত্ব হস্তান্তর করিবেন না।" ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব হস্তান্তরিত হইতে পারে না। ইহা বিলুপ্ত হইবে। রাজচক্রবর্ত্তিত্বের বিলুপ্তির পর দেশীয়রাজ্যসমূহ সম্পূর্ণ সার্ব্বভৌম মর্য্যাদা লাভ করিবে। (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ১৭-৬-৪৭)।

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর কণ্ঠে আবার সাবধান বাণী উচ্চারিত হইল। প্রার্থনান্তিক ভাষণে (১৩-৬-৪৭) তিনি বলিলেন,—সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাজন্যসমাজ যদি যুগোপযোগী ভাবে চলিতে না পারেন তবে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কংগ্রেস তাহাদের বিলুপ্ত করিতে চাহে না। কিন্তু রাজন্যসমাজ দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় মহান প্রতিষ্ঠানটিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।" বৃটিশদের লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী বলিলেন—"বৃটিশ যদি এই জাতীয় কার্য্যাবলী (দেশীয় রাজ্যের স্বাধীন হইবার প্রচেষ্টা) সমর্থন করে, তবে উহা তাহাদের চিরন্তন লজ্জার কারণ হইবে।"

রাজন্যসমাজকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে যখন সতর্ক বাণী ও অভয়বাণী উচ্চারিত হইতেছিল তাহারা তখন রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে রাজচক্রবর্ত্তিত্বের ক্ষমতা করায়ত্ত করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। রেসিডেন্সী এবং পলিটিক্যাল এজেন্টেদের দপ্তর তখন রাজন্যবর্গের হস্তে সমর্পিত হইতেছিল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্টাণ্ডিং কমিটি নরেন্দ্রমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। পাতিয়ালার মহারাজার পৌরোহিত্যে কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া রাজপ্রতিনিধিকে জানান যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বাতিল হইলে নরেন্দ্রমণ্ডলের অস্তিত্বও লুপ্ত হইবে (৫-৬-৪৭)।

জুন ঘোষণার পর অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট বিভক্ত হইয়া গেল। প্রস্তাবিত দুইটি ডোমিনিয়নের পক্ষে দুইটি মন্ত্রিসভা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভাদ্বয়ে দেশীয় রাজ্যের জন্য দপ্তর খোলা হইল। ভারতীয় ইউনিয়নে দেশীয় রাজ্যদপ্তরের ভার গ্রহণ করিলেন সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল; পাকিস্তানের দপ্তর গ্রহণ করিলেন মিঃ লিয়াকৎ আলী। প্রস্তাবিত দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলেও দেশীয় রাজ্যের সমস্যা মুখ্যতঃ ভারতীয় ইউনিয়নের সমস্যা। ভারত বিভক্ত হইলেও শতকরা নব্বুইটি রাজ্যই ভারতীয় ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে পড়ে। সুতরাং ১৫ই আগষ্টের পর ভারতীয় ডোমিনিয়নের সহিত দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক যাহাতে ছিন্ন না হইয়া যায়, নেহরু-মন্ত্রিসভা তাহার ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইলেন।

৬ঠা জুলাই বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে যে বিল উত্থাপিত হইল তাহাতে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে মাত্র একটি ধারাই ছিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব ঘোষণাবলীর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইণ্ডিয়া বিলে (৭ ধারার ১নং উপধারা বি) বলা হইল—দেশীয় রাজ্যের উপর বৃটিশ রাজশক্তির সার্ব্বভৌমত্ব বাতিল হইবে। এই বিল পাশ হইবার দিন পর্য্যন্ত দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ এবং বৃটিশ রাজশক্তির মধ্যে যে সমস্ত সন্ধি ও চুক্তি বিদ্যমান আছে, ভারতীয় রাজ্য সম্পর্কে রাজার যে সমস্ত কর্ত্তব্য আছে, ভারতীয় রাজ্য অথবা তাহার রাজন্যসমাজ সম্পর্কে বৃটিশ রাজশক্তির যে দায়িত্ব আছে এবং সন্ধি, সনদ, রীতি, সম্মতি কিম্বা অন্যভাবে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ রাজশক্তির ঐ তারিখ পর্য্যন্ত যে ক্ষমতা, অধিকার, কর্ত্তৃত্ব আছে, সার্ব্বভৌমত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বাতিল হইয়া যাইবে। সহজ কথায়, বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট গৃহীত হইলে ভারতের দেশীয় রাজ্যের সহিত বৃটিশ রাজশক্তির যত কিছু সম্পর্ক আছে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে।

ইণ্ডিয়া বিলের এই বিধানটির সমালোচনা করিয়া ডাঃ বি, আর অম্বেদকর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে (৭-৭-৪৬) বলেন—বিলটির সপ্তম ধারার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে তাহার কথা চিন্তা করিয়া আমি জানি না কতজন ভারতবাসী শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত স্বাধীনতার জন্য আনন্দ বোধ করিতে পারিবেন। ভারতের ঐক্যের জন্য বৃটিশ জাতি কৃতিত্ব দাবী করে। এ দাবী ন্যায়সঙ্গত বটে। ঐ ঐক্য ক্ষুণ্ণ না করিয়া বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে এ আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে। উহা আরও গৌরবের। পরিতাপের বিষয়, ভারতীয় জনগণের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের প্রাক্কালে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ঐক্যবদ্ধ ভারতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর না করিয়া ঐ ঐক্য ধ্বংস করিতেছেন এবং যে অবস্থায় তাহারা ভারতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ভারতকে পুনরায় সেই আগেকার অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছেন। ভারতকে দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত করার যুক্তি থাকিতে পারে; কিন্তু দেশীয় রাজ্য ও ডোমিনিয়ন দ্বয়ের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করিবার কোন যুক্তিই নাই। এই স্বেচ্ছাচারিতার জন্য বৃটিশ জনগণকে অবশ্যই বিশ্বের দরবারে জবাবদিহি করিতে হইবে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন দ্রুত আগাইয়া আসিতেছিল। ১৫ই আগষ্ট বৃটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যের সম্পর্কচ্ছেদ হইলে যে শূন্যতা দেখা দিবে তাহার স্থান পূরণের জন্য পূর্ব্বাহ্নেই একটা বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। না হইলে যে চরম বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা দেখা দিবে তাহার ফলে ছোট বড় সকলের ভবিষ্যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। ৫ই জুলাই (১৯৪৭) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এক বিবৃতি প্রসঙ্গে আসন্ন বন্দোবস্ত সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টর মনোভাবের আভাষ দিয়া বলিলেন—দেশীয় রাজ্যসমূহ ইতিপূর্ব্বেই এই মূলনীতি স্বীকার করিয়াছেন যে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক এবং যানবাহন ব্যবস্থার জন্য তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নে

যোগ দিবেন। এই তিনটি বিষয়ে তাহারা যোগদান করুন। ইহার বেশী আমরা চাহি না; ইহার সহিত দেশের সকলের স্বার্থই জড়িত। অন্যান্য বিষয়ে আমরা তাহাদের স্বায়ত্তশাসনাধিকার শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলিব (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।

বিশদিন পরে রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন রাজন্যসমাজ ও তাহাদের মন্ত্রিবর্গের এক সাধারণ অধিবেশনে ঘোষণা করিলেন (২৫-৭-৪৭) "প্রজাদের মঙ্গলবিধানের দায়িত্ব আপনাদের; এই দায়িত্ব অস্বীকার করা আপনাদের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি প্রতিবেশী ডোমিনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাও কোন রাজ্যের পক্ষে সম্ভব নহে।" রাজপ্রতিনিধি হিসাবে সর্ব্বশেষ বক্তৃতায় লর্ড লুই আরও বলেন,—"এতকাল রাজপ্রতিনিধি এবং বড়লাট একই ব্যক্তি ছিলেন। সমস্বার্থবান সমস্ত বিষয়ের শাসন রক্ষণে এতকাল একটা মিলিত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশটি একটি মাত্র অর্থ নৈতিক ইউনিট হিসাবে কাজ করিয়াছে। এক্ষণে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইতে যাইতেছে। কোন বন্দোবস্ত যদি ইহার স্থান গ্রহণ না করে তবে দেশ জোড়া বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং আমি মনে করি, সেই বিশৃঙ্খলা দেশীয় রাজ্যসমূহকেই প্রথম আঘাত করিবে। যে রাজ্য যত বড় তাহার আঘাত তত কম হইবে এবং উহা অনুভব করিতে তত বিলম্ব হইবে। কিন্তু বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যও ক্ষুদ্র রাজ্যের মতই আঘাত অনুভব করিবে।"

অতঃপর লর্ড লুই বলেন—"রাজন্যসমাজের সকলেই মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় দেশীয় রাজ্যসমূহকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং যানবাহন ব্যবস্থা পরিচালনার ভার অর্পণ করিতে বলা হইয়াছে।" সর্দ্দার প্যাটেলের ন্যায় রাজ-

প্রতিনিধিও দেশীয় রাজ্যসমূহকে এই ভিত্তিতে ডোমিনিয়নে যোগদানের আহ্বান জানান। কারণ স্বরূপ তিনি বলেন,—(১) বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে দেশ রক্ষার জন্য দেশীয় রাজ্যসমূহ যদি ডোমিনিয়ন দুইটির যে কোনটীর সহিত সংযুক্ত না হয়, তবে তাহারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ-সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। (২) পররাষ্ট্রনীতি দেশ রক্ষার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। "বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের পক্ষেও এই সম্পর্ক যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নহে।" ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে দেশীয় রাজ্যসমূহ পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করে নাই। এক্ষণে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলে উহা তাহাদের পক্ষে দুর্ব্বহ বোঝার মত হইবে। যানবাহন ব্যবস্থাকেও ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তা করা যায় না।

এই পরিকল্পনার সুবিধার উল্লেখ করিয়া রাজপ্রতিনিধি বলেন,— "ইহা দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বোত্তম স্বার্থসম্মত। এই ভিত্তিতে মহান ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হইলে প্রতিটি দেশীয় রাজ্যের ব্যাপক আভ্যন্তরীণ কর্তৃত্ব থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি এবং যানবাহন ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। "গোটা দেশে বর্ত্তমানে অত্যন্ত সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বিদ্যমান। আমি দেশীয় রাজ্যসমূহকে তাহাদের আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত শাসন অথবা স্বাধীনতা খুব বেশী ত্যাগ করিতে বলিতেছি না। আমার পরিকল্পনায় আপনারা সকলেই এমন বাস্তব স্বাধীনতা পাইবেন, যাহা অপেনাদের সকলের পক্ষেই ভোগ করা সম্ভব এবং এই পরিকল্পনার ফলে আপনারা এমন কয়েকটি বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব মুক্ত হইবেন যাহা নিজস্ব ভাবে আপনাদের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নহে।" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড)

রাজপ্রতিনিধি নরেন্দ্রমণ্ডলের সমক্ষে ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদানের এক খসড়া সর্ত্তপত্র উপস্থাপিত করেন। আলাপ আলোচনার পর সর্ত্তপত্রটী অনুমোদিত হয়। *

নেহরু মন্ত্রিসভা সমর্থিত এই মাউণ্টব্যাটেন ফরমূলা একমাত্র হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর ছাড়া সমস্ত রাজ্যই অনুমোদন করিলেন। স্যার সি, পি, রামস্বামীর ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত স্যার সি পি'র স্বপ্নসাধ পূর্ণ হইল না—ত্রিবাঙ্কুর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিল। ভুপাল, ইন্দোর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য সম্পর্কে যে সংশয় ছিল, টালবাহনার পর তাহারও নিরসন হইল। ১৫ই আগষ্টের মধ্যে এককাত্র নিজাম রাজ্য, কাশ্মীর ও জুনাগড় ছাড়া ভারতীয় ইউনিয়ন এলাকার ছোট বড় ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক সমস্ত রাজ্যকেই যোগদানের সর্ত্তপত্রে সহি করিতে হইল। গণ-পরিষদে যোগদান না করিলেও ইহারা সকলেই ভারতীয় ডোমিনিয়নের—"এক প্রকার রাজচক্রবর্ত্তিত্ব" আনতশিরে মনিয়া লইলেন। পাকিস্থান এলাকায় দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত মিঃ জিন্না স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁহার বক্তৃতায় (২৫-৭-৪৭) পাকিস্তানের বড়লাটের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিলেন। অবশ্য অস্থায়ীভাবে বিভক্ত ভারতের পাকিস্তান এলাকার মধ্যে ভাওয়ালপুর, খয়রাপুর, কালাত, লাসবেলা প্রভৃতি কতিপয় বেলুচ রাজ্য এবং উপজাতীয় ও সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকজন চীফের এলাকা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন রাজ্য ছিল না। রাজপুতানা, কাথিয়াবাড় ও শিখ রাজ্যসমূহ পাকিস্তানের সীমান্তবর্ত্তী হইলেও উহার শাসকবর্গ প্রায় সকলেই অমুসলমান। তাহারা পাকিস্তানের সহিত যোগ দিতে চাহেন নাই। ভুপাল, রামপুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য আগ্রহী

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

থাকিলেও, ভৌগোলিক সংস্থান তাঁহাদের সাথে বাদ সাধিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সংলগ্ন ত্রিপুরা, কুচবিহার ও খাসিয়া রাজ্যসমূহ একই মনোভাবের দরুণ ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে যোগ দিবার কথা চিন্তা করেন নাই।

যে সর্ত্তপত্র অনুসারে দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিল তাহা জাতীয়তাবাদী ভারত কিম্বা দেশীয় রাজ্যের জনগণ কাহারও অভীষ্ট সম্মত নহে। বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ হইতে গোটা ভারতকে রক্ষা করার জন্য যেটুকু ক্ষমতা একান্ত প্রয়োজন, সর্ত্তপত্রে ভারত সরকারকে কেবলমাত্র ততটুকু ক্ষমতা ও অধিকারই দেওয়া হইল। বাকী আর সমস্ত ক্ষমতাই রহিল সামন্ত-শাসকের করধৃত। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এতকাল রাজন্য সমাজের সার্ব্বভৌমত্বের দাবীকে চ্যালেঞ্জ করিলেও, কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট যোগদানের সর্ত্তপত্রে রাজন্য সমাজের "অব্যাহত সার্ব্বভৌমত্ব" স্বীকার করিলেন। রাজন্য সমাজ এই সর্ত্তপত্র দ্বারা কেবলমাত্র "ভারতীয় ডোমিনিয়নের" সঙ্গেই নিজেদের রাজ্য গ্রথিত করিলেন,—গণ-পরিষদ রচিত শাসনতন্ত্র মানিয়া নেওয়া না নেওয়া তাহাদের "ইচ্ছাধীন" রহিয়া গেল।

ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের সঙ্কুচিত এক্তেয়ার ও ক্ষমতা সত্ত্বেও সর্ত্তপত্রখানি ঐতিহাসিক বিচারে অবশ্যই অবিস্মরণীয় দলিল বলিয়া গণ্য হইবে। বৃটিশ পরিকল্পনা দেশীয় রাজ্যসমূহকে যে অধিকার দিয়াছিল, সীমান্তবর্ত্তী কোন রাজ্য অথবা রাজ্য-সমষ্টি তদনুসারে যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হইবার জিদ ধরিত; কিম্বা ভৌগোলিক অবস্থান উপেক্ষা করিয়া উভয়ের যে কোন একটি ডোমিনিয়নে যোগদান করিতে চাহিত, তবে সাম্প্রদায়িক কলহ বিধ্বস্ত ভারতবর্ষে এক চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতার অর্থ, ভারতের বুকে

সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটি বাঁচিয়া থাকা। যোগদানের সর্ত্তপত্র ইহাদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী এবং বহিঃশক্তির সহিত প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সম্পর্কচ্যুত করিল; ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের সার্ব্বভৌমত্বের প্রাচীর তুলিয়া দেশীয় রাজ্যের জনগণকে ভারতীয় গণতন্ত্রের সহযোগিতায় সামন্তসমাজের সহিত চূড়ান্ত বুঝাপড়া করিবার সুযোগ দিল। সাম্প্রদায়িক গরিষ্ঠতার মানদণ্ডে বিভক্ত ভারত দলিলটির দরুণ বহুধা বিভাগের বেদনা হইতে অব্যাহতি পাইল এবং পাকিস্তান ব্যতীত অবশিষ্ট ভারত-ভূমির স্থায়ী ঐক্য ও সংহতির পথ সহজতর হইল।

আর সামন্ত সমাজের সহিত ভারতীয় গণতন্ত্রের এই চুক্তি উভয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের চূড়ান্ত নিয়ামক নহে। দলিলটি ভারতীয় ইতিহাসের এক অধ্যায়ের সমাপ্তি চিহ্নিত করিয়া নবরূপান্তরের সূত্রপাত করিল। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বাপর যে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন তাহা দেশীয় রাজ্যসমূহকে স্বাধীন মর্য্যাদা দান করে। কংগ্রেস বরাবর এই মতবাদের বিরোধিতা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। অবশেষে বৃটিশ বড়লাটই অকুণ্ঠভাষায় ঘোষণা করিলেন—কোন দেশীয় রাজ্যই ডোমিনিয়নের আওতার বাহিরে থাকিতে পারে না। বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির কণ্ঠেই ধ্বনিত হইল যে, রাজচক্রবর্ত্তিত্ব অবলুপ্ত হইলেও ভারত গবর্ণমেণ্টের অধিরাজত্ব উপেক্ষা করা সম্ভব নহে। এই অধিরাজত্বকে আনত শিরে মানিয়া লইয়া ডোমিনিয়নের সঙ্গে গ্রথিত হওয়া সামন্ত-ভারতের একমাত্র বিধিলিপি। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জুন অধিবেশনে (১৯৪৭) জওহরলালও ভারতের "প্রধানতম শক্তির অবিনশ্বর সার্ব্বভৌমত্ব" সম্পর্কে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। ডোমিনিয়নে যোগদানের সর্ত্তপত্রে ভারতের প্রধানতম শক্তির এই অনস্বীকার্য্য সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইল এবং পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিবেশে তাহাকে সামন্ত-কলঙ্ক চিহ্নিত ভারত-

ভূমিকে একই বর্ণে চিত্রিত করিবার সুযোগ দিল। উত্তরকালের হায়দারাবাদ, কাশ্মীর ও জুনাগড় সমস্যাকে বাদ দিলে রাজন্যসমাজ স্বাক্ষরিত ডোমিনিয়নে যোগদানের সর্ত্তপত্র ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগান্ত চিহ্নিত করিয়া নবপর্য্যায়ে শান্তিপূর্ণপথে বিস্ময়কর রূপান্তরের দ্যোতনা করিল। দেশীয় রাজ্য সমূহের সহিত যে স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার মেয়াদ ছিল সাময়িক কিন্তু ইহা দ্বারা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের যে নক্সা চিহ্নিত হইল আগষ্টোত্তর যুগে ক্রমপরিবর্ত্তনের পথে তাহা প্রাণবন্ত, ও কণ্টকমুক্ত হইতে চলিয়াছে। আশা করা যায়, নয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বেই গোটা ভারতীয় ইউনিয়ন মুঘল ও বৃটিশ যুগের বৈষম্য বিসর্জ্জন দিয়া শাসনতান্ত্রিক ঐক্য লাভ করিবে,—গণতান্ত্রিক ভারতের পার্লিয়ামেণ্ট সামন্ত-ভারত সহ গোটা ভারত রাষ্ট্রের জন্য আইন প্রণয়নের সমানাধিকার লাভ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

আগষ্টোত্তর পুনর্ব্বিন্যাস

পনরই আগষ্ট ভারতভূমির রাজনৈতিক পরবশতার অবসান হইল। এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সামন্ত সমাজকে এক অভূতপূর্ব্ব পরিস্থিতির মধ্যে ফেলিল। নিজেদের ক্ষমতা ও আসনের জন্য এতকাল তাহারা বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর শক্তি ও সাহায্যের উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর করিতে পারিয়াছেন। রাজা ও রাজপরিবারের বংশানুক্রম, তাহাদের বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকার অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আপৎকালে বৃটিশ বেয়নেট যে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইবে, এ বিষয়ে তাহাদের কোন সংশয়ই ছিল না। বস্তুতঃ জাগ্রত গণশক্তির বিরুদ্ধে ইহাই ছিল রাজন্য-সমাজের একমাত্র আত্মারক্ষার বর্ম্ম। এই পরম নির্ভরের জোরেই এতদিন তাহারা গণদাবীকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইয়াছে,—নির্ম্মম উৎপীড়নে তাহাকে শুদ্ধ করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু পনরই আগষ্ট এই আশ্রয় নীড় ভাঙ্গিয়া গেল। সামন্ত স্বার্থরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্য তো দূরের কথা, গণদাবীর বিরুদ্ধে তাহারা ভারত সরকারের নৈতিক সমর্থনও প্রত্যাশা করিতে পারেন না। পনরই আগষ্টোত্তর ভারতে সামন্ত সমাজ বন্ধুহীন নিজ নিজ সঙ্গতি ও সম্বল সর্ব্বস্ব অবরুদ্ধ দুর্গে পরিণত হইল। ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বক্ষমতা ছিল কংগ্রেসের করায়ত্ত। পরবশতার অবসান হইলেও অর্দ্ধ ভারতীয় ইউনিয়নের জনগণ যে তখনও সর্ব্ব রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত, কংগ্রেস ইহা বিস্মৃত হইতে পারে না। গান্ধীজীর কণ্ঠে ভারতের গণদাবী ধ্বনিত হইল—অর্দ্ধেক

ভারতভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিলে বাকী অর্দ্ধেকের স্বাধীনতা অর্থহীন। কংগ্রেস এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সামন্ত ভারতকে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কংগ্রেস হস্তক্ষেপ করিবে না। জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থী অংশ এই প্রতিশ্রুতি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নাই। আগষ্টোত্তর ভারতে কংগ্রেস ইহার বিপরীত কর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়া অনতিবিলম্বে ভারতরাষ্ট্রকে সামন্ত কলঙ্ক মুক্ত করুক—ইহাই ছিল তাহাদের দাবী। ডোমিনিয়নে যোগদানের সর্ত্তপত্র অনুযায়ী কংগ্রেস করায়ত্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টেরও দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার একতেয়ার রহিল না। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের এই নিরপেক্ষ মনোভাব সামন্ত স্বার্থের অনুকূল হইলেও, রাজন্য সমাজ স্পষ্টই উপলব্ধি করিলেন যে, গণদাবীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে তাহারা নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসাবে গণ্য করিতে পারে না; পক্ষান্তরে, জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সমর্থনে আগাইয়া না আসিলেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নৈতিক সমর্থন ছিল গণদাবীর পক্ষে। নূতন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জনসাধারণই বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য ও সমর্থন আশা করিতে পারে সামন্ত সমাজ নহে। কাজেই তাহারা এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন—রাজ্যের অভ্যন্তরে বিদ্রোহী প্রজা এবং বাহিরে কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের ভ্রুকুটি। তাহাদের সম্মুখে তখন মাত্র দুইটি পথই খোলা ছিল,—হয় গণদাবী মানিয়া নিয়া বিদ্রোহী প্রজাদের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিতে হইবে, আর না হয় এককভাবে তাহাদের দাবীর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে।

পক্ষান্তরে ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তন দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনের উপর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল।

বৃটিশের ভারত ত্যাগ দৃশ্যতঃ তাহাদের রাজনৈতিক জীবনে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন আনিল না। তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল—পূর্ব্বের ন্যায় স্বৈরাচারী শাসন ও শোষণে দাসজীবন যাপন করিতে লাগিল। প্রাদেশিক ভারতের জনগণ যেদিন পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিল তাহাদের বুকে সেদিনও স্বৈরাচারী সামন্ত শাসনের জগদ্দল পাথর। এই বৈসাদৃশ্য দেশীয় রাজ্যের গণ-মানসে সামন্ত শাসন মুক্তি এবং দায়িত্বশীল গণরাজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ আরও সুতীব্র করিয়া তুলিল। বাস্তব অবস্থার কোন ইতরবিশেষ না হইলেও রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য্য তাহারা সম্যকরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিল। বুঝিয়াছিল যে সঙ্ঘবদ্ধ গণ-সংগ্রামের আঘাত সহ্য করার মত শক্তি ও সঙ্গতি কোন সামন্ত শাসকের নাই। কাজেই, পনরই আগষ্টের পর দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলনের তরঙ্গ ক্রমেই উত্তাল হইয়া উঠিতে লাগিল। কতগুলি রাজ্যে প্রজা আন্দোলন আগে হইতেই চলিতেছিল ; ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ইহা তীব্রতর হইল।

মূলতঃ সব কয়টি প্রজা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সামন্ত শাসনের অবসান এবং পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। তথাপি বিভিন্ন রাজ্যে ইহা ভিন্ন ধরণের সমস্যা সৃষ্টি করিল। ভারতের প্রায় ছয়শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে আয়, আয়তন, লোকসংখ্যা ও সম্পদের দিক হইতে মাত্র কয়েকটি রাজ্যের পক্ষেই আধুনিক ধাঁচের গবর্ণমেণ্টসহ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব। ইহাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যায়। এই সব রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সমস্যা তত জটিল নয়। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন এবং অল্প আয়ের দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী স্বভাবতঃই অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র রাজ্যের এই সমস্যা তাহাদের পারস্পরিক জোট বাঁধা কিম্বা আত্ম-বিলোপের প্রশ্নের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সুতরাং প্রজা

আন্দোলনের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই তিনটি প্রশ্ন ততই গুরুত্ব লাভ করিতে লাগিল। কোচিন, মহীশুর ও ত্রিবাঙ্কুরে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী পূরণ করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা দেখা দেয় নাই। রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী যখনই উপলব্ধি করিলেন যে, পীড়ন বা ভেদনীতির দ্বারা কোন সুফল হইবার সম্ভাবনা নাই অমনিই তাঁহারা নতিস্বীকার করিয়া আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সমস্যাটির তত সহজে সমাধান হয় নাই। ক্ষুদে সামন্ত শাসকগোষ্ঠীর নির্ব্বোধ একগুয়েমীর ফলে গণবিদ্রোহ যখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইয়া যথাসময়ে হস্তক্ষেপ না করিলে সুনিশ্চিতরূপে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব কল্পনাতীত পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। এই দিক হইতে নীলগিরি প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

উড়িষ্যার এক অতি ক্ষুদ্র রাজ্য নীলগিরির ঘটনা কয়েকটি কারণেই স্মরণীয়। দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রভাবে মোটামুটিভাবে অহিংস গণসংগ্রামের পদ্ধতিতেই এতাবৎ পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ, মহাযুদ্ধের প্রভাব এবং আজাদ হিন্দের দৃষ্টান্তে গণ-আন্দোলনের পদ্ধতিতে খানিকটা রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ যুদ্ধোত্তরকালের প্রায় সব কয়টি গণ-সংগ্রামেই অহিংস পদ্ধতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহার অবশ্য আর একটি কারণও আছে। যুদ্ধোত্তরকালে যত গণ-বিদ্রোহ হইয়াছে তাহার প্রায় সব কয়টিরই নেতৃত্ব করিয়াছে বামপন্থীরা। গান্ধীবাদী পদ্ধতির উপর ইহাদের আস্থা তত প্রবল নহে। তাছাড়া দেশের অবস্থা অনুধাবন করিয়া গান্ধীজী নিজেও একথা একাধিকবার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে ভারতে গণ-আন্দোলন দেখা দিলে তাহা অহিংস নীতির বিধিবিধানের

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। যাহাই হউক, নীলগিরিতে প্রজা আন্দোলনের এই নূতন রূপ প্রায় পূর্ণতা লাভ করে। বিদ্রোহী প্রজাশক্তি অচিরেই আজাদ গবর্ণমেণ্ট গঠন করিল এবং গণ-ফৌজ গঠন করিয়া সামন্ত শাসকের অস্ত্রবলকে সশস্ত্র প্রতিরোধ দ্বারা প্রতিহত করিতে আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের খণ্ডযুদ্ধে প্রজা আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন নজীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। ব্যাপারটির কিন্তু এইখানেই পরিসমাপ্তি হইল না। উৎক্ষিপ্ত প্রজাশক্তি একদিন রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিল এবং রাজা প্রাণভয়ে পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন। ভারত সরকার ঠিক এই চরম সঙ্কটের মুহূর্ত্তেই হস্তক্ষেপ করেন; ফলে ব্যাপারটি আর বেশীদূর গড়াইতে পারে নাই।

নীলগিরির এই দৃষ্টান্ত সামন্ত সমাজের পক্ষে "শেষ সাবধানবাণীর" মত। মনে মনে তাঁহারা ভালভাবেই উপলব্ধি করিলেন যে, পুলিশ ও সৈন্যদলের সাহায্যে গণ-আন্দোলন দমন করিবার গোঁ ধরিলে ধন-সম্পদ তো দূরের কথা নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। অতঃপর চতুর্দ্দিকে প্রজাদের সহিত আপোষ করিবার একটা আগ্রহাতিশয্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সামন্ত সমাজ পূর্ব্বেই দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে ছাড়া ঐ প্রতিশ্রুতি কাগজে-পত্রেই নিবদ্ধ ছিল। তথাপি তাহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধোত্তর কালের প্রজা আন্দোলন উগ্রপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। আপোষপন্থী প্রজা আন্দোলনের বুর্জ্জোয়া অংশ ছিলেন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষপাতী এবং কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আস্থাভাজন। সর্ব্বভারতীয় প্রজা আন্দোলনের নেতৃত্বও ছিল ইহাঁদেরই করায়ত্ত। সামন্ত-সমাজ প্রথমদিকে প্রজাসম্মেলনের নেতৃত্বকে বাদ দিয়া প্রতিক্রিয়াশীলদের সমন্বয়ে আকাঙ্ক্ষিত "জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা" গঠনের চেষ্টা

করিয়াছেন। কিন্তু এই ধোঁকা বাজীর দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। কেননা এই প্রচেষ্টাকে স্বভাবতঃই সমগ্র প্রজা আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হইতে হইত; কাজেই ইহার সাফল্যের আশাও ছিল কম। এই অবস্থায়, রাজন্যসমাজ তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন করিলেন এবং প্রজা-আন্দোলনের আপোষকামী অংশের সহিত রফা করিয়া অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন সংস্কারের ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে শাসন ব্যবস্থাকে তাহারা যদি উনবিংশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক আদর্শের ছাঁচে ঢালিয়া সাজিতে সম্মত হন এবং দেশীয় রাজ্য দপ্তরের পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনা মানিয়া নিতে ওজর আপত্তি না করেন তবে তাঁহাদের ব্যাক্তিগত সম্পত্তি, মান, মর্য্যাদা এবং কতগুলি বিশেষ সুবিধা নিরাপদ থাকিবে। যে পথে বিপদের ঝুকি কম অবশেষে রাজন্যসমাজ সেই পথই বাছিয়া লইলেন এবং দেশীয় রাজ্যদপ্তর নির্দ্দিষ্ট পথে সামন্ত-ভারতের রূপান্তর আরম্ভ হইল। এই রূপান্তর-পরিকল্পনার ফলে পাঁচশত একত্রিশটি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে,—কতগুলি রাজ্য সংলগ্ন প্রদেশের অন্তর্লীন হইয়াছে। কতগুলি নিজেরা মিলিয়া মিশিয়া ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে আবার কয়েকটি রাজ্য নূতন ব্যবস্থাপনাধীনে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, তাহাদের আয়তন কমিয়াছে—এক কথায় এক বৎসরে পূর্ব্বেও দেশীয় রাজ্য বলিতে যাহা বুঝইত, আজ তাহা অতীত ইতিহাসের কাহিনী হইতে চলিয়াছে।

প্রদেশ ভুক্তি :

ভারত রাষ্ট্রের সংহতিসাধন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সামন্ত ভারতের শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক রূপায়ণ দেশীয় রাজ্য দপ্তরের পুনর্ব্বিন্যাস

পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিভিন্ন সূত্রে একাধিকবার ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের জনগণকে গণতান্ত্রিক শাসনাধিকার লাভের সুযোগ সুবিধা করিয়া দেওয়া তাহাদের অবিচলিত লক্ষ্য। কিন্তু ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহ আয়, আয়তন, সম্পদ এবং ভৌগোলিক সংস্থানের দিক হইতে এমন ভিন্ন প্রকৃতির যে সরাসরিভাবে উহাতে দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া সংহতি সাধন কিম্বা দেশীয় রাজ্যের আত্মবিলোপ ব্যতীত কোন রাজ্যেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাসম্মত আধুনিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা চলে না। কাজেই দেশীয় রাজ্যের বর্ত্তমান কাঠামো অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া যেখানে সরাসরি দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যায় না, তাহাদের পুনর্ব্বিন্যাসের জন্য দুইটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছে। ভৌগোলিক সংস্থান অনুযায়ী ইহাদের স্বাতন্ত্র্যলোপ করিয়া কোথাও বা মণ্ডলীবদ্ধ করা হইয়াছে; আবার কোথাও সংলগ্ন প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। শাসন-সংরক্ষণ ও সমুন্নতিসাধনের দায় হইতে সামন্ত শাসকদের অব্যাহতি দিয়া কোথাও ঐ দায়িত্ব ভারত সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন কিম্বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছে—আবার কোথাও এই ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজন্যসমাজ মোটামুটিভাবে বৃত্তিভোগী এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে চলিয়াছেন।

উড়িষ্যায় এই নূতন পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রথম কার্য্যকরী হয়। নীলগিরির গণ-সংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতির ফলে ভারত সরকার "শৃঙ্খলা স্থাপন এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য" "জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে" ১৪ই নভেম্বর (১৯৪৭) নীলগিরি রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। "রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়ায়"

ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, রাজাসাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আনতমস্তকে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নীলগিরি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু নীলগিরিকে উপলক্ষ করিয়া যে সমস্যা সৃষ্টি হইল শুধু শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে তাহার সমাধান হয় না। ভারত সরকার কোনক্রমেই প্রজা-আন্দোলনের পথরোধ করিয়া সামন্ত শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনের অস্ত্র হিসাবে নিজেকে ব্যবহৃত হইতে দিতে পারেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে সার্ব্বভৌম শক্তি হিসাবে রাজন্য স্বার্থরক্ষণে বৃটিশ শক্তি যে ভূমিকা গ্রহণ করিত, স্বাধীন ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সেই ভূমিকা গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। অথচ এককভাবে নীলগিরিতে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাও পণ্ডশ্রম। এই অবস্থায় ভারত সরকার উড়িষ্যার সমস্ত দেশীয় রাজ্যকে প্রদেশটির অন্তর্নিবিষ্ট করিবার পরিকল্পনা করেন। সাইমন কমিশন ও মহাতাব কমিটি বহু পূর্ব্বেই এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার রাজন্যসমাজ ভৌগোলিক সংস্থানে বিচ্ছিন্ন রাজ্যসমূহকে লইয়া কনফেডারেশন ধাঁচের এক অকার্য্যকর ইউনিয়ন গঠনের তোড়জোড় করিতেছিলেন। এই পরিকল্পনা স্বভাবতঃই উড়িষ্যার প্রজা-আন্দোলনের অনুমোদন লাভ করে নাই। ভারত সরকার ও এই পরিকল্পনা মানিতে অস্বীকার করিলেন এবং রাজন্যসমাজের সমক্ষে তাঁহাদের বিকল্প পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিলেন। নীলগিরির হুঁসিয়ারী রাজন্য সমাজের মনে যে বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রভাবে এবং অন্যান্য স্থানে গণ-আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ উড়িষ্যার সামন্তসমাজ দেশীয় রাজ্য দপ্তরের পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিলেন এবং ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সর্দ্দার প্যাটেলের উপস্থিতিতে

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ১লা জানুয়ারী (১৯৪৮) হইতে নিজ নিজ শাসন কর্তৃত্ব লোপে সম্মত হইলেন। ছত্রিশগড়ের রাজন্যসমাজও ইহার কয়েকদিন পরে নাগপুরে অনুরূপ আর এক চুক্তিপত্রে সহি করিলেন। ইষ্টার্ণ ষ্টেট্স্ এজেন্সীর পঁচিশটি উড়িয়া রাজ্য উড়িষ্যার সহিত যুক্ত হইল। একমাত্র ময়ুরভঞ্জ রাজ্যই অদ্যাপি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। সেরাইকেল্লা ও খরখান রাজ্যকে অবশ্য কিছুদিন পরে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশনের রোয়েদাদে শাসনতান্ত্রিক সৌকর্য্যের দরুণ বিহারের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। উড়িষ্যার আপামর জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তের জন্য যৎপরোনাস্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড় রাজ্যসমূহের প্রদেশভুক্তি অচিরেই ক্ষুদে রাজন্য মহলে আত্মবিলোপের প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করিল। অতঃপর প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন রাজ্যের নিকট হইতে দেশীয় রাজ্যদপ্তরে আত্মবিলোপের আবেদন পৌঁছাইতে লাগিল। ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) মাক্‌রা রাজ্য (১৫১ বর্গমাইল) মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত হইল। বাঙ্গানা পল্লী (২৫৯ বর্গ মাইল) ২২শে ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের মধ্যে আত্মবিলোপ করিল এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী লোহারু রাজ্য (২২৬ বর্গ মাইল) পূর্ব্ব পাঞ্জাবের অন্তর্লীন হইল। ইহার দিন দশেক পরেই (৩রা মার্চ্চ) মাদ্রাজের পুদুকোট্টাই রাজ্য (১১৮৫ বর্গমাইল) আত্মবিলোপের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। এতদিন যে সমস্ত রাজ্য প্রদেশের অন্তর্লীন হইয়াছে তাহাদের তুলনায় পুদুকোট্টাই রাজ্য অনেক বড়। এই তামিল রাজ্যটির শাসকগোষ্ঠী প্রথমে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেও প্রজারা মাদ্রাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইবার দাবী জানাইতেছিল। পুদুকোট্টাইর শাসনকর্ত্তা আত্মবিলোপের সিদ্ধান্ত করায় স্পষ্টতঃই বুঝা গেল যে, দেশীয় রাজ্যদপ্তরের নীতি প্রজাদের দাবীর অস্ত্র হিসাবে পরিচালিত হইলেও রাজন্যসমাজেরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার বিশেষ কারণ নাই।

দাক্ষিণাত্য রাজ্য নামে পরিচিত রাজ্যসমূহ ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। অতঃপর একমাত্র কোলাপুর ছাড়া বাকী ষোলটি রাজ্যই বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্লীন হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। এই সব রাজ্যের মোট আয়তন ৭৮১৫ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা এক কোটি সাত লক্ষ এবং বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা। নাটকীয় ঘটনা প্রবাহের ন্যায় বরোদা ব্যতীত গুজরাটের ষোলটি "জুরিসৃডিকসনাল" রাজ্য এবং আরও কতকগুলি সামন্ত-শাসিত অঞ্চল বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট হইবার সিদ্ধান্ত করিল। ইহাদের মোট আয়তন সাতাশ হাজার বর্গ মাইলেরও বেশী, লোকসংখ্যা ছাব্বিশ লক্ষ এবং বার্ষিক রাজস্ব এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার মত।

প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনার দরুণ ভারতীয় ইউনিয়নের সরাসরি কর্ত্তৃত্বাধীন এলাকা যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রাদেশিক রাজস্ব ও লোক-সংখ্যা যতটা বাড়িয়াছে ভারত সরকারের এক ঘোষণাপত্রে (৭ই জুলাই ১৯৪৮) তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে :—

প্রদেশ	অন্তর্নিবিষ্ট রাজ্যের সংখ্যা	আয়তন বর্গমাইল	জনসংখ্যা লক্ষ	রাজস্ব লক্ষ
উড়িষ্যা	২৩	২৩,৬৩৭	৪০'৪৬	৯৮'৭৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৫	৩১,৭৪৯	২৮'৩৪	৮৮'৩১
বিহার	২	৬২৩	২'০৮	৬'৪৫
মাদ্রাজ	২	১,৪৪৪	৪'৮৩	৩০'৮১
পূর্ব্ব পাঞ্জাব	৩	৩৭০	০'৮০	১০'৩৮
বোম্বাই	১৭৪	২৬,৯৫১	৪৩'৬৭	৩০৭'১৫
মোট	২১৯	৮৪,৭৭৪	১২০'১৮	৫৪১'৮৪

উপরি উক্ত হিসাব মতে, দুই শতাধিক দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব লোপের ফলে অতি অল্পকালের মধ্যেই আরও প্রায় পঁচাশী হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ভারতীয় ইউনিয়নের সরাসরি কর্তৃত্বাধীন হইল। ভারতীয় মানচিত্রের এই পরিবর্ত্তনের জন্য রাজন্যসমাজ কোন কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে না। অথচ এই প্রসঙ্গে অনেকেই সামন্ত-সমাজের দেশপ্রেমের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অহেতুক রাজস্তুতি। রাজন্যসমাজ এই ব্যবস্থাপনায় সম্মত না হইলে তাহাদের কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইত নীলগিরিতে তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছিল। নীলগিরিতে যাহা ঘটিয়াছে—ভারত সরকার হস্তক্ষেপ না করিলে যাহা ঘটিত ক্ষুদে সামন্তশাসিত যে কোন রাজ্যেই তাহার পুনরাবৃত্তি হইতে পারিত। অস্তিত্ব লোপের ব্যবস্থাপনায় সম্মত হইয়া রাজন্যসমাজ সেই পরিণতি এড়াইয়া গিয়াছেন মাত্র। এমন কি, নীলগিরির ঘটনাও ইহাদের মোহমুক্ত করিতে পারিত কি না সন্দেহ। বিপন্ন নীলগিরিরাজকে ত্রাণ করার চেষ্টায় উড়িষ্যার সামন্তসমাজ জোট বাঁধিয়াছিলেন এবং স্বৈরাচার কায়েম রাখার জন্য যুক্ত-সৈন্যদল প্রেরণের আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারত সরকার যদি বাদ না সাধিতেন তবে সর্ব্বত্রই ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিত। কাজেই এই উদ্যোগই প্রতিপন্ন করে যে, নতিস্বীকারের পূর্ব্বে সামন্ত সমাজ তখনও শেষ সংগ্রাম করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। উনিশশ' সাতচল্লিশ সালের নবেম্বর মাসেও এইরূপ মনোভাব পোষণ করা নিশ্চয়ই "দেশপ্রেমের" দ্যোতক নহে।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বিপন্ন জীর্ণ অর্ণবপোতের কাপ্তেন অকস্মাৎ সম্মুখে কোন নিরাপদ বন্দর দেখিলে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং নির্ব্বিচারে সেই দিকে ছুটিয়া চলে, সর্ব্বনাশা পরিবেশ-পরিবেটিত রাজন্য সমাজও দেশীয় রাজ্যের প্রদেশভুক্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের সর্ত্ত

পরিজ্ঞাত হইয়া ঠিক সেই পন্থা অনুসরণ করিলেন। ভারত সরকারের সর্তপত্রে তাহাদের যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল নীলগিরির ঘটনার পর অনেকের পক্ষেই হয়ত ততটা নির্বিঘ্নতা প্রত্যাশা করা সম্ভব হয় নাই। প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনা তাহাদের নিকট হইতে কেবলমাত্র শাসনক্ষমতা ত্যাগের দাবী জানাইল এবং এই ত্যাগের বিনিময়ে তাহাদের প্রতিশ্রুতি দিল যে—

(১) রাজা প্রতি বৎসর রাজ্যের রাজস্ব হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট ভাতা পাইবেন। যে রাজ্যের আয় লক্ষ টাকা (১৯৪৫) সেখানকার বাৎসরিক রাজভাগ হইবে পনর হাজার। এক লক্ষ হইতে পাঁচলক্ষ টাকা আয়ের রাজ্যসমূহের রাজারা পাইবেন শতকরা দশ টাকা হিসাবে। পাঁচ লক্ষের বেশী রাজস্ব বিশিষ্ট রাজ্যের রাজা পাইবেন শতকরা সাড়ে সাত টাকা। ষ্টেট্ ট্রেজারী কিম্বা ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট অপর যে কোন ট্রেজারী হইতে আগাম চার কিস্তিতে রাজা এই টাকা তুলিতে পারিবেন।

(২) ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা, স্বত্ব এবং ভোগ দখলের সমস্ত অধিকারই তাহাদের থাকিবে। রাজাকে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি, সিকিউরিটি এবং নগদ সম্পত্তির একটা হিসাব ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে। কোনটা রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনটা ষ্টেটের সম্পত্তি এই প্রশ্ন লইয়া যদি বিরোধ দেখা দেয় তবে ঐ সম্পর্কে ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত অফিসারের রায় চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) রাজ্যের ভিতরে কিম্বা বাহিরে ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে রাজা, রাণী, রাজমাতা, যুবরাজ ও যুবরাণী যে ব্যক্তিগত বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেন তাহা অক্ষুণ্ণ থাবিবে।

(৪) আইন ও রীতি অনুসারে রাজ্যের গদীতে উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া নিবার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল এবং রাজা ব্যক্তিগত-

ভাবে যে অধিকার, বিশেষ সুবিধা, মর্য্যাদা এবং উপাধি ভোগ করিতেন তাহারও নিশ্চয়তা মিলিল।

এই বন্দোবস্ত এবং প্রতিশ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রদেশভুক্তি পরিকল্পনার মারফতে ভারত সরকার রাজা ও রাজপরিবারকে বৃত্তি-ভোগী বিত্তবান এক নূতন অভিজাত শ্রেণীতে পরিণত হইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর তাঁবে ইহারা যে সঙ্কীর্ণ শাসন ক্ষমতা ভোগ করিতেন কিন্তু প্রজাপীড়নের অবাধ সুযোগ পাইতেন, পরিকল্পনায় তাঁহাদের সেই পুরুষানুক্রমিক স্বেচ্ছাচারিতাটুকু পরিহার করিতে বলা হইয়াছে। প্রজাদের সগোত্রীয় প্রদেশবাসীদের সহিত একইভাবে শাসিত হইবার সম্মতি দিয়া ক্ষুদে রাজন্যসমাজ পুরুষানুক্রমে একটা মোটা ভাতা, শোষণ-পুষ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং আরও কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া নিলেন। ইহাদের রাজনীতিতে যোগদানের কোনও বাধাও রহিল না। ভারত-রাষ্ট্রের প্রজা হিসাবে এই মৌলিক অধিকার তাহারা অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কথা চিন্তা করিলে সেদিনের স্বৈরাচারী সামন্তদের প্রত্যক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতিতে যোগদানের অবাধ অধিকার দেওয়া অবশ্যই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তাছাড়া প্রতিটি সামন্তকে ঘিরিয়া দেশীয় রাজ্যে যে কায়েমী স্বার্থ বাসা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল এই রূপান্তরে তাহাদেরও বিশেষ উদ্বেগের কারণ রহিল না। প্রাদেশভুক্তির পরিকল্পনায় তাহাদের বিন্দুমাত্র আঘাত করা হয় নাই। তাহারা পূর্ব্বের মতই রহিয়া গেল। কেবল নূতন ব্যবস্থাপনায় তাহাদের মধ্যযুগীয় জুলুমের সুযোগ খানিকটা সঙ্কুচিত হইবে মাত্র। এতদ্ব্যতীত এই কায়েমী স্বার্থবানগণ প্রাদেশিক ভারতের সগোত্রদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবেন এবং উহাদের ন্যায় সমান সুযোগ

সুবিধা ভোগ করিতে থাকিবেন। আপোষ মীমাংসার শান্তি-পূর্ণ পথে এই মূল্য দিয়াই আপাততঃ সামন্ত-ব্যবস্থার সংস্কার করিতে হইয়াছে। কাজেই উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের রাজন্যসমাজেব সহিত চুক্তি নিষ্পন্ন হইবার পর অন্যান্য ক্ষুদে সামন্তও যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপের "দেশপ্রেম" অনুভব করিয়া থাকিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের কি? রাজন্যসমাজ শাসন কার্য্যে অপটু হইলেও বৈষয়িক বুদ্ধির অভাব তাহাদের নাই।

ইউনিয়ন গঠন ঃ

"দেশীয় রাজ্যের পুনর্বিন্যাস এবং গণতন্ত্রীকরণের" জন্য ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট যদি কেবলমাত্র প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনাই অনুসরণ করিতেন তবে পরিকল্পনাটির দোষ ত্রুটি সম্পর্কে যে সমালোচনাই করা হউক মোটামুটি ভাবে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে উহার প্রভাব দেশীয় রাজ্যের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের যে বিকল্প পরিকল্পনা অনুসরণ করা হইয়াছে তদপেক্ষা অধিকতর শুভঙ্কর হইত। প্রদেশভুক্তির ফলে দেশীয় রাজ্য এবং প্রাদেশিক ভারতের সমভাষাভাষী জনগণের কৃত্রিম রাজনৈতিক ব্যবধান ঘুচিয়া যাইত। তাহাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হইত। দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক জীবন প্রত্যক্ষ সামন্ত-প্রভাব মুক্ত হইয়া আরও পরিচ্ছন্ন হইত এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থগন্ধী আঞ্চলিকতাবাদ বহুলাংশে তিরোহিত হইয়া ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইত।

উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের রাজন্যসমাজের সহিত চুক্তির পরে ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি চুপ করিয়া থাকিতেন এবং প্রজা আন্দোলন কোথাও ত্রিবাঙ্কুর মহীশুরের ন্যায়, কোথাও বা নীলগিরির ন্যায় সামন্তদুর্গ কাঁপাইয়া তুলিতে পারিত তবে, প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনা আরও বহু

ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভ করিত। ইহার ফলে স্থানে স্থানে সংঘর্ষ ও রক্তপাত, সাময়িকভাবে একটা আশান্ত, শৃঙ্খলাহীন অব্যবস্থিত পরিস্থিতি দেখা দিত, সন্দেহ নাই। কোথাও এই সংঘর্ষ তীব্র ও কঠোর হইত ইহাও সত্য। সমস্ত সামন্তের শক্তি ও সামর্থ্যই নীলগিরির রাজার মত নহে। কিছু সামন্তের হাতে প্রচুর শস্ত্রবল ছিল। এই চূড়ান্ত সংঘর্ষে তাহারা নির্ব্বিচারে ও নির্ম্মমভাবেই উহা প্রয়োগ করিত। কিন্তু তৎ-সত্ত্বেও এই সংঘর্ষ, অশান্তি বা শৃঙ্খলাহানির প্রতিক্রিয়া আঞ্চলিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ভারতজোড়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। কিন্তু ভারত সরকার যদি এই নীতিই অনুসরণ করিতেন তবে দেশীয় রাজ্যের রাজন্যসমাজ অবশ্যই ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের বিরোধী হইতেন এবং উহার শত্রুতাচরণ করিতেও হয়ত পশ্চাৎপদ হইতেন না। ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট শক্তিধর রাজন্যসমাজের এই সম্ভাব্য বিরুদ্ধাচরণের সম্মুখীন হইতে চাহেন নাই। পক্ষান্তরে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষবিক্ষুব্ধ ভারতে রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ যাহাতে নূতনতর অশান্তি সৃষ্টি করিতে না পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারা তাহার সম্ভাবনা এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রাদেশিকার্দ্ধ যখন সাম্প্রদায়িকতা ও পাল্টা সাম্প্রদায়িকতার পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তখন, স্বাধীনতার প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে দেশীয় রাজ্যার্দ্ধের শান্তিরক্ষার গুরুত্ব রাষ্ট্রীয় সংহতি ও নির্ব্বিঘ্নতার বিচারে অবশ্যই উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

কটক ও নাগপুর চুক্তির কালেই ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সমস্ত রাজ্য সম্পর্কেই তাঁহারা এই প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনা অনুসরণ করিতে চাহেন না। দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের জন্য তাঁহারা আরও একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরস্পর সন্নিহিত কতগুলি দেশীয় রাজ্যের

স্বাতন্ত্র্য লোপের ভিত্তিতে সম্মিলিত রাজ্যমণ্ডল গঠন এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার শাসনকার্য্য পরিচালন এই পরিকল্পনার মূল কথা। দেশীয় রাজ্যসচিব, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই পরিকল্পনাকে প্রদেশ-ভুক্তি পরিকল্পনার ভিন্ন রূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সংলগ্ন প্রদেশের অন্তর্লীন হওয়া কিম্বা সংলগ্ন রাজ্যের সহিত স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া মিলিত হওয়া উভয় ব্যবস্থাকেই তিনি অন্তর্নিবেশ পরিকল্পনার অংশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যদপ্তরের এই পরিকল্পনা অনুসারে এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ছয়টি ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে—

(১) **সৌরাষ্ট্র :**—কাথিয়াবাড়ের ২১৭টি বিভিন্ন ধাঁচের রাজ্য লইয়া সৌরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৩১,৮৮৫ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার এবং বাৎসরিক রাজস্ব আট কোটি টাকা। একমাত্র জুনাগড় ছাড়া কাথিয়াবাড়ের সমস্ত রাজ্যই সৌরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে। কাথিয়াবাড়ের বারোশত বৎসরের বিশিষ্টতার অবসান ঘটাইয়া জুনাগড়ও যে অচিরেই সৌরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। জামনগরের জামসাহেব সৌরাষ্ট্রের রাজপ্রমুখ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(২) **মাৎস্য :**—সৌরাষ্ট্রের হুবহু অনুকরণে আলোয়ার, ঢোলপুর, ভরতপুর এবং কারাউলী এই চারিটি রাজ্য লইয়া মাৎস্য গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৭,৫৩৬ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ১৮ লক্ষ ৩৮ হাজার এবং রাজস্ব এককোটি তিরাশী লক্ষ ছয় হাজার। ঢোলপুরের মহারাজা ইহার রাজপ্রমুখ।

(৩) **বিন্ধ্যপ্রদেশ :**—রেওয়া রাজ্যসহ বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের ৩৫টি রাজ্য লইয়া বিন্ধ্যপ্রদেশ গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন

২৪,৬১০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ ৬৯ হাজার এবং বাৎসরিক রাজস্ব ২ কোটি ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। রেওয়া, অর্কা, দাতিয়া ছত্তরপুর, নাগোদ, কোথী, অজয়গড়, বিজাবর, বাউনী, বারাউন্ধা, চরখারী, মইহার, পান্না, সমথর, আলিপুর, লুগাশী, বাঁকাপাহাড়ী, বেরী, ভাইসুন্দা, বিহাত, বিজনা, ধুরবাই, গারাউলী, গৌরীহর, যশো, জিগনী, কামতারাজাউলা, খানিয়াধনা, নৈগাবন রোবাই, পাহ্রা, পালদেও, সরিলা সোহাবল, তাঁরাও এবং তোরীফতেপুর এই যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রেওয়ার মহারাজা বিন্ধ্যপ্রদেশের রাজপ্রমুখ।

(৪) **রাজস্থান** :—উদয়পুরসহ দশটি রাজপুত রাজ্য লইয়া রাজস্থান গঠিত হইয়াছে। আপাততঃ উদয়পুর, কোটা, বুন্দি, ডুঙ্গরপুর, ঝ্যালোয়াড়, প্রতাপগড়, টঙ্ক, কিষেণগড়, শাহপুরা এবং বাঁশ-বরা রাজ্য লইয়া রাজস্থান গঠিত হইলেও সমস্ত রাজপুত রাজ্যের সংহতি সাধনই রাজস্থানের লক্ষ্য এবং এজন্য অন্য রাজ্যের যোগদানের পথ খোলা রাখিয়াই ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে। রাজস্থানের আয়তন-২৯,৯৭৭ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪২ লক্ষ ৬১ হাজার এবং বাৎসরিক রাজস্ব তিনকোটি ১৬ লক্ষ ৬৭ হাজার। উদয়পুরের মহারাণা রাজস্থানের রাজপ্রমুখ।

(৫) **মধ্যভারত** :—গোয়ালিয়র ও ইন্দোর সহ মালবের ২০টি রাজ্য লইয়া মধ্যভারত গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ৪৬,২৭৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৭১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং বাৎসরিক রাজস্ব ৭ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ঝাবুয়া, মাতবর, জোবাত, শৈলানা, জাওরা, সিতামৌ, খিলিচপুর, পিপলোদা, দেওয়াস্ (সিনিয়র), নরসিংহগড়, রাজগড়, ধর, জুনিয়র দেওয়াস্, রতলাম, বারবনী, আলীরাজপুর, কাথিয়াবাড়া ও কুরবাই দেশীয় রাজ্য

এই সর্ব্ববৃহৎ ইউনিয়নের অন্তর্গত। ইহার গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ইন্দোর এবং শীতকালীন রাজধানী গোয়ালিয়র হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। গোয়ালিয়রের মহারাজা মধ্যভারত ইউনিয়নের রাজ-প্রমুখ এবং ইন্দোরের মহারাজা (সিনিয়র) উপরাজপ্রমুখ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(৬) **পাতিয়ালা ও পূর্ব্বপাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন*** :— পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কপূর্রতলা, ফরিদকোট, মালের কোটলা, নলগড় ও কলসিয়া—এই আটটি রাজ্য লইয়া পূর্ব্ব পাঞ্জাব ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১০,১১৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩৪ লক্ষ ২৪ হাজার এবং বাৎসরিক রাজস্ব ৫ কোটি টাকা। পাতিয়ালার মহারাজা ইহার রাজপ্রমুখ।

উপরিউক্ত ছয়টি ইউনিয়ন গঠনের ফলে ২৯৪টি বিশ্লিষ্ট রাজ্য মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি রাষ্ট্রাংশে পরিণত হইয়াছে। যে ছয়টি স্বতন্ত্র চুক্তি দ্বারা এই ইউনিয়ন কয়টি গঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকিলেও সব কয়টি চুক্তিই কতগুলি সাধারণ মূলনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রদেশভুক্ত রাজ্যের রাজন্যসমাজ বৃত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগদখল প্রভৃতি সম্পর্কে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন, ইউনিয়নে যোগদানকারী রাজ্যের শাসকগণও তৎসমুদয় লাভ করিয়াছেন। তাছাড়া স্থির হইয়াছে :—

(১) যোগদানকারী রাজন্যসমাজ একটি মাত্র শাসন বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগের অধীনে তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যসমূহ ঐক্যবদ্ধ করিবেন। যোগদানকারী রাজ্যের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব, একতেয়ার, দায়, দায়িত্ব, কর্ত্তব্য ও বাধ্যবাধকতা ইউনিয়নের উপর বর্ত্তিবে।

(২) রাজন্যসমাজ একটি রাজন্যপরিষদ গঠন করিবেন এবং উহার মধ্য হইতে একটি সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হইবে। রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ

* অস্থায়ী নাম।

শাসনকর্ত্তা, রাজপ্রমুখ এবং উপ-রাজপ্রমুখ (এক বা একাধিক) রাজন্ত পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। যে শাসক রাজপ্রমুখ নির্ব্বাচিত হইবেন তিনি যোগদানকারী রাজ্যের রাজা হিসাবে যে ভাতা প্রভৃতি পাইবেন তদতিরিক্ত পদ ও মর্য্যাদা অনুসারে রাজপ্রমুখ হিসাবেও ভাতা, মাহিনা প্রভৃতি পাইবেন। ইউনিয়নভুক্ত রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী থাকিবে তাহারই অধীন ও আজ্ঞাবহ। তবে এই ব্যাপারে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মানিতে বাধ্য থাকিবেন। শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য রাজপ্রমুখ একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন ; ঐ মন্ত্রিসভা তাঁহার পছন্দমত গদীতে বহাল থাকিবেন। রাজন্যবর্গ সম্পাদিত এবং ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্যদপ্তর কর্ত্তৃক অনুমোদিত চুক্তি (Covenant) এবং পরে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে তাহার বিধান সাপেক্ষ ইউনিয়নের শাসন ক্ষমতা রাজপ্রমুখেরই থাকিবে। তিনি স্বয়ং সরাসরি অথবা অধীন অফিসারের মারফতে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। তবে ইউনিয়নের ক্ষমতাবান যে কোন আইনসভা ইচ্ছা করিলে অধীনস্থ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন ; কিম্বা ইউনিয়নভুক্ত রাজ্যের যে কোন আদালত, বিচারক, অফিসার বা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ যে ক্ষমতা ভোগ করিতেছেন তাহা রাজপ্রমুখের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন (সৌরাষ্ট্র কভ্‌ন্যাণ্টের অষ্টম ধারা)।

(৩) ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটি শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। ঐ পরিষদকে রাজন্যবর্গের চুক্তি এবং ভারতের শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে ইউনিয়নের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে। এই পরিষদ গঠন, ভোটাধিকার ও নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সীমা নির্দ্ধারণ, নির্ব্বাচন পরিচালনা প্রভৃতির ভার রাজপ্রমুখদের উপর অর্পিত হইয়াছে। তবে কোন ইউনিয়নে কতজন সদস্য লইয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠিত হইবে

নির্ব্বাচন কেন্দ্রই বা কোন ধরণের হইবে, রাজন্যসমাজের কভ্‌ন্যাণ্টে মোটামুটিভাবে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের জন্য জন-প্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইবে।

এই সাধারণ নীতিগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ইউনিয়ন গঠন করিতে গিয়া রাজস্বার্থের সহিত প্রজাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক মধ্যপন্থী আপোষ করিয়াছেন এবং প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনায় রাজন্যসমাজের প্রতি যে "করুণা" দেখান হইয়াছে তদপেক্ষা বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়া সামন্তসমাজকে ইউনিয়ন গঠনে সম্মত করিতে হইয়াছে। "শাসক ও শাসিতের যুগ্ম-সম্মতিক্রমে" দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস করিতে গিয়া ভারত সরকার সামন্ত সমাজের তুষ্টি বিধানের জন্য আরও অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছেন। বৃটিশ যুগের কিম্বা তৎপূর্ব্বকালের আভিজাত্য ও কৌলীন্যের সহিত আপোষ করিয়া যে ভাবে রাজপ্রমুখ এবং উপ-রাজপ্রমুখ নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এবং প্রতিটি রাজ্যমণ্ডলের শীর্ষে রাজপ্রমুখ তথা রাজস্বার্থের প্রতিনিধিদের যে ব্যাপক ক্ষমতা, কর্ত্তৃত্ব এবং অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, নেহরু গবর্ণমেণ্ট পর্য্যায়ক্রমে সংস্কারপন্থী লিবারেল রাজনীতিকদের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণরসমূহ যে ক্ষমতা ভোগ করেন, রাজপ্রমুখগণ অনায়াসেই তদপেক্ষা বেশী কর্ত্তৃত্বের অধিকারী হইবেন এবং রাজন্যসমাজ সাবেক প্রতিপত্তি ও বর্ত্তমান অধিকার বলে শাসনকার্য্য পরিচালনায়, শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠনে তথা শাসনতন্ত্র রচনায় পর্য্যন্ত এমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন যাহার ফলে এই গণতন্ত্রীকরণ ব্যবস্থার গণ শব্দটি আসল তাৎপর্য্য হারাইয়া ফেলিতে পারে। ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদকে ভারতের শাসনতন্ত্র এবং রাজন্যসমাজের চুক্তির গণ্ডীর মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ফলে শাসনতন্ত্র

রচয়িতা পরিষদ সর্ব্বসম্মত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেও রাজন্যসমাজের চুক্তি অনুমোদিত অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না; উহার অর্থ শীর্ষাধিষ্ঠিত রাজন্যসমাজকে অপসারিত করিবার এবং ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে তাহাদের রাষ্ট্রাংশকে সাধারণতান্ত্রিক ধাঁচে গড়িয়া তুলিবার কোন অধিকার তাহাদের থাকিবে না। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের মধ্যে তাহারা বড়জোর "নিয়মানুগ রাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। ইহার ফলে, সামন্তপ্রভু, বুর্জ্জোয়া সম্প্রদায় এবং অন্যান্য কায়েমী স্বার্থবানগণ এই সমস্ত ইউনিয়নে একযোগে যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব ও প্রাধান্য লাভের সুযোগ পাইবেন এবং তাহার বলে তাহাদের পক্ষে যে প্রগতিবিরোধী সংরক্ষণশীল ভূমিকা অভিনয় করা সম্ভব হইবে তাহাতে নবগঠিত রাজ্যমণ্ডলের "গণতন্ত্র" চটকদার বহিরাবরণে পর্য্যবসিত হইবার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান।

এই সংস্কার ব্যবস্থার ফলে সমূহ যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার গুরুত্বও কম নহে। পারস্পরিক বিশ্লিষ্টতা এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের দরুণ সঙ্কীর্ণ সঙ্গতিবান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের পক্ষে জনকল্যাণকর কার্য্য করা একরূপ অসম্ভব ছিল। প্রতিটি রাজ্যের স্বতন্ত্র শাসনযন্ত্রের ব্যয় রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্বের এক বিরাট অংশ আত্মসাৎ করিত। এক্ষণে স্বাতন্ত্র্য লোপের ফলে এই সমস্ত রাজ্যের সম্মিলিত রাজস্ব কার্য্যকরীভাবে সমষ্টিকল্যাণে নিয়োজিত হইবার সুযোগ পাইবে; শাসন ব্যবস্থার একত্রীকরণ জাতীয় সম্পদের বহু অপচয় বন্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

তাছাড়া, সম্পদের অপচয় ও অপ্রতুলতার জন্য এবং একতেয়ার পরিবর্ত্তনের দরুণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রায় সব কয়টির যানবাহন ব্যবস্থাই নিতান্ত সেকেলে ধরণের ছিল। বিভিন্ন রাজ্য যে আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক এবং অন্যান্য প্রকারের কর ধার্য্য করিতেন তাহার ফলে আভ্যন্তরীণ

ব্যবসায় বাণিজ্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইত। এতগুলি রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং আলাদা শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় বিচার ব্যবস্থা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষা বিশেষ অসুবিধাকর ছিল। প্রতিটি রাজ্যের স্বতন্ত্র আইন এবং স্বতন্ত্র কর-ব্যবস্থা ছিল এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের রাজস্ব ব্যবস্থার দরুণ শাসনতন্ত্র ও শাসন ব্যবস্থার একরূপতা একরূপ অসম্ভব ছিল। এই স্বতন্ত্র ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় ব্যাপক চোরাই রপ্তানি, চোরাবাজার, আইন বিগর্হিত এবং সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ উৎসাহ লাভ করিত। শাসনব্যবস্থার সংহতি সাধন এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধান করিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ভারত সরকার এবং সৌরাষ্ট্র ইউনিয়নের মধ্যে নিষ্পন্ন চুক্তি দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্ট কাথিয়াবাড় উপকূলের বন্দরসমূহের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করায় আগেকার জটিল শুল্ক-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এই পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনার ফলে ভারতীয় ইউনিয়নের রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক ঐক্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বাতিল করার সিদ্ধান্তে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের যে বিপন্নতা দেখা দেয়, ডোমিনিয়নে যোগদানের সর্ত্ত-পত্র স্বাক্ষরিত হওয়ায় তাহার অনিষ্টকারী সম্ভাবনা কিয়ৎপরিমাণে তিরোহিত হইল। তবু এই দলিলখানি স্বাক্ষরিত হওয়ায় দেশীয় রাজ্যের সহিত ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের যে সম্পর্ক স্থাপিত হইল প্রাদেশিক রাষ্ট্রাংশের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল তদপেক্ষা স্বতন্ত্র ধরণের—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব ছিল আরও ব্যাপক। এই অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া যদি নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করা হইত তবে ভারতরাষ্ট্রে দ্বিবিধ রাষ্ট্রাংশের উদ্ভব হইত এবং ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের শাসনকার্য্য পরিচালনায় এবং অর্থনৈতিক সমুন্নতির পরিকল্পনা কার্য্যকরী

করায় বহুতর অসুবিধা দেখা দিত,—একই রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সূত্রে গ্রথিত এক জাতি গঠনের পথ বিঘ্নকণ্টকিত হইত। দেশীয় রাজ্যের কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্য লোপ এবং তথায় দায়িত্বশীল শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই অসুবিধা সুনিশ্চিতভাবে বিলুপ্ত হইবে। বস্তুতঃ সম্প্রতি (৬ই মে, ১৯৪৮) কাথিয়াবাড়, রাজস্থান, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও মাৎস্য প্রদেশের রাজপ্রমুখগণ ও মন্ত্রিবর্গের সহিত এক বৈঠকের পর স্থির হইয়াছে যে, রাজপ্রমুখগণ ইউনিয়নভুক্ত রাজ্যসমূহের পক্ষে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের এক নূতন সর্ত্তপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং ঐ সর্ত্তপত্রের দরুণ ইউনিয়ন আইনসভা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সপ্তম তপশীলের ১নং এবং ৩নং তালিকা অনুযায়ী (১নং তালিকার ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয় বাদে) এই সব ইউনিয়ন সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। এই নূতন সিদ্ধান্তের দরুণ কেন্দ্রীয় সংস্থার সহিত ইউনিয়ন গুলির শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক কার্য্যতঃ প্রদেশ সমূহের ন্যায় হইবে। কেবল মাত্র ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্পর্কে সামান্য প্রভেদ থাকিবে।

দাসপ্রথা, বেথী ও বেগারপ্রথা সহ দেশীয় রাজ্যের গণ-জীবন নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও স্বাধীনতার অভাবে যে চরম অনগ্রসরতার পঙ্ক-কুণ্ডে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে সমষ্টি জীবনের সমুন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য্য স্বৈরাচারমুক্ত এই নূতন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য বিরাট পরিবর্ত্তন বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। নূতন ব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের যে চেষ্টা করা হইয়াছে বঞ্চিত জনসাধারণের সর্ব্বোত্তম স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তাহা ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত না হইলেও নব যুগের সূত্রপাত হিসাবে ইহাকে শুভারম্ভ বলিয়াই অভিনন্দিত করা যায়। নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব সমষ্টিগত ভাবে আজ জনগণের উপরেই বর্ত্তিয়াছে। বিঘ্ন-কণ্টকিত নবলব্ধ অধিকারকে

তাহারা যদি যথোচিতভাবে প্রয়োগ করিতে পারে তবে সামান্য বিলম্ব হইলেও শান্তির শুভঙ্কর পথেই হয়ত তাহারা ইষ্টলাভ করিতে পারিবে। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রামে বধবন্ধনের শঙ্কাহীন যে গণশক্তি সঙ্কল্পে অটল রহিয়াছে, পূর্ণতর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নূতনতর সংগ্রাম আবশ্যক হইলে তাহারা পশ্চাদপদ হইবে না, এ ভরসা অবশ্যই করা যায়। দেশীয় রাজ্যের গণ-জীবনের শান্তিপূর্ণ রূপান্তরকে এই প্রত্যয় লইয়া বিচার করিলে প্রারম্ভিক সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলিয়াই মনে হইবে।

কেন্দ্রায়ত্ত রাজ্য :

দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস কেবলমাত্র প্রদেশভুক্তি ও স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাজ্যমণ্ডল গঠনের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে নাই। এই নব রূপায়ণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভৌগোলিক সংস্থান এবং সামরিক গুরুত্বের প্রয়োজনে কয়েকটি কেন্দ্রায়ত্ত অঞ্চল গঠন করা হইয়াছে। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে গণ্য হইবার ন্যূনতম মান অনুসারে পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহকে লইয়া “হিমাচল প্রদেশ” নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে। পাঞ্জাবের নিম্নলিখিত একুশটি রাজ্যএই নব গঠিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে :—বাঘাল, বাঘাত, বালসান, বাশার, ভাজজী, বিজা, দ্বারকোটি, ধামী, জুব্বাল, কিয়ন্থল, কুমারসেন, কুনিহার, কুথার, মাহলোগ, মঙ্গল, সঙ্গরী, শিরমুর, থারোক, চম্বা, মন্দী ও সুকেত। প্রদেশটির আয়তন, ১০,৬০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার এবং বাৎসরিক রাজস্ব একুনে ৮৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা।

পাঞ্জাবের পাহাড়িয়া অঞ্চলে অবস্থিত নবগঠিত প্রদেশটির অধি-বাসীদের অধিকাংশই রাজপুত ও হিন্দুবংশোদ্ভূত। সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মীয়

স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চতুর্দ্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সমস্ত রাজপুত ও হিন্দু এই দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে ইহারা তাহাদেরই বংশধর। জনসাধারণ সমষ্টিগতভাবে নিতান্ত অনগ্রসর। গত ৮ই মার্চ্চ (১৯৪৮) জনকয়েক শাসক ও চীফ্ এক চুক্তিনামা দ্বারা ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাজ্য শাসন সম্পর্কে তাহাদের পূর্ণ এবং সমস্ত ক্ষমতা, অধিকার এবং একতেয়ার ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন; অন্যান্য রাজন্যবর্গ পরে এইরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। ডোমিনিয়ান গবর্ণমেণ্ট রাজ্য সমূহের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ইহাদের সংহত করিয়া একটি কেন্দ্রায়ত্ত অঞ্চলে পরিণত করিয়াছেন এবং ইহাদের শাসন সংরক্ষণের জন্য একজন চীফ কমিশনার নিয়োগ করিয়াছেন। ভাবী শাসনতন্ত্রে প্রদেশটির জন্য একজন লেঃ গবর্ণর নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিলাসপুর এই পাহাড়িয়া রাজ্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাহাকে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। প্রস্তাবিত বাখরা বাঁধ এই রাজ্যটির মধ্যে পড়িবে। এই পরিকল্পনার সর্ব্বভারতীয় গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া বিলাসপুরকে স্বতন্ত্র একটি কেন্দ্রায়ত্ত অঞ্চলে পরিণত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কিত পরিকল্পনা অদ্যাপি স্বাক্ষরিত হয় নাই।[১]

সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলস্থিত স্থলপথে পাকিস্তানের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগবিশিষ্ট কচ্ছ রাজ্যকেও কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত করা হইয়াছে। রাজ্যটির আয়তন ৮,৪৬১ বর্গ মাইল, বাৎসরিক রাজস্ব প্রায় আশী লক্ষ টাকা এবং লোকের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ এক হাজার। কচ্ছ রাজ্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য নহে। ইহার

---

(১) ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র (১৯৪৮)—১৯ পৃঃ

ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তুইটি ব্যবস্থা করা চলিত,—(১) সৌরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি, (২) ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্তি। কিন্তু রাজ্যটির ষ্ট্রাটেজিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারত সরকার বিকল্প পরিকল্পনা তুইটি বিবেচনা করেন এবং কচ্ছকে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করেন। ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের ঘোষনাপত্রে এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"অঞ্চলটির ব্যাপক সম্পদ-সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার সমুন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ও টেকনিক্যাল সাহায্য প্রয়োজন। কচ্ছ রাজ্য একক ভাবে কিম্বা নবগঠিত সৌরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ কিছুদিনের জন্য এই প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইবে না; অতএব কচ্ছের শাসক ১৯৪৮ সালের ৪ঠা মে রাজ্য শাসনের পূর্ণ এবং সমস্ত ক্ষমতা, কর্ত্তৃত্ব ও একতেয়ার ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়া এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং উহাতে ১৯৪৮ সালের ১লা জুন শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হইবে বলিয়া স্থির হয় (১৯ পৃষ্ঠা)।

রাজপুতনার পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত যশল্মীর, যোধপুর ও বিকানীর রাজ্যও পশ্চিম পাকিস্থানের সীমান্তে অবস্থিত। এই তিনটি রাজ্য অদ্যাপি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু ভারত সরকার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ বলিয়া পরিগণিত হইবার পক্ষে যে ন্যূনতম মান নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তদনুযায়ী যশল্মীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। মরুপ্রধান এই রাজপুত রাজ্যটির আয়তন ১৫,৮০০ বর্গ মাইল হইলেও লোকসংখ্যা মাত্র ৯৩ হাজার। গত ২৫শে জানুয়ারী (১৯৪৮) বাহওয়ালপুর রাজ্য হইতে আগত একদল পাকিস্তানী হানাদার অকস্মাৎ রাজ্যটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে এবং বহু গ্রাম ধ্বংস করিয়া দেয়। ভারতীয় ফৌজ প্রেরণ করিয়া ইহাদের বিতাড়িত করিতে হয়। অতঃপর রাষ্ট্রীয় নির্ব্বিঘ্নতার প্রয়োজনে ভারত সরকার

যশল্মীরের শাসন পরিচালনার জন্ত একজন অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন।

এই কেন্দ্রায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা অবশ্য সাময়িক। যশল্মীর রাজ্য ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্রে (হোয়াইট পেপার) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার অনুপযোগী রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু যোধপুর ও বিকানীর যতদিন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিবে ততদিন যশল্মীরের শাসনতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য লোপ করার ভৌগোলিক বাধা আছে। এই রাজ্য দুইটি যদি রাজস্থানে যোগ দেয় কিম্বা ইহাদের লইয়া যদি মারবাড় ইউনিয়নের মত কোন ইউনিয়ন গঠিত হয় তবে যশল্মীর অনায়াসেই রাজস্থানের কিম্বা বিকল্প ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু কচ্ছ রাজ্যকে কেন্দ্রায়ত্ত অঞ্চলে পরিণত করিবার পক্ষে রাষ্ট্রীয় নির্বিঘ্নতার যুক্তি যখন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তখন এই বিস্তৃত জনবিরল এবং মরুপ্রধান রাজ্যটিকে কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুকূল পরিবর্তন না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বাধীনে রাখাই সমীচীন।

স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ :

অন্তর্নিবেশ পরিকল্পনা কিম্বা স্বাতন্ত্র্যলোপের রাজনৈতিক পুনর্ব্বিন্যাস ব্যবস্থাপনা দ্বারা রূপান্তরিত হয় নাই এরূপ কতগুলি দেশীয় রাজ্য অদ্যাপিও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বহাল রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে এক-মাত্র হায়দরাবাদ ব্যতীত আর সব কয়টি রাজ্যই ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহাদের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক অদ্যাপি ডোমিনিয়নে যোগদানের সর্ত্তপত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই রাজ্যের সব কয়টিই যে জনসংখ্যা ও রাজস্বের দিক হইতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হইবার যোগ্য তাহা নহে। দেশীয় রাজ্য দপ্তর স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে গণ্য করার পক্ষে দশ লক্ষ অধিবাসীর যে ন্যূনতম মান

নির্দ্ধারণ করিয়াছেন (অর্থাৎ গণ-পরিষদে অন্ততঃ একজন সদস্য প্রেরণের অধিকার)—তদনুযায়ীও আজিকার কয়েকটি রাজ্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না। দেশীয়রাজ্য দপ্তর জুলাই মাসে যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন উহাতে সান্দুর (মাদ্রাজ); তেহরি গাড়োয়াল, রামপুর ও বারাণসী (যুক্তপ্রদেশ); কুচবিহার, ত্রিপুরা, মণিপুর ও খাসিয়া রাজ্যসমূহের নামোল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করার উপযোগী রাজ্য বলিয়া মনে করেন না। এই সমস্ত রাজ্যকে সংহত বা অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইবে। সান্দুর অবশ্য ইতিমধ্যেই মাদ্রাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, বাকী রাজ্য কয়টির আয়তন, লোকসংখ্যা এবং রাজস্বের উল্লেখ করিলে ভারত সরকারের অভিমতের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	বাৎসরিক রাজস্ব (লক্ষ টাকা)	জনসংখ্যা
(১) তেহরি গাড়োয়াল	৪৫১৬	২২'৮	৩৯৭,৩৬৯
(২) বারাণসী	৮৬৬	১৯	৪১৫,৪২৮
(৩) রামপুর	৮৯৬	৫১	৪৭৭,০৪২
(৪) কুচবিহার	১৩১৮	৬৮	৬৪০,৮৪২
(৫) ত্রিপুরা	৪১১৬	৫৪	৫১৩,০১০
(৬) মণিপুর	৮৬২৫	২৯	৫১২,০৬৯
(৭) খাসিয়া পাহাড়িয়া রাজ্য (১৫টি)—	৩৭৮৮	—	২১৩,৫৮৬

(ভাওয়াল, চেরা, খাইরিম্, লাঙ্গরিন, মহরম, মালইশোমাৎ, মঙ্গৈয়াঙ্গ, মাসিনরাম, মরিয়, মইলিয়েম, নবশোপো, নঙ্গথ্‌ল, নঙ্গস্‌পুং নঙ্গস্‌তোইন ও রামব্রাই) } (প্রতিটি রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা অজ্ঞাত)

ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বভারতে অবস্থিত রাজ্য কয়টি ছাড়া কাহারও অন্তর্নিবেশের প্রশ্ন তেমন জটিল নয়। রামপুর ও বারাণসী এই দুইটি রাজ্যই যুক্তপ্রদেশ পরিবেষ্টিত। অধিবাসীরাও সব দিক হইতেই যুক্তপ্রদেশের অধিবাসীদের সমগোত্রীয়। সুতরাং ইহাদের অবশ্যই যুক্তপ্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে হইবে। তেহরি গাড়োয়াল ভৌগোলিক সংস্থানের দিক হইতে হিমাচল প্রদেশ কিম্বা যুক্তপ্রদেশ ইহার যে কোনটির সহিত যুক্ত হইতে পারে। তবে রাজ্যটির সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনের ফলাফল দেখিয়া মনে হয় যে, ইহার যুক্তপ্রদেশ-ভুক্তির সম্ভাবনাই সমধিক।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সীমান্তে অবস্থিত রাজ্য কয়টির অন্তর্নিবেশের প্রশ্ন অঞ্চলটির ষ্ট্রাটেজিক গুরুত্ব, অধিবাসীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সৌকর্য্যের দিক হইতে সহজ সমাধানযোগ্য নহে। আপাততঃ আসাম গবর্ণরের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহাদের যোগাযোগ রক্ষিত হইতেছে। তথাপি ইহাদের অন্তর্নিবেশের প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধানের পূর্ব্বে কুচবিহারের উপর পশ্চিমবঙ্গের দাবী; ত্রিপুরা, মণিপুর ও খাসিয়া পাহাড়িয়া রাজ্য লইয়া পূর্ব্বাচল প্রদেশ নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠনের দাবী বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

এ ছাড়া বাকী যে কয়েকটি রাজ্য এখনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান আছে দেশীয় রাজ্যদপ্তর তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ (ভাইয়েবল্ ইউনিট) বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন।

নিম্নে ইহাদের নাম, আয়তন, জনসংখ্যা ও বাৎসরিক রাজস্বের একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া হইল[১] :—

নাম		আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা (১৯৪১ সালের আদমশুমারীর হিসাব)	বাৎসরিক রাজস্ব(২) (লক্ষ টাকা)
(১)	কাশ্মীর	৮৪৪৭১	৪,০২১,৬১৬	৩৮৬'৬৫
(২)	বিকানীর	২৩১৮১	১,২৯২,৯৩৮	১৪৪
(৩)	যোধপুর	৩৬১২০	২,৫৫৫,৯০৪	১৮৫'৪৮
(৪)	জয়পুর	১৫৬১০	৩,০৪০,৮৭৬	১৫৪
(৫)	বরোদা	৮২৩৫	২,৮৫৫,০১০	২২১'৫৪
(৬)	কোলাপুর	৩২১৯	১,০৯২,০৪৬	১০৪
(৭)	মহীশুর	২৯৪৫৮	৭,৩২৯,১৪০	৮০৭'৪২
(৮)	ত্রিবাঙ্কুর	৭৬৬২	৬,০৭০,০১৮	৬২৩
(৯)	কোচিন	১৪৯৩	১,৪২২,৮৭৫	২৯৪
(১০)	হায়দরাবাদ	৮২৩১৩	১৬,৩৮৮,৫৩৪	১৫৮২'৪৩
(১১)	ভুপাল	৬৯২১	৭৮৫,৩২২	১০০'০০
(১২)	ময়ূরভঞ্জ(৩)	৪০৩১	৯৯০,৯৭৭	৪৯

এই রাজ্য কয়টির মধ্যে একমাত্র হায়দরাবাদ ব্যতীত সর্ব্বত্রই জনপ্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশের পরিবর্ত্তিত

(১) হোয়াইট পেপার অন্ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্স্ ১০১ পৃঃ।

(২) ষ্টেট্স্‌ম্যান ইয়ার বুক (১৯৪৬) হইতে সঙ্কলিত।

(৩) ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রাজনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া এই সব রাজ্যের শাসকবর্গ কোথাও বা গণ-সংগ্রামের পরে, আবার কোথাও বা তাহার পূর্ব্বেই অন্তর্বর্ত্তীকালের শাসন-পরিচালনার জন্য জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের আওতায় রাজ্যের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠনের ঘোষণা করিয়াছেন। মহীশুর ও ত্রিবাঙ্কুরের জনগণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এই অধিকার অর্জ্জন করে। ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্যদপ্তরও এ বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের জনগণকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। বরোদা, বিকানীর, যোধপুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ ও হস্তক্ষেপের ফলে জনগণ ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশুরের ন্যায় সংঘর্ষে ব্রতী না হইয়াই ইষ্টলাভ করিয়াছে। কাশ্মীরে আজ যে আবদুল্লা গবর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মূলেও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট।

দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি প্রথমাবধিই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন রহিয়াছে। গান্ধীজী দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বরাবর যে নরমপন্থী মতবাদ পোষণ করিতেন দেশীয় রাজ্য দপ্তরের নীতিতেও মোটামুটিভাবে সেই মতবাদ অনুসৃত হইয়াছে। স্মরণ রাখা দরকার যে, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে সর্দ্দার প্যাটেল ও গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোনরূপ মৌলিক পার্থক্য ছিল না। জওহরলালজী অবশ্য দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বরাবরই স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন। ভারতীয় গণ-পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় আদর্শ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পণ্ডিত নেহরু যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেও তিনি সুস্পষ্টভাবে রাজতন্ত্রের বিরোধী অভিমত প্রকাশ করেন। তবে রাজতন্ত্রের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে এই ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করিয়াও পরমতসহিষ্ণু জওহরলাল বলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি রাজতন্ত্র পছন্দ না করিলেও, কোন রাজ্যের জনগণ যদি রাজার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া গণ-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

করিতে চাহে তবে তিনি সেই জনমতের বিরোধিতা করিবেন না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে নেহরু গবর্ণমেণ্টের নীতির মধ্যে জওহরলালের মতামতের চাইতে সর্দ্দারজীর গান্ধী-পন্থী নীতিই অধিকতর প্রতিফলিত। গণপরিষদ ভারতীয় ইউনিয়নকে সামগ্রিকভাবে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিলেও ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট রাজন্যসমাজের অবলুপ্তি চাহেন নাই। পক্ষান্তরে "জনগণের মঙ্গলের সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে" এইরূপ পুরুষানুক্রমিক ব্যক্তিগত অধিকার ও বিশেষ সুবিধাসহ নিয়মানুগ রাজ্য হিসাবে রাজন্যসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তাঁহারা দেশীয় রাজ্যসমূহকে গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, স্বাধীন ভারতের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে "শান্তি ও সদিচ্ছার আবহাওয়ার মধ্যে দেশীয় রাজ্যে সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে" ভারত সরকারের প্রচেষ্টা একমাত্র হায়দরাবাদ ব্যতীত সর্ব্বত্রই প্রাথমিক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। প্রাদেশিক ভারতের জনগণ যে অধিকার ভোগ করে, গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ক্ষমতাসহ দেশীয় রাজ্যের জনগণও আজ সমষ্টিগতভাবে তদনুরূপ অধিকারই ভোগ করিতেছে। এ সম্পর্কে সামন্ত-ভারত ও প্রাদেশিক ভারতের মধ্যে ইতিপূর্ব্বে যে মৌলিক বৈষম্য ছিল তাঁহা বিদূরণের উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই সর্দ্দার প্যাটেল দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাসে ব্রতী হন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি মোটামুটিভাবে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। রাজ্য শাসনের অধিকার এক্ষণে সমষ্টিগতভাবে জনসাধারণের করায়ত্ত। দেশীয় রাজ্যের সামন্ত শাসনের যুগ আজ সুনিশ্চিতভাবে অতিক্রান্ত।

এখন প্রশ্ন এই যে, জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ এবং আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের দিক হইতে এই সব রাজ্যের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক

অস্তিত্ব যথাযথভাবে অক্ষুণ্ন রাখা উচিত হইবে কি না। "বৃহত্তর রাজ্য" সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া গত ১৫ই মার্চ্চ (১৯৪৮) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "দেশীয় রাজ্যের মধ্যে যাহাদের গণপরিষদ এককভাবে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার আছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ বলিয়া গণ্য করিবেন এ আশ্বাস বহুপ্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। ইহাদের অন্তর্নিবিষ্ট কিম্বা সংহত হইতে বাধ্য করিবার কোন অভিপ্রায়ই আমাদের কোন দিক হইতে নাই। ইহারা যদি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনশীল রাষ্ট্রাংশ হিসাবে থাকিতে চাহে আমরা আপত্তি করিব না। তবে ইহাদের কোন রাজ্যের শাসক ও জনগণ যদি স্বয়ংপ্রণোদিত হইয়া সন্নিহিত প্রদেশভুক্ত হইতে চাহে কিম্বা প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত সংহত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বভাবতঃই ঐ প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও রেওয়ার মত রাজ্য লইয়া গঠিত মালব ও বুন্দেলখণ্ড রাষ্ট্রাংশের কথা বিচার করিতে হইবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণ অবিরত চাপ দিতে থাকিবে। আমি আশাকরি, এই সব রাজ্যের শাসনকর্ত্তাগণ সময়োচিত সুবিধা সুযোগ দিয়া প্রজাদের প্রীতি ও সদিচ্ছা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন—গণদাবী প্রতিরোধের ব্যর্থ প্রয়াস পাইবেন না। প্রস্তাবিত মালব রাষ্ট্রাংশে গোয়ালিয়র এবং ইন্দোরের অন্তর্ভুক্তি, সদ্য গঠিত মাৎস্য রাষ্ট্রাংশে আলোয়াড়ের অন্তর্ভুক্ত এবং বুন্দেলখণ্ড ও বাঘলখণ্ড রাষ্ট্রাংশে রেওয়ার অন্তর্ভুক্তির ফলে এই সব (বৃহত্তর) রাজ্যের শাসকদের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে, আমি আশাকরি, আমাদের নীতির এই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তাহা বিদূরীত করিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা

দ্বারা প্রধান প্রধান রাজ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না ইহা তাহারা উপলব্ধি করিবেন এবং খসড়া শাসনতন্ত্রে এই সব রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি (স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে উল্লেখ) আমাদের অভিপ্রায়ের আরও একটি প্রমাণ। ইহাদের সম্পর্কে আমাদের নীতি এই যে, শাসক ও শাসিত একযোগে যদি ভিন্নরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন না করে তবে আমরা তাহাদের স্বায়ত্তশাসনশীল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইব এবং একথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি।" (দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের ঘোষণাপত্র (জুলাই, ১৯৪৮)—২৬-২৭ পৃঃ)

ভারত সরকারের ঘোষণা হইতে একটি জিনিষ সুস্পষ্ট হয় যে, গণপরিষদে এককভাবে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী অর্থাৎ ন্যূনপক্ষে দশ লক্ষ অধিবাসী সম্পন্ন রাজ্যকে প্রদেশভুক্ত হইবার কিম্বা প্রতিবেশী রাজ্যের সহিত যুক্ত হইবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে কোনও চাপ দেওয়া হইবে না—এই সব রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কোন রাজ্যের "শাসক ও শাসিত একযোগে স্বয়ংপ্রণোদিত হইয়া" যদি সন্নিহিত প্রদেশভুক্তির কিম্বা ইউনিয়ন গঠনের দাবী জ্ঞাপন করে তবে সেই দাবী অবশ্যই বিবেচনা করা হইবে। ইহার অর্থ, ভারত গবণমেণ্ট চাহেন যে স্বায়ত্তশাসনশীল স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে অনুমোদিত রাজ্যের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের দাবী মুখ্যতঃ ঐ রাজ্য হইতেই আসুক। কিন্তু "শাসক ও শাসিতের যুক্ত এবং স্বয়ংপ্রণোদিত" অভিপ্রায়ের উপর জোর দেওয়াও মনে হয়, ভারত গবর্ণমেণ্ট "প্রধান প্রধান রাজ্যসমূহকে" স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান রাখিতেই সমুৎসুক এবং সেই কারণেই ভাবী শাসনতন্ত্রে ইহাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া হইতেছে।

শাসক ও শাসিতের যুক্ত সম্মতির উপর জোর দেওয়ায় ইহাদের রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস সুনিশ্চিতভাবে কষ্টসাধ্য হইবে। স্বতন্ত্র

অস্তিত্ববান রাজ্যের প্রায় সব কয়টিতেই লোকায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের এবং শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদকে "মহারাজার অধীনে" শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্দ্দেশ হইয়াছে। উহার অর্থ, এই সব রাজ্যের শাসকগণ নিয়মতান্ত্রিক রাজা হিসাবে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিতে চাহেন। এই অবস্থায়, প্রদেশভুক্ত কিম্বা রাজ্যমণ্ডলীর অন্তর্নিবিষ্ট রাজ্যশাসকদের ন্যায় বৃত্তির বিনিময়ে ইহাদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত করিতে সম্মত করা অসম্ভব না হইলেও অবশ্যই কষ্টসাধ্য হইবে। অথচ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে গণ্য হইবার পক্ষে ভারত সরকার লোকসংখ্যার যে মান অনুসরণ করিতেছেন তদনুযায়ী না হইলেও এই সব রাজ্যের রাজস্ব এবং অধিবাসীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ অনুসারে ইহাদের প্রায় সব কয়টি রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস করা বাঞ্ছনীয়।

দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে ন্যূনপক্ষে দশলক্ষ অধিবাসীর নিরিখ দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের ১৯৩৯ সালের লুধিয়ানা অধিবেশনে অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু গোয়ালিয়র অধিবেশনে বৃটিশের নিকট হইতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলন পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাহাতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে গণ্য হইবার পক্ষে জনসংখ্যা এবং বাৎসরিক রাজস্বের মান বর্দ্ধিত করিয়া দাবী করা হয় যে, অন্যূন পঞ্চাশ লক্ষ অধিবাসী এবং বাৎরিক তিন কোটি টাকা রাজস্ব সম্পন্ন রাজ্যসমূহকেই কেবলমাত্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে অনুমোদন করা চলিবে। এই মান অনুসারে হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশুর এবং কাশ্মীর ছাড়া অন্য কোন রাজ্যই এককভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবী করিতে পারে না। বিকানীর. যোধপুর, জয়পুর. বরোদা, কোলাপুর, কোচিন. ভূপাল এবং ময়ূরভঞ্জ

রাজ্যকে ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সংলগ্ন প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট কিম্বা প্রতিবেশী রাজ্য বা রাজ্যমণ্ডলীর সহিত সংহত হইত হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে, আধুনিক মানদণ্ড অনুসারে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া জনগণের কল্যাণ ও সমুন্নতিকর কার্য্য করার পক্ষে একটি রাষ্ট্রাংশের অন্যূন তিন কোটি টাকা বাৎসরিক আয় থাকা আবশ্যক এবং অধিবাসীদের সংখ্যা অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ না হইলে কোন অঞ্চলকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশের মর্য্যাদা দেওয়া উচিত নহে—এই দৃঢ় অভিমত অনুসারেই দেশীয় রাজ্যের প্রজাসম্মেলন গোয়ালিয়র অধিবেশনে উপরিউক্ত মান নির্দ্ধারণ করেন।

গোয়ালিয়র প্রস্তাবে জনসংখ্যা এবং রাজস্বের চাইতেও অধিবাসীদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেশীয় রাজ্যদপ্তরও পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনায় এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত হোয়াইট পেপারের ৯৯ অনুচ্ছেদ বলা হইয়াছে যে—"অন্তর্নিবেশ কিম্বা সংহতি সাধনের পরিকল্পনা দ্বারা রূপান্তরিত হয় নাই এইরূপ কয়েকটি ছোট রাজ্য এখনও আছে। ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং শাসন সৌকর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাদের সংহতি সাধনের ব্যবস্থা করাই ভারত সরকারের অভিপ্রায়।" কোন দেশীয় রাজ্যের সীমান্তই এই ভিত্তির উপর গড়িয়া ওঠে নাই। সীমান্তরেখা সমূহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃত্রিম,—বিদেশী শাসকের খেয়াল মাফিক কলমের খোঁচায় অঙ্কিত। রাজ্যের সহিত অধিবাসীদের সম্পর্কের চাইতে প্রাদেশিকাংশের অধিবাসীদের সহিত তাহাদের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ এবং নিবিড়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া অপর কোন রাজ্যের পক্ষেই এককভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয় না। স্বতন্ত্র অস্তিত্ববান রাজ্যসমূহের অধিকাংশই পশ্চিম এবং

দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত। জনসাধারণের দাবী অনুসারে এই অঞ্চলে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন বিবেচনা করা হইতেছে। নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পুর্ব্বেই দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ভাষার ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরল, তামিল নাদ এবং অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হইতে পারে। বরোদা, কোলাপুর, হায়দরাবাদ, মহীশুর, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের অধিবাসীরাও ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক হইতে প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশসমূহের অধিবাসীদের সমগোত্রীয়। অতএব প্রাদেশিক ভারতে ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর যখন নূতন রাষ্ট্রাংশ গঠিত হইবে তখন সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যের জনগণের অভিপ্রায় নিরাকরণ করিয়া তাহাদেরও নবগঠিত রাষ্ট্রাংশের অন্তর্ভুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহাতে হায়দরাবাদ ও মহীশুর যদি খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়; কিংবা বরোদা, কোচিন, কোলাপুর এবং ত্রিবঙ্কুরের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব যদি লোপ পায় তাহাতে আপত্তি করার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর ও ভূপাল সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। দশটি রাজপুত রাজ্য মিলিয়া যখন রাজস্থান গঠন করিয়াছে, তখন জয়পুর, যোধপুর ও বিকানীরের পক্ষে আলাদা থাকার বিশেষ কোন সঙ্গত থাকিতে পারে না। গোয়ালিয়র এবং ইন্দোরের মত রাজ্য যদি অন্যান্যের সহিত ইউনিয়ন গঠন করিতে পারে তবে ভূপালের পক্ষে আলাদা থাকা অর্থহীন।

প্রধান প্রধান রাজ্য সম্পর্কে ভারতের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নীতিও এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল এবং তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে অনুসৃত নীতির সহিত সঙ্গতি পূর্ণ হইত। এই সব রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র্যংশ হিসাবে অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে

তাহাদের উচিত ছিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভবিষ্যৎ কাঠামা সম্পর্কে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনগণের মতামত পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা। কিন্তু ভারত সরকারের কর্ম্মনীতিতে এই পন্থা অনুসৃত হয় নাই। ভারতের নয়া শাসনতন্ত্রে জনগণের সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হইলেও প্রধান প্রধান রাজ্য সম্পর্কে শাসক ও জনসাধারণের যুক্ত সম্মতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া এবং জনগণের অভিমত পরিজ্ঞাত না হইয়া বর্ত্তমান আকারে এই রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুমোদনের প্রতিশ্রুতি দিয়া এই নীতির অপহ্নব করা হইয়াছে।

পুনর্ব্বিন্যাসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য

দেশীয় রাজ্যের চতুর্ব্বিধ পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কে ভারত সরকার অবিচলিতভাবে শাসনতান্ত্রিক রীতিসঙ্গত আপোষ পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহারই অনিবার্য্য পরিণতি। জাতীয় নেতৃবর্গ এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসকশক্তির মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তিক্রমে বিভক্ত ভারত শাসনতান্ত্রিক পথে যেমন রাজনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিয়াছে, দেশীয় রাজ্যের পুনর্ব্বিন্যাস সম্পর্কেও তেমনি শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। সাধারণ মানুষের নামে অথচ তাহাদের বিনা অনুমোদনে বৃটিশের সহিত যেমন চুক্তি করা হইয়াছে, সামন্ত ভারত সম্পর্কিত চুক্তিও ঠিক সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই চুক্তির কোন অবস্থাতেই সাধারণ মানুষের মতামতের জন্য অপেক্ষা করা হয় নাই। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে গৃহীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ফলে ভারতভূমিতে যে রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া জাতীয় সরকার সামন্ত ভারতের পুনর্ব্বিন্যাস করেন। এই পটভূমিকায় শাসনাতন্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করায় জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে স্বভাবতঃই সামন্ত শাসকদের সহিত আলাপ আলোচনা এবং আপোষ

নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছে। ফলে রাষ্ট্রীয় সংহতি সাধনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত চুক্তিনামায় সামন্ত শাসকগোষ্ঠীর হস্তে প্রভূত ক্ষমতা রহিয়া গিয়াছে। সামন্ত সমাজ আত্মসমর্পণ করে নাই; কিম্বা তাহারা অবলুপ্তও হয় নাই। নূতন রাজনৈতিক পরিবেশ তাহাদের বেশান্তর ঘটাইয়াছে মাত্র। বৃটিশ যুগের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া সযত্নে পরিকল্পিত চুক্তিনামার মারফতে আজ তাহারা সর্ব্ব ভারতীয় রাজনীতির সহিত নিজেদের গ্রথিত করিয়াছেন। গণতন্ত্রের নয়ন-বিভ্রান্তিকর শুভ্র উত্তরীয় আজ তাহাদের সামন্ত রাজবেশ আচ্ছাদিত। নবরূপায়িত সামন্ত সমাজ আজ নব্য ভারতের পুঁজিপতি ও কায়েমী স্বার্থবানদের সহিত নব-রাখীবন্ধনে আবদ্ধ। তাই দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্বের খানিকটা রূপান্তর ঘটিলেও সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার গায়ে আঁচড় লাগে নাই। জাতীয় সরকারের চতুর্ব্বিধ পুনর্ব্বিন্যাস পরিকল্পনা মৃত-যুগের এই সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্ব্বিন্যাস করিবার আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। বরং আগষ্টোত্তর গণবিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গে যে জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থা নিঃশেষে অবলুপ্ত হইয়া যাইত "রক্তপাতহীন নিঃশব্দ বিপ্লব" তাহার আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করিয়াছে। খেসারত দিয়া কায়মী স্বার্থ লোপ করার বিধান সামন্ত ভারতের কায়েমী স্বার্থের অবলুপ্তি একরূপ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সামন্ত সমাজকে "স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতের সহস্রষ্টা" বলিয়া অভিহিত করা হয়। রাজন্যসমাজ যে সহস্রষ্টা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু এই সহস্রষ্টাদের সহযোগে যে নব ভারত সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা আর যাহাই হউক "গণতান্ত্রিক" নহে। রাজন্যসমাজ এবং সাধারণ মানুষ কোন কালে কোন অবস্থাতেই এক পরিবারভুক্ত হইতে পারে না। নব্য ভারতের স্রষ্টারা ইহাদের একই রাজনৈতিক পরিবারভুক্ত করিয়া যে "গণতান্ত্রিক ভারত" গঠন করিলেন

তাঁহার কৃত্রিমতা অচিরেই পরিস্ফুট হইবে—ভারতের পুঁজিপতি, ভূম্যাধিকারী এবং রাজন্যসমাজের সুপরিকল্পিত নূতন আঁতাতের স্বরূপ অদূর ভবিষ্যতেই আত্মপ্রকাশ করিবে।

তথাপি সামন্ত ভারতের নব-রূপায়ণ ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগারম্ভ সূচিত করিতেছে। এই পরিকল্পনার সাফল্যে পাকিস্তান ব্যতীত অবশিষ্ট ভারত আজ একই শাসনতান্ত্রিক সূত্রে গ্রথিত। রাজনৈতিক একং অর্থনৈতিক জীবনে সামন্ত ভারতের স্বাতন্ত্র্যের প্রচীর চূর্ণ করিয়া জাতীয় সরকারের পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা ঐক্যবদ্ধ ভারত রাষ্ট্রকে এক পূর্ণাভিব্যক্ত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে এবং তাহার ফলে সামন্ত ভারত এবং তথাকথিত বৃটিশ ভারতের জনগণের সহযোগিতার নূতন বুনিয়াদ রচিত হইয়াছে।

বৃটিশ শক্তির ভারত জয় তৎকালে এক সমাজ-বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে উৎপাটিত করিয়া, সামন্ত স্বাতন্ত্র্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া এই বিজয় ভারতবর্ষকে এক নূতন রাজনৈতিক ঐক্যদান করে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পরে সাম্রাজ্যবাদী বণিক স্বার্থের অনুকূলে বৃটিশ শক্তি এই প্রগতিশীল ভূমিকা পরিহার করেন এবং জনসাধারণকে নিঃশেষে শোষণ করার জন্য ভারতের সামন্ত সমাজ এবং দেশীয় কায়েমী স্বার্থবানদের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হন। সামন্ততন্ত্রের সহিত সাম্রাজ্যবাদের এই প্রণয়-বন্ধন ঐতিহাসিক বিচারে অভিনব হইলেও রাজনৈতিক ভারতকে পঙ্গু করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী এই পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। তথাপি উত্তর কালে আমরা দেখিয়াছি যে, সাম্রাজ্যবাদীর এই কূটকৌশল সফলকাম হয় নাই। কেননা যে বীজ হইতে জাতীয়তাবাদী ভারত জন্মলাভ করে বাস্তব বিচারে তাহারাই তাহার অনুকূলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

জাতীয় সরকারের পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা বৃটিশ যুগের এই অসমাপ্ত বিপ্লবকে আরও বহুদূর আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। গোটা ভারতকে পূর্ণাভিব্যক্ত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে সংবদ্ধ করিয়া তাহারা সামন্ততান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যকে চিরতরে অতীত ইতিহাসের গর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তবুওসামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদের উপর মারাত্মক আঘাত হানা হয় নাই; বরং বৃটিশ যুগের অভিনব অসঙ্গতিকে শোধিত আকারে তাহারা বাঁচাইয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর কূট কৌশল যেমন জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রসার ও পরিপুষ্ট রোধ করিতে পারে নাই, আজিকার বিঘ্ন কণ্টকিত সুবিন্যস্ত নয়া ব্যবস্থাও গণমুক্তির ভাবী বিপ্লব রোধ করিতে পারিবে না। কেন না যে সামাজিক পটভূমিকায় সমাজতান্ত্রিক ভারত জন্মলাভ করিবে, জ্ঞাতসারে হউক কিম্বা অজ্ঞাতসার হউক, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা তাহার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে।

নবম অধ্যায়

জুনাগড়

আপোষ আলোচনার শান্তি-পূর্ণ পথে যে তিনটি দেশীয় রাজ্যের সমস্যা মীমাংসিত হয় নাই জুনাগড় তাহাদের অন্যতম। কাথিয়াবাড় সমুদ্রোপকূলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম নবাব শাসিত জুনাগড়ের আয়তন মাত্র ৩,৩৩৭ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৬৭০,৭১৯ (১৯৪১ সালের আদমশুমারী)। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৯'১ জন মুসলমান, আর শতকরা ৭৯'৬ জন হিন্দু এবং ১'৬ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের। জুনাগড়ের সামন্ত শাসক গোষ্ঠী মুসলমান এবং পাকিস্তানের অনুরাগী হইলেও ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে রাজ্যটির পক্ষে পাকিস্তানে যোগদান করার দুরতিক্রম্য বাধা ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত তাহার ভৌগোলিক সংলগ্নতা ছিল না। সমুদ্রপথে সিন্ধু-উপকূল হইতে জুনাগড়ের দূরত্ব কমপক্ষে তিনশত মাইল। পক্ষান্তরে সাংস্কৃতিক এবং অর্থ নৈতিক দিক হইতে জুনাগড় কাথিয়াবাড়ের সহিত অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধিবাসীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও জুনাগড়ের ডাক, তার ও টেলিফোন ব্যবস্থা ছিল ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তা'ছাড়া ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে এরূপ কয়েকটি কাথিয়াবাড় রাজ্যের সঙ্গে জুনাগড়ের নবাব-শাসিত রাজ্য ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো ছিল। এই অবস্থায়, জুনাগড়ের পক্ষে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করাই স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ নবাব সাহেব ইতিপূর্বে কাথিয়াবাড়ের সংহতি সম্পর্কে যে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কেহই অনুমান করিতে পারে নাই যে ভৌগোলিক অবস্থান বিস্মৃত হইয়া জুনাগড়ের শাসকগোষ্ঠী অকস্মাৎ

পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিবে। পাকিস্তান অনুরাগী সামন্ত শাসক আরও কয়েকজন ছিলেন কিন্তু তাহাদের কেহই ভৌগোলিক অসম্ভাব্যতার দরুণ পাকিস্তানে যোগদানের চেষ্টা করেন নাই। যে ভাবে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বিলোপ করা হইয়াছে তদনুযায়ী আইনের সূক্ষ্ম বিচারে সামন্ত শাসকগণ জনগণের অভিমত এবং ভৌগোলিক অবস্থান উপেক্ষা করিয়া যে কোনও ডোমিনিয়নে যোগদান করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। মিঃ জিন্নাও এই অভিমত সমর্থন করিতেন। কিন্তু সামন্ত শাসকগণ নিজেদের খেয়াল খুশী অনুযায়ী এই অধিকার প্রয়োগ করিবেন ইহা বৃটিশেরও অভিপ্রেত ছিল না। রাজপ্রতিনিধি লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নরেন্দ্র মণ্ডলের অধিবেশনে (২৫শে জুলাই, ১৯৪৭) যে বক্তৃতা দেন তাহাতেও তিনি নরেন্দ্র সমাজকে ভৌগোলিক অবস্থানের কথা চিন্তা করিয়া এই অধিকার প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন। ভারত সরকারও এই ভিত্তির উপরেই দেশীয় রাজ্যের ডোমিনিয়নে যোগদান সংক্রান্ত নীতি নির্দ্ধারণ করেন। যে সমস্ত রাজ্য পাকিস্তান এলাকার অন্তর্ভুক্ত, ভারত সরকার কখনও তাহাদের ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত করার চেষ্টা করেন নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রত্যাশা করিয়াছেন যে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টও অনুরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন।

জুনাগড়ের একজন প্রতিনিধিও এই নরেন্দ্র সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তথাপি জুনাগড় ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য কোন আলোচনা করে নাই। পক্ষান্তরে অকস্মাৎ একদিন দেখা গেল যে জুনাগড় পাকিস্তানে যোগদান করিয়াছে এবং করাচী কর্ত্তৃপক্ষ তাহার যোগদানের আবেদন পত্র মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, দুর্ব্বলচিত্ত নবাব সাহেব পারিষদবর্গের চক্রান্তে পড়িয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আবদুল কাদের এবং নবাব

সাহেবের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা তাহাকে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কাদের সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টো নামে জনৈক সিন্ধি মুসলমানকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। এই সিন্ধী-চক্রের কু-পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ মেনন যখন এ সম্পর্কে নবাব সাহেবের সহিত দেখা করিতে চাহিলেন তাহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইল না। স্যার শাহ নওয়াজ বলিলেন যে, পাকিস্তান, জুনাগড় এবং ভারতের এক প্রতিনিধি সম্মেলনে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে —নবাবের সহিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। স্পষ্টই বুঝা গেল পকিস্তানের প্রভাবে জুনাগড়ের শাসকগোষ্ঠী গোলমাল সৃষ্টি করিতে বদ্ধপরিকর।

যাহাই হউক, জুনাগড়-পাকিস্তান আঁতাতের পশ্চাতে যে ভারতীয় ইউনিয়নের সংহতি নাশের এক সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল জামসাহেবের বক্তৃতায় তাহার আভাষ পাইয়া ভারতবাসী সচকিত হইল। জাম সাহেব তাহার দিল্লী বক্তৃতায় (২২-৯-৪৭) সুস্পষ্ট অভিযোগ করিলেন যে, "ভারতের ঐক্য, সংহতি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করার জন্যই জিন্না এবং তাহার উপদেষ্টাগণ ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে পাকিস্তানী ঘাঁটি বানাইতেছেন।" "উত্তরে সিন্ধু হইতে যে অভিযান আরম্ভ হইবে জুনাগড় হইবে তাহার 'লাফ্ দিবার ঘাঁটি'—আর দক্ষিণী অভিযানের কেন্দ্র হইবে হায়দরাবাদ।" স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নিজাম ইতিপূর্ব্বেই স্বাধীন হইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর প্রশ্ন দাঁড়াইল যে, জনমত সম্পর্কে উদাসীন সামন্ত শাসকদের দুরভিসন্ধি অনুমোদন করিয়া ভারত রাষ্ট্র তাহার বক্ষে

"পাকিস্থানী পকেট" সৃষ্টি হইতে দিতে পারে কিনা। জুনাগড়ে একবার যদি নজীর সৃষ্টি হয় তবে আর কেহ না হইলেও হায়দরাবাদের শাসকগোষ্ঠী যে পাকিস্তানের সহিত সংযুক্ত হইবার চেষ্টা করিত ইহা একরূপ নিশ্চিত ছিল। নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে উদাসীন না হইলে কোন রাষ্ট্রই নিজের এলাকার মধ্যে ভিন্ন রাষ্ট্রের "পকেট" সৃষ্টি হইতে দিতে পারে না। সুতরাং ঘটনাপ্রবাহ অতিক্রুত অন্য খাতে বহিতে আরম্ভ করিল এবং কায়েদে আজম যে রাজনৈতিক চালে ভুল করিয়াছেন তাহা প্রতিপন্ন হইতে বিলম্ব হইল না। এই রাজনৈতিক দ্যূতক্রীড়ায় তাহার একমাত্র ভরসা ছিল ধোঁকাবাজী ও হুমকী। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বৃটিশ শাসনের সুদিন চলিয়া গিয়াছিল। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতে তখন জাতীয়তার প্লাবন আসিয়াছে। গান্ধী ও দয়ানন্দ সরস্বতীর জন্মভূমি, সোমনাথ এবং অসংখ্য জৈন মন্দিরের ঐতিহ্য সম্বন্ধে কাথিয়াবাড়ের ঐক্য তিনি হুমকি দিয়া বিনষ্ট করিবেন এরূপ আশা করাও বাতুলতা। ভেরাবল বন্দরটি পাওয়া গেলে অনেক কাজে আসিত একথা ঠিক; কিন্তু তিনি হয়ত বল্লভভাইর কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, ভারতের এই লৌহমানব "স্কন্ধে বিষক্ষত" বজায় রাখিয়া ভারত রাষ্ট্র গঠনের লোক নহেন। বস্তুতঃ সর্দ্দার একাধিক বার নবাবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি যদি পাকিস্তানের প্রভাবমুক্ত হইতে না পারেন তবে তাহার বিপদ আছে। যাহাই হউক, ভারত সরকার জুনাগড়ের প্রশ্ন লইয়া পাকিস্তানের সহিত সশস্ত্র বিরোধ সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন যে, জনগণের অভিমত দ্বারা জুনাগড়ের ভবিষ্যৎ নিরূপিত হউক। ভারত সরকার এই মর্ম্মে পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক পত্রও লেখেন কিন্তু তাহার জবাব পাওয়া গেল না।

এই সময়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এক গ্যারিবলদির আবির্ভাব হয়। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশ্যামলদাস গান্ধী এক মুক্তি ফৌজ গঠন করিয়া জুনাগড় আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করেন। ভারত গবর্ণমেণ্টও তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিলেন না। জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত মংগ্রোল ও বাবরিয়াবাদ রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছিল। জুনাগড়ের ফৌজ রাজ্য দুইটি করায়ত্ত করার চেষ্টা করিলে তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইল। জুনাগড়ে পাকিস্তানী ফৌজের আনাগোনার সংবাদও প্রকাশিত হইতেছিল—সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা দলে দলে জুনাগড় ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। জুনাগড়ের সন্নিহিত গোণ্ডাল ও জেটপুর রাজ্যও সামরিক সাহায্যের আবেদন করিল। এই অবস্থায় ভারত সরকার পোরবন্দরে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করিলেন এবং জাহাজ যোগে সৈন্য প্রেরণের এই সুযোগে ঐ অঞ্চলে স্থল, জল ও বিমান বাহিনীর এক যুক্ত মহড়ার আয়োজন করা হইল। সামরিক শক্তির এই প্রদর্শনী সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপন্ন করিল যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট জুনাগড় সমস্যাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

এদিকে শ্যামলদাসের মুক্তিফৌজও অভিযান আরম্ভ করিল। ৩০শে সেপ্টেম্বর রাজকোটে অবস্থিত "জুনাগড় হাউস" দখল করিয়া মুক্তিসেনা জুনাগড়ের শাসকশক্তির উপর প্রথম আঘাত হানিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে খোদ জুনাগড় রাজ্যে অভিযান আরম্ভ হইয়া গেল।

এই অবস্থায়, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াই জুনাগড়কে নিজের একতেয়ারে রাখিবার চেষ্টা করিতে পারিত। জুনাগড়কে আয়ত্তাধীনে রাখার উহাই ছিল একমাত্রপন্থা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ সমস্যায় বিব্রত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের

ভরসা করিলেন না। ধোঁকাবাজী এবং হুমকী সম্বল করিয়াই যে পাকিস্তান জুনাগড়ের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল তাহা ধরা পড়িল পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের ৭ই অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তিতে। রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বিলুপ্তির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া এই বিজ্ঞপ্তিতে জুনাগড়, মানভাদার ও সর্দ্দারগড়ের পাকিস্তানে যোগদান সমর্থন করা হইলেও কার্য্যকালে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট শান্তিপূর্ণ মীমাংসার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সর্ত্ত জুড়িয়া দিলেন যে, মংগ্রোল ও বাবরিয়াবাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন সম্পর্কে আইনজ্ঞের অভিমত গ্রহণ করা হউক।

কিন্তু "ওকালতী বুদ্ধির" জোরে কিস্তিমাৎ করিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। বিদ্রোহী গণমুক্তি ফৌজের অগ্রগতি কোন কালেই আইনের কূটভাষ্য দ্বারা স্তব্ধ করা যায় নাই। ইহা তখন সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে ভারত গবর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট থাকিলেও মুক্তি ফৌজই জুনাগড় সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করিবে। তাহাদের অগ্রগতির মুখে গ্রামের পর গ্রাম নবাবের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে গ্রামবাসীরা তাহাদের দলে যোগদান করিতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট জুনাগড় কর্ত্তৃপক্ষকে চরমপত্র দিলেন এবং জুনাগড়ের উপ-প্রধানমন্ত্রী মিঃ হার্ভে জোনস্ ২৭শে অক্টোবর শ্রীশ্যামলদাসের সহিত আলোচনার জন্য রাজকোটে আসিলেন। শ্যামলদাস তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে জুনাগড়ের শাসন কর্ত্তৃত্ব বিনা সর্ত্তে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে; যদি এই সর্ত্ত পালন না করা হয়, তবে মুক্তিফৌজ খোদ জুনাগড় আক্রমণ করিবে এবং উহার ফলাফলের কোন দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য থাকিবে না।

শ্যামলদাসের এই চরমপত্রে জুনাগড়ের শাসক গোষ্ঠী এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন। ইহা তখন নিশ্চিত হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহারা যদি চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন তবে সমগ্র জুনাগড় অচিরেই গণমুক্তিফৌজের করতলগত হইবে। নবাব ইতিপূর্ব্বেই পুত্র এবং বেগমসহ করাচী পলাইয়া গিয়াছিলেন। পাকিস্তানের নিকট সাহায্য চাহিয়াও সুবিধা হইল না। মাসাধিককালের বিশৃঙ্খলায় রাজ্যে তখন চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে। জুনাগড়ের শাসন পরিষদ এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হইলেন। নবাব ইতিপূর্ব্বেই দেওয়ানকে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। অতঃপর কয়েকজন জনপ্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া দেওয়ান ভারতীয় ইউনিয়নের হস্তে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করার সিদ্ধান্ত করেন।

মিঃ হার্ভে জোনস্ ৯ই নভেম্বর (১৯৪৭) দেওয়ান বাহাদুরের এক অনুরোধ পত্র লইয়া রাজকোটে ভারত সরকারের আঞ্চলিক কমিশনার মিঃ বাকের নিকট আসিলেন। ভারত সরকারও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যুদ্ধবিরতির পতাকা লইয়া ভারতীয় ফৌজ ১লা নভেম্বর মংগ্রোল ও বাবরিয়াবাদে প্রবেশ করে এবং রাজ্য দুইটিকে ভারত সরকারের শাসনাধীনে আনা হয়। মানভাদার রাজ্যকেও ইতিপূর্ব্বেই আঞ্চলিক কমিশনারের শাসনাধীনে লইয়া আসা হইয়াছিল। মিঃ জোনসের অনুরোধ পরিজ্ঞাত হইয়া মিঃ বাক নয়াদিল্লীর নির্দ্দেশ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং ভারত সরকারের নির্দ্দেশক্রমে ১০ই নভেম্বর ভারতীয় ফৌজ জুনাগড়ে প্রবেশ করিল এবং ভেরাবালবন্দর, রাজ্যের বিমান ঘাঁটি ও জুনাগড় বাহিনীর সদর কার্য্যালয় দখল করিল। ভারতীয় সেনা জুনাগড় বিমান ঘাঁটি দখল করিবার পূর্ব্বে স্যার শাহ নওয়াজ ভুট্টো সহ বহু মুসলিম অফিসার নবাবের পদাঙ্ক অনুস

এবং পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন এক কপর্দ্দকশূন্য কোষাগার এবং রাজ্যময় এক বিশৃঙ্খল অবস্থা।

করাচীর মাটিতে পদার্পণ করিয়াই স্যার শাহ নওয়াজ সুর বদলাইলেন। ১০ই নভেম্বর এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন যে, জুনাগড় কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেয় নাই কিম্বা অস্থায়ী-ভাবে শাসনভার অর্পণের জন্য ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত কোন আলোচনাও হয় নাই। বাহিরের লোকের উপদ্রবের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তদ্বিবেচনায় জুনাগড় কর্ত্তৃপক্ষ "আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার" জন্য ("যতদিন জুনাগড়ের ডোমিনিয়নে যোগদান সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের সম্মানজনক মীমাংসা না হয়") ভারতীয় ইউনিয়নের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে মাত্র। অথচ মজার বিষয় এই যে, ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ যখন সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল তখন তাহাদের অভ্যর্থনা করার জন্য নবাব কিম্বা তাহার প্রধানমন্ত্রী কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

অবিমৃষ্যকারিতার অপমান ঢাকিবার জন্য পাকিস্তানও কৃত্রিম ক্রোধের মন্দ অভিনয় করে নাই। মিঃ লিয়াকৎ আলী খাঁ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে এক তারযোগে জানাইলেন যে, জুনাগড় কর্ত্তৃপক্ষের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার নাই এবং জুনাগড় হইতে ভারতীয় ফৌজ অপসারণ না করা পর্য্যন্ত এই বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মীমাংসা তখন হইয়া গিয়াছে। সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহার রাজকোট বক্তৃতায় (১২-১১-৪৭) বলিয়াছেন যে, 'দেওয়ান সহসা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। তিনি পাকিস্তান কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলেন। নবাব তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং জনসাধারণ তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছিল।

কাজেই ভারতীয় ইউনিয়নের হস্তে শাসনভার অর্পণ করার জন্য তাহার আর কি অধিকার প্রয়োজন ?'

(হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ১৩-১১-৪৭)

জুনাগড় ভারতীয় ইউনিয়নে স্থায়ীভাবে যোগদান করিবে কিনা তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির করার জন্য তখন মাত্র এক পক্ষের অভিমত জানাই বাকী ছিল। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ভারত সরকার সেই জনমত গ্রহণের ব্যবস্থাও করিয়াছেন এবং গণভোটের ফলাফলে দেখা গিয়াছে যে, জনগণের শতকরা নব্বুই জনই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষপাতী।

জনমতের এই রায় জুনাগড় সমস্যার উপর শেষ যবনিকাপাত করিয়াছে। করাচী কর্ত্তৃপক্ষও ইহা মর্শ্মে মর্শ্মে উপলব্ধি করেন। তথাপি কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব স্যার জাফরুল্লা খাঁ জুনাগড়ের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া স্বস্তি পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনিয়াছিলেন। তাহার এই অভিযোগের উত্তরে ভারতীয় প্রতিনিধি জানান যে, ভারত সরকার যে কোন নিরপেক্ষ ব্যবস্থাধীনে জুনাগড়ে গণভোট গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। ইহার পর স্যার জাফরুল্লা জুনাগড় লইয়া আর বেশী পীড়াপীড়ি করেন নাই। পাকিস্তান চালে ভুল করিয়াছে। অসাধ্য সাধনের কূটনৈতিক জুয়াখেলায় চরম পরাজয়ের গ্লানি বহন করিয়া জুনাগড়-প্রসঙ্গ ভারত বিদ্বেষী প্রচারকার্য্য ছাড়া পাকিস্তানের আর কোন উপকারেই আসিবে না।

কাথিয়াবাড়ের সাংবাদিক গ্যারিবল্‌দি সম্পর্কে কিছু না বলিলে জুনাগড়-প্রসঙ্গ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। শ্যামলদাসের অভিযান চরম সাফল্য অর্জ্জন না করিলেও তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যে উদ্দেশ্য সাধনের প্রেরণা লইয়া এই সাংবাদিক গণমুক্তি

ফৌজ গঠন করেন জুনাগড়ের রাষ্ট্র মুক্তির ফলে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। শ্যামলদাস গদীর লোভে এই সামরিক অভিযান করেন নাই। ভারতীয় ইউনিয়নে জুনাগড়ের অন্তর্ভুক্তি এবং কাথিয়াবাড়ের সংহতি রক্ষাই ছিল তাহার লক্ষ্য। নিজেই তিনি লক্ষ্যের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে অবশিষ্ট কাজটুকু অন্যের দ্বারা হইলেও তিনি অসন্তুষ্ট নহেন। আজ নবাব ও নবাবী শাসন মুক্ত জুনাগড়ের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে তিনি অন্যতম। আজিকার পদমর্য্যাদার প্রশ্ন বাদ দিলেও দেশীয় রাজ্যের মুক্তি-সংগ্রামে তিনি এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস এই সাংবাদিক গ্যারিবলদিকে ভুলিতে পারিবে না।

দশম অধ্যায়

হায়দরাবাদ ঃ

ভারতের সংহতির পক্ষে দেশীয় রাজ্যের গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া স্যার রেজিনাল্ড কুপল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে, "দেশীয় রাজ্য বঞ্চিত ভারত সম্পূর্ণভাবে তাহার আভ্যন্তরীণ সংযোগ হারাইয়া ফেলিবে। দেশীয় রাজ্য-সমূহ প্রাচীরের ন্যায় গোটা দেশটিকে কয়েকটি বিশ্লিষ্ট খণ্ডে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যদি কেবল মাত্র মধ্য ভারতের রাজ্যমণ্ডলী, হায়দরাবাদ এবং মহীশুরকে ইউনিয়ন হইতে বাদ দেওয়া যায় তবে যুক্ত-প্রদেশ বোম্বাই হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং বোম্বাই সিন্ধু হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে। এই পরিস্থিতির ষ্ট্রাটেজিক এবং অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট। পাকিস্তানের সম্ভাব্যতা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু বৃটিশ ভারত হইতে দেশীয় রাজ্যের বিচ্ছেদের কথা যতই বিবেচনা করা যায় ততই উহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর পূর্ব্বের মুসলিম অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইলে ভারত বাঁচিতে পারে কিন্তু হৃদয় ব্যতীত ইহার পক্ষে কি ভাবে বাঁচা সম্ভব?"

নিজামের ২৬শে জুন তাঁরিখের (১৯৪৭) ফরমানে ভারতের এই মর্ম্মস্থানেই আঘাত করা হইল। ভারত বিভক্ত হইতে তখন মাত্র বিশ দিন বাকী। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব সংক্রান্ত ঘোষণায় ভারতের সংহতি এক শঙ্কাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। রাজন্যসমাজের সহিত চুক্তি করিয়া জাতীয় নেতৃবৃন্দ তখন সংহতি রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত। এই সময়ে নিজাম ঘোষণা করিলেন যে, তিনি গণপরিষদ কিম্বা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিবেন না। তিনি ঘোষণা করিলেন

যে, বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব অপসৃত হওয়ায় তিনি স্বাধীন হইবার অধিকার পাইয়াছেন ; সুতরাং তিনি স্বাধীনই হইবেন। নিজামের সহিত সুর মিলাইয়া ইত্তেহাদুল মুসিলিমিন দলও ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান, রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং জনসংখ্যানুপাতে চাকুরী ভাগাভাগির বিরুদ্ধাচরণ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আধা সামরিক রাজাকর দল গঠন করা হইল এবং নিজাম গবর্ণমেণ্ট রাজ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ করিলেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে যে নাটকের শেষ যবনিকাপাত হইয়াছে ষ্টেট কংগ্রেস ও ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধাচরণে নিজাম-ইত্তেহাদের এই প্রকাশ্য জোঁটে তাহার সূত্রপাত হয়।

নিজামের এই ঘোষণা ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে যে কত বিপজ্জনক হায়দরাবাদের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি দৃকপাত করিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। চতুর্দ্দিকে ভারতীয় ইউনিয়ন বেষ্টিত দ্বিতীয় বৃহত্তম স্বৈরাচারী মুসলিম সামন্ত-শাসিত রাজ্যটির আয়তন ৮২,৩১৩ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১৬,৩৮৮,৫৩৪। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১২·৮ জন মাত্র মুসলমান এবং ৮১·৫ জন হিন্দু। অবশিষ্ট শতকরা ৫·৭ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজ্যটির ২৬ শতাধিক মাইল ব্যাপী সীমান্ত ভারতের তিনটি প্রদেশকে স্পর্শ করিয়াছে। হায়দরাবাদের সীমান্ত এবং সংলগ্ন বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ সীমান্তের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক বাধাও নাই। রেল, ডাক, তার, টেলিফোন ও বিমান চলাচলের জন্য হায়দরাবাদ ভারতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। চতুর্দ্দিকে ভূখণ্ড পরিবেষ্টিত হওয়ায় ভারতের মধ্য দিয়া ছাড়া বহির্বিশ্বের সহিত হায়দরাবাদের যোগাযোগ স্থাপন কোনক্রমেই সম্ভব নহে। অথচ রাজ্যটির ষ্ট্রাটেজিক গুরুত্ব এত বেশী যে, জরুরী অবস্থায় হায়দরাবাদ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতকে কার্য্যতঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে।

সাংস্কৃতিক দিক হইতেও হায়দরাবাদের কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নাই। ভাষার ভিত্তিতে হায়দরাবাদের এক কোটি পয়ষট্টী লক্ষ অধিবাসীকে তেলেগুভাষাভাষী, মারাঠীভাষাভাষী এবং কানাড়ীভাষাভাষী, এই তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। এই তিনটি ভাষাভাষী গোষ্ঠী সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক হইতে সংলগ্ন প্রাদেশিক ভারতের সমভাষাভাষী অধিবাসীদের সহিত অভিন্ন। জাতিগত উৎপত্তির দিক হইতেও ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

অর্থনৈতিক জীবনেও হায়দরাবাদ ভারতের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। ভারতের সম্পদ ও সঙ্কট তাহাকে ঠিক একই ভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। তুলা, খাদ্যশস্য (স্বাভাবিক অবস্থায়) প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষে হায়দরাবাদ আত্মনির্ভরশীল হইলেও লবণ, গুড়, ফল, গম, শাকশব্জী প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের জন্য হায়দরাবাদ ভারতীয় ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বিদেশ হইতে হায়দরাবাদ যে কোন জিনিষই আমদানী করুক না কেন, ভারতের বন্দর ও যানবাহন ব্যবস্থার মধ্য দিয়া তাহাকে হায়দরাবাদে লইয়া যাইতে হইবে। ভারতের যানবাহন ব্যবস্থার উপর হায়দরাবাদের একান্ত নির্ভরতা রাজ্যটির অর্থনৈতিক পরনির্ভরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হায়দরাবাদের নামসর্ব্বস্ব স্বতন্ত্র রেল ও ডাক ব্যবস্থা থাকিলেও উহা সর্ব্বভারতীয় রেল ও ডাক ব্যবস্থার অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই কাজ করে এবং এই ব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইলে উহা অচল ও অর্থহীন হইয়া পড়িবে।

কাজেই হায়দরাবাদ যে ভারতের কোনরূপ বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত এক অবিচ্ছেদ্য অংশমাত্র তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারেনা। ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্য যেমন পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে, তেমনি নিজামেরও উচিত ছিল ভারতের সহিত হায়দরাবাদকে যুক্ত করা।

কিন্তু নিজাম অন্যের সমান তালে চলিতে অস্বীকার করিলেন। এই অস্বীকৃতির কারণ সম্পর্কে নিজাম গবর্ণমেণ্টের এক পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে "হায়দরাবাদ প্রকৃতপক্ষে একটি দেশ এবং একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসাবেই সংগঠিত।" "রাজ্যটির বিশেষ সমস্যা এবং অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করিয়া নিজাম হায়দরাবাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।" এই উক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া পুস্তিকায় বলা হয় যে "ভারতের ছয়শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ বৃহত্তম এবং ইহার শাসক, হায়দরাবাদ ও বেরারের নিজাম এক অদ্বিতীয় এবং অতি বিশিষ্ট মর্য্যাদার অধিকারী। নিজাম রাজ্যের আয়তন যুক্তরাজ্যের চাইতে বড় এবং ফ্রান্সের অর্দ্ধেক। তাহার প্রজা-সংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ। এই জনসংখ্যা ভারতের যে কোন দেশীয় রাজ্যের লোকসংখ্যার দ্বিগুণের বেশী এবং ভারতীয় উপমহাদেশের বাহিরে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যত ডোমিনিয়ন আছে তদপেক্ষা বেশী। হায়দরাবাদের নিজস্ব গবর্ণমেণ্ট আছে, নিজস্ব সিভিল সার্ভিস ও আধুনিক সেনা বাহিনী আছে এবং নিজস্ব পুলিশ বাহিনী, বিশ্ববিদ্যালয়, রেলপথ এবং শিল্পও আছে।"

নিজাম গবর্ণমেণ্টের উপরিউক্ত দাবীর কোনটিই ধোপে টেঁকে না; কিম্বা এই দাবীর কোনটিই তাহাকে অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা দেয় না যাহার বলে এই সামন্ত রাজ্যটিকে একটি স্বতন্ত্র দেশ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

হায়দরাবাদের অতীত ইতিহাসই নিজামের স্বাধীনতা-দাবীর ভণ্ডামির উপযুক্ত জবাব। হায়দরাবাদের এমন কোন ঐতিহ্য নাই যাহার কথা স্মরণ করিয়া শ্লাঘা বা গৌরববোধ করা যাইতে পারে। পরদেশী আক্রমণকারীর এক ভাগ্যান্বেষী পার্শ্বচর রাজ্যটি স্থাপন করে। মুঘল সম্রাটের সুবাদার শাসিত এই রাজ্যটি কোন কালে স্বাধীনতা

ভোগ ত' করেই নাই—এমন কি স্বাধীনতা লাভের দাবী করিতে পারে এরূপ কোন আত্মত্যাগও কোন কালে করে নাই। হায়দরাবাদের শাসকগণ বৈদেশিক শক্তির আশ্রয়ে না থাকিয়া কোন কালে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। আরও মজার কথা এই যে, শাসকেরা বরাবরই শক্তের ভক্ত। মুঘলের তাঁবে থাকার সময়েও রাজ্যটি প্রথমে ফরাসী এবং অতঃপর ইংরাজের সামরিক শক্তির অধীনে ছিল।

হায়দরাবাদের অতীত ইতিহাসের অধিকাংশই ভারতে ইংরাজ শাসনের ইতিহাসের সহিত জড়িত। পররাজ্যিক সম্পর্ক এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যা উভয় বিষয়েই বৃটিশশক্তি হায়দরাবাদের উপর পূর্ণ-মাত্রায় রাজচক্রবর্ত্তিত্বের অধিকার প্রয়োগ করিয়াছে। এই সময়ে অন্যান্য সামন্তের সহিত নিজামের কোন পার্থক্য ছিল না। ১৮০০ সাল হইতে ইংরাজ রেসিডেণ্টগণ ক্রমাগত হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন। "মহামান্য" নিজাম বাহাদুরের "বিশ্বস্ত মিত্র" উপাধির কৌলীন্য যে কতটুকু লর্ড রিডিংএর বিখ্যাত পত্রে তাহা সুপ্রকাশ। অপরাপর রাজ্যে যেমন করা হইত প্রয়োজন বোধে ঠিক তেমনিভাবেই ইংরাজ রেসিডেণ্টগণ হায়দরাবাদের মন্ত্রী নির্ব্বাচন এবং মন্ত্রী নিয়োগ করিতেন, রাজ্যে শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতেন, এমন কি নিজামকে তাহার পুত্রদের নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য করিতেন এবং তাহাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে নিজামের মনে নিজের পদমর্য্যাদা সম্পর্কে খানিকটা ভ্রান্ত অহমিকা সঞ্চিত হয়। লর্ড রিডিং ১৯২৬ সালের ২৩শে মার্চ্চ এক পত্রাঘাতে এই ভ্রান্ত অহমিকা প্রকাশ্যে সমাধিস্থ করেন।

হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের পুস্তিকায় নিজাম রাজ্যের অন্যান্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার কোনটাই হায়দরাবাদের একক

বৈশিষ্ট্য নহে। ভারতের আরও বহু সামন্ত রাজ্যের আধুনিক পুলিশ ও সেনাবাহিনী, ডাক ও রেলব্যবস্থা আছে।

তবে হাঁ, হায়দরাবাদের কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ছিল। কাশ্মীরের ডোগরা শাসকদের ন্যায় হায়দরাবাদের মুসলিম শাসক গোষ্ঠী বরাবরই বিদেশী শাসক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসরের সম্পর্ক দ্বারাও এই শাসক গোষ্ঠী অধিবাসীদের সহিত কোন-কালে প্রাণের যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই; কিম্বা এজন্য তাহারা বেশী উৎকণ্ঠিতও ছিল না। বৃটিশ অনুগ্রহের নিরুপদ্রব আবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া জনসাধারণকে নিষ্করুণভাবে শোষণ ও পীড়ন করাই ছিল এই ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিবান স্বৈরাচারী সামন্ত শাসক গোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য। এইজন্য রাজ্যময় তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে স্বধর্ম্মাবলম্বী কায়েমী স্বার্থের অসংখ্য ঘাঁটি। সরকারী চাকুরী, জমির মালিকানা এবং শিল্প-বাণিজ্য সর্ব্বত্রই শাসক সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব।

হায়দরাবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাহার মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক কাঠামো। এই প্রতিক্রিয়াশীল কাঠামোর শীর্ষে অধিষ্ঠিত সর্ব্বেশ্বর নিজাম বহু প্রকার ভাতা বাবদ রাজ্যের রাজস্ব হইতে বৎসরে মাত্র ৫০ লক্ষ টাকা নিয়া থাকেন। তাহার নিজস্ব জমিদারীর আয় বৎসরে মাত্র তিন কোটি টাকা। নিজামের কয়েক শত কোটি সঞ্চিত অর্থ আছে বলিয়া যে প্রবাদ শোনা যায় তাহাও সর্ব্বময় সামন্ত শাসকেরা যে ভাবে সঞ্চিত করেন সেই ভাবেই সঞ্চিত হইয়াছে। এ ছাড়া তাঁহার দুই পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্য লোকেও রাজস্ব হইতে ভাতা বাবদ প্রচুর অর্থ নিতেন।

হায়দরাবাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্র তাহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। নিজাম নিজেকে মুঘল বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করেন এবং মুঘল বাদ-শাহদের মত বাধাবন্ধনহীন ব্যক্তিগত শাসন চালাইবার পক্ষপাতী।

কাজেই আধুনিক যুগের প্রগতিমূলক সমস্ত ব্যবস্থা রদ করিয়া সমস্ত ক্ষমতা তিনি নিজের হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন। শোনা যায়, সামান্য পদে লোক নিয়োগের ব্যাপারেও তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন। কতকটা বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর চাপে এবং কতকটা যুগধর্ম্মের তাগিদে তিনি নামসর্ব্বস্ব এক আইনসভা এবং মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিয়াছেন। বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তিত্ব বিলুপ্তিকে এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল শাসক যে তাহার অবাধ স্বৈরাচারের সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে অভিনন্দিত করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক।

নিজাম রাজ্যের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য তাহার শাসনব্যবস্থা। রাজ্যটি চারিটি সুবায় বিভক্ত। এই চারিটি সুবাকে আবার ১৬টি জিলায় ভাগ করা হইয়াছে। প্রতিটি জিলা আবার কয়েকটি তালুকে বিভক্ত। নিজাম রাজ্যের তালুকের সংখ্যা শতাধিক এবং গ্রামের সংখ্যা ২২,৫০০। হায়দরাবাদ রাজ্যের মোট জমির শতকরা ৫৮'৫ ভাগ খালসা জমি; বাকী আর সবটুকুই শরফ্-ই-খাস অর্থাৎ নিজামের ব্যক্তিগত জমিদারী। হায়দরাবাদে যত জায়গীর আছে তাহার আয়তন ১২০০০ বর্গমাইল। জায়গীরদারদের বিচার ও শাসনের ক্ষমতাও আছে। নিজাম রাজ্যের কুত্রাপি প্রজাস্বত্ব নাই। নিজামের ব্যক্তিগত জমিদারী ব্যতীত বাকী জমির মালিকানা সামন্ত জমিদারী প্রথা অনুসারে নিরূপিত হইয়াছে। রাজ্যের হাজার হাজর চাষী হতদরিদ্র ক্ষেত-মজুর মাত্র। চড়া খাজনা আদায় করিয়া এবং জোর পূর্ব্বক মধ্য যুগীয় দাসের মত খাটাইয়া শত ভাবে এই হতভাগ্যদের শোষণ ও পীড়ন করা হয়। প্রকৃত হায়দরাবাদের এই চিত্রকে ঢাকিবার জন্যই নয়নাভিরাম হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ সহর সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এছাড়া হায়দরাবাদের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অছে; এবং সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ তাহার অন্যতম। নিজাম সরকারে

চাকুরী লাভের যোগ্যতা কেবলমাত্র গুণপনা দ্বারা নিরূপিত হয় না। নিজাম সরকারে চাকুরী লাভের পক্ষে জন্মই প্রধান যোগ্যতা। শাসক সম্প্রদায়ের লোক ছাড়া আর সামান্য কয়েকজনেই যে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি লাভ করিয়াছে নিম্নলিখিত তপশীল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ :—

	বিভাগ	মুসলমান	হিন্দু	অন্যান্য	মোট
(১)	সেক্রেটারী	১০	১	১	১২
(২)	এডিশনাল সেক্রেটারী	২	১	১	৪
(৩)	জয়েন্ট ”	৩	—	—	৩
(৪)	ডেপুটি ”	৯	৩	—	১২
(৫)	এসিষ্ট্যান্ট ”	৫৫	৮	—	৬৩
(৬)	বিভাগীয় কর্ত্তা	৪০	৬	১	৪৭
(৭)	সুবাদার —	৪	—	—	৪
(৮)	কালেক্টর —	১৪	২	—	১৬
(৯)	রেভিনিউ বোর্ড	২	—	—	২
(১০)	সাব-কালেক্টর	৫০	১৯	২	৭১
(১১)	তহশীলদার	৭৫	৪০	৪	১১৯
(১২)	হাইকোর্টের জজ	৮	৫	—	১৩
(১৩)	ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ	১৪৭	৩৩	—	১৮০
(১৪)	পুলিশ (ডি,এস, পি, এ, এস, পি ও সার্কেল ইনস্‌পেক্টর)	৭৩	১২	৬	৯১
(১৫)	এডুকেশন অফিসার	২৩৭	৬৫	২৭	৩২৯
(১৬)	সাপ্লাই অফিসার	২৫	৭	১	৩৩
	মোট—	৭৫৪	২০২	৪৩	৯৯৯
	অনুপাত—	৭৫%	২০%	৫%	১০০%

রাজনৈতিক জাগরণকে যাহারা নির্ম্মম হস্তে দমন করিতে পারে পুলিশ ও সামরিক বিভাগের চাকুরীতে নিজামের বিশ্বাসভাজন সেইরূপ শাসক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরই একচেটিয়া অধিকার। এজন্ত বাহির হইতে আনিয়া কিছু স্বধর্ম্মাবলম্বীকেও নিজাম-সেবায় নিয়োগ করা হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, নিজাম শাসিত হায়দরাবাদের শাসন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় শাসক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্ত পরিকল্পিত। এই মধ্যযুগীয় মুসলিম আভিজাত্য বজায় রাখার জন্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে পুলিশ, সৈন্তদল ও গুপ্তচর দ্বারা যেমন এক সন্ত্রস্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, অপর দিকে ইংরাজ বণিক শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির অনুকম্পা লাভের পাকা বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ মারাঠাদের পুনরভ্যুত্থানের শঙ্কায় সদা-সন্ত্রস্ত এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর একান্ত নির্ভর ছিল বৃটিশ রাজচক্রবর্ত্তীর অনুকম্পা ও বেয়নেট। হায়দরাবাদের বৃটিশ রেসিডেণ্ট ১৯২৬ সালে তাঁহার ডেসপ্যাচে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে "হায়দরাবাদের অস্তিত্ব যে বৃটিশ সম্পর্কের উপর একান্ত নির্ভরশীল ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। ১৮০০ সালে আসফিয়া পরিবার দাক্ষিণাত্যের মাটিতে পোক্তভাবে শিকড় গাড়িতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে কোনকালেই তাহাদের বৈদেশিক প্রকৃতি বদলায় নাই। বৃটিশদের অনুপস্থিতিতে ইহাকে এই রাজ্যে বসবাসকারী মুষ্টিমেয় মুসলমানের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু মারাঠা পুনরভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে ইহার টিকিবার আশা সুদূরপরাহত। বর্ত্তমান নিজামকে যদি সম্পূর্ণভাবে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে হয় তবে তিনি বেশীদিন টিকিতে পারিবেন না বলিয়াই শঙ্কা হয়।

হায়দরাবাদে তিনটি রাজনৈতিক স্রোত মিলিত হইয়াছে। এই মারাঠা, অন্ধ্র এবং কানাড়ী আন্দোলনের লক্ষ্য সমভাষাভাষীদের লইয়া পূর্ব্বেকার ন্যায় এক একটি প্রদেশ গঠন করা এবং ইহাদের সাফল্যের অর্থ হায়দরাবাদের বিলুপ্তি।"[১]

কাজেই "বৃটিশ সম্পর্ক" ছিন্ন হইবার পরে "অবাধ ক্ষমতার স্বপ্নে বিভোর এবং জনগণের কল্যাণ সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন" নিজাম কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হইলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি তিনি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতেন তবে রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি-প্রবর্ত্তন করিতে হয়। ইহার অর্থ, স্বৈরাচারী শাসনের অবসান, সামন্ত শোষণ এবং শাসক সম্প্রদায় হিসাবে মুসলিম আভিজাত্যের বিলুপ্তি। এতদিন যাহাদের নির্ব্বিচারে শোষণ ও পীড়ন করা হইয়াছে, যাহাদের ধর্ম্মাচরণের অবাধ-সুযোগ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই, নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাহাদের প্রতিশোধ প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবার শঙ্কাও ছিল। হায়দরাবাদ যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে পারিত তবে এই অধিকারচ্যুতির সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহার ভৌগোলিক বাধা ছিল। জুনাগড়ের দৃষ্টান্তে সন্দেহাতীত-ভাবে প্রতিপন্ন হইল যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজামের এইরূপ সিদ্ধান্ত কোনক্রমেই সহ্য করিবেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি হায়দরাবাদকে স্বতন্ত্র একটি ডোমিনিয়ন হিসাবে অনুমোদন করিতে সম্মত হইতেন তাহা হইলেও একটা সুরাহা হইত। কিন্তু শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে প্রতিশ্রুতি আদায় করা যায় নাই। এই অবস্থায় নিজামী স্বৈরাচার এবং মুসলিম আভিজাত্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি নিষ্কণ্টক

(১) ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হোয়াইট পেপার অন হায়দরাবাদ—১১পৃঃ।

করার মাত্র একটি পথই ছিল। নিজাম ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ সেই তৃতীয় পন্থা—স্বাধীন হইবার সঙ্কল্পই করিলেন।

এই সিদ্ধান্ত স্বভাবতঃই ভারতের জাতীয়তাবাদ বিরোধী মহলের সমর্থন লাভ করিল। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারতের সংহতি নাশের বীজ নিহিত আছে উপলব্ধি করিয়া ভারত বিদ্বেষী চার্চ্চিলের নেতৃত্বে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী টোরীদল কোমর বাঁধিয়া নিজামের পক্ষে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে, নিজাম স্বাধীন হইতে পারিলে "ভারতের উদরে" চিরকালের মত সাম্রাজ্যবাদের এক নিষ্কণ্টক বাণিজ্যিক এবং সামরিক ঘাঁটি বাঁচাইয়া রাখা যাইবে। ভারত-বিদ্বেষী পাকিস্থানী রাষ্ট্রনায়কগণ এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ওসমানিস্থানরূপী তৃতীয় পাকিস্তান সৃষ্টির সম্ভাবনায় পুলকিত হইলেন এবং কাশ্মীর সংগ্রামে সুরাহার আশায় ও ভারতকে দুর্ব্বল করার চাল হিসাবে নিজামের দাবী সমর্থন করিতে লাগিলেন।

স্থিতাবস্থা চুক্তি

ভারত সরকার অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় হায়দরাবাদকে স্থিতাবস্থা চুক্তি এবং ডোমিনিয়নে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলে নিজাম গবর্ণমেণ্ট দুই মাস সময় চাহিলেন। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং নিজামের সহিত আলোচনা চালাইবার ভার লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের উপর অর্পিত হইল।

হায়দরাবাদের-বাহিরে প্রভাবশালী মিত্রলাভে অসুবিধা না হইলেও নিজামের স্বাধীনতার সাধ পূর্ণ হইবার প্রধান অন্তরায় ছিল হায়দরাবাদের জনগণ। ষ্টেট কংগ্রেস এবং অন্ধ্র মহাসভার নেতৃত্বাধীন হায়দরাবাদের জনশক্তি ছিল ইহার প্রচণ্ড বিরোধী। দশ বৎসর পূর্ব্বে

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে হায়দরাবাদ ষ্টেট্ কংগ্রেস স্থাপিত হয় এবং কিছুদিন পরে উহা সর্ব্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষ্টেট্ কংগ্রেস ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান এবং রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সমর্থক। অন্ধ্র মহাসভা কমিউনিষ্ট নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান। হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলে ইহাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব প্রতিপত্তি। ইহাদের কর্ম্মপন্থা ষ্টেট্ কংগ্রেস অপেক্ষা আরও প্রগতিমূলক; কাজেই তাহারা সামন্ত শাসক গোষ্ঠীর এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির ঘোরতর বিরোধী ছিল। সামন্ত ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করিয়া হায়দরাবাদে পূর্ণ গণরাজ প্রতিষ্ঠা এবং অতঃপর ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য তাহারা সংগ্রাম করিতেছিল।

এই দুইটি গণপ্রতিষ্ঠানের সহিত স্বাধীনতাকামী নিজামের আপোষ হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ইহাদের সাফল্যের অর্থ নিজামী স্বৈরাচারের অবলুপ্তি। সুতরাং এই গণজাগরণের মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে না পারিলে নিজামের স্বপ্নসাধ পূর্ণ হইবার আশা ছিল না। এজন্য নিজাম গবর্ণমেণ্ট একদিকে যেমন সরকারী পীড়নযন্ত্র নির্ম্মমভাবে প্রয়োগ করিয়া বধবন্ধনের বিভীষিকা সৃষ্টি করিলেন; অপরদিকে ভেদবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হায়দরাবাদের মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বপক্ষে আনার ব্যবস্থা করিলেন।

১৯২৬ সালে নিজামের উদ্যোগে রাজ্যের জঙ্গীভাবাপন্ন মুসলমানদের লইয়া ইত্তেহাদুল-মুসলিমিন নামে একটি দল গঠন করা হয়। নির্ব্বিচারে নিজামের সামন্ত শাসন সমর্থন করাই ছিল ইত্তেহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে ভারতব্যাপী যে জনজাগরণ দেখা দেয় তাহার ঢেউ হায়দরাবাদকেও আঘাত করে এবং নিজামৎ জঙ্গ নামে এক ব্যক্তি নিজামের

অধীনে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্য লইয়া "নিজামস্ সাবজেক্টস্ লীগ" নামে একটি দল গঠন করেন। দলটি বিশেষ কোন কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু সাবজেক্টস্ লীগের আদর্শের পাল্টা জবাবে ইত্তেহাদ তাহার সাবেক আদর্শের মধ্যে নূতন এক আদর্শ সংযোজনা করিল যে, "নিজাম স্বয়ং এবং তাঁহার রাজমুকুট মুসলমানদের রাজনৈতিক সার্ব্বভৌমত্ব এবং মুসলিম কৃষ্টির প্রতিভূ।"

ইত্তেহাদের সভাপতি মিঃ আবদুল হাসান সৈয়দ আলী এবং ষ্টেট্ কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার মধ্যে এক সময়ে রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কে যুক্ত কর্ম্মপন্থা গ্রহণের এক সমঝোতা হয়। এই অপরাধে মিঃ আলীকে ইত্তেহাদের সভাপতিপদ হইতে অপসৃত করা হইল এবং নিজামের অনুমোদন ক্রমে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার জন্য কুখ্যাত মিঃ কাসিম রাজভী নামে একজন মফঃস্বলের উকীলকে ইত্তেহাদের সভাপতি করা হইল। কংগ্রেসের সহিত আলোচনা ফাঁসিয়া গেল।

নিজাম স্বাধীন হইবার ঘোষণা করার সময়ে ইত্তেহাদ তাহার পার্শ্বেই ছিল। আভ্যন্তরীণ প্রতিবাদী শক্তিসমূহ চূর্ণ করার জন্য এই সময়ে সে রাজাকর দল নামে ফ্যাসীভাবাপন্ন এক ঝটিকা বাহিনী গঠন করিল। সরকারী ফৌজের সহযোগিতায়, কখনও বা নিজেরা অগ্রণী হইয়া বিদ্রোহী গণশক্তির মনোবল ভাঙ্গিয়া দিবার উদ্দেশ্যে সাদীভাবাপন্ন পীড়ন করাই ছিল তাহাদের একমাত্র কাজ।

নিজাম জানিতেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত চূড়ান্ত বুঝাপড়া করিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিতে না পারিলে তাহার অভীষ্টলাভ হইবে না। এজন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং তাহার জন্য প্রয়োজন সময়ের। তাই প্রথমাবধি তিনি আলাপ-আলোচনায় যথাসম্ভব কালহরণের পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। নিজামের প্রধান মন্ত্রী স্যার মির্জ্জা ইসমাইল ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত বন্ধুত্বের পক্ষপাতী

ছিলেন। ভারতের সহিত আলোচনার প্রারম্ভেই নিজাম তাঁহাকে অপসৃত করিলেন এবং ছত্রীর নবাবকে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করিলেন। জুলাই মাসে ছত্রীর নবাব, নিজামের ইংরাজ উপদেষ্টা স্যার ওয়াল্‌টার মঙ্কটন, স্যার সুলতান আহমদ এবং নবাব আলী ইয়ার জঙ্গ ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার জন্য নয়া দিল্লী আসিলেন কিন্তু পনরই আগষ্টের পূর্ব্বে কোন চুক্তি হইল না। অতঃপর ছত্রী-প্রতিনিধি দল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও সলাপরামর্শ করিয়া অক্টোবর মাসে স্থিতাবস্থা চুক্তির এক খসড়া তৈরী করিলেন। ভারতের অন্যান্য সমস্ত দেশীয় রাজ্য যখন ডোমিনিয়নে যোগদান করিয়াছে তাহার দুই মাস পরে নিজামের সহিত স্থিতাবস্থা চুক্তির খসড়া তৈরী হইল মাত্র। নিজাম প্রতিনিধিদল এই যুক্তি দেখাইলেন যে, হায়দরাবাদের বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করিলে ভারতের সহিত অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের সম্বন্ধের চাইতে তাহার সম্বন্ধ স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। প্রতিনিধিদল ইহাও বলিলেন যে, এখন এক বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা চুক্তি হইলে বৎসরান্তে স্থায়ী সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা সহজতর হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থিতাবস্থা চুক্তি অনুমোদন করিতে রাজী হইলেন এবং ছত্রীর নবাব চুক্তিপত্রে নিজামের স্বাক্ষর আনার জন্য হায়দরাবাদ গেলেন। ২৭শে অক্টোবর নিজামের স্বাক্ষর সহ ছত্রীর নবাবের ফিরিয়া আসার কথা। ইতিমধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়া গেল। রাজাকর দল ছত্রী প্রতিনিধিদলের প্রত্যাবর্ত্তনের দিন তাহাদের বাসভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পথরোধ করিল। পুলিশের সমর্থন ব্যতীত এইরূপ ঘটনা সম্ভব নহে। যাহাই হউক, নিজাম মিঃ কাসিম রাজভীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং ছত্রী প্রতিনিধি দলকে বাতিল করিয়া নূতন এক প্রতিনিধিদল নিয়োগ করা হইল। ছত্রীর নবাব ১লা নভেম্বর

পদত্যাগ করেন এবং ইংরাজ বণিকের দোস্ত ও পাকিস্তানের বিশ্বাসভাজন মীর লায়েক আলী নামে জনৈক শিল্পপতিকে প্রধানমন্ত্রী করা হইল।

নূতন প্রতিনিধিদল দিল্লী আসিয়া খসড়া পরিবর্তনের চেষ্টা তদ্বির করিলেন। কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় উপদেষ্টাগণ নিজামকে আর বিলম্ব না করিয়া একটা সাময়িক চুক্তি করার পরামর্শ দিলেন। অবশেষে ২৯শে নভেম্বর (১৯৪৭) এক বৎসরের জন্ম ভারত-নিজাম স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। স্থিতাবস্থা চুক্তির সর্ত্ত নিম্নোক্ত রূপ :—

(১) ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে বৃটিশ রাজশক্তি এবং নিজামের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবস্থা সহ অন্যান্য বিষয়ে যে সমস্ত চুক্তি এবং শাসন সংক্রান্ত বন্দোবস্ত ছিল, তৎসমুদয় (যতটা প্রযোজ্য) ভারতীয় ডোমিনিয়ন এবং নিজামের মধ্যে বহাল থাকিবে। তবে ইহা দ্বারা ডোমিনিয়নের এমন কোন অধিকার হইবে না কিম্বা বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, যাহার দরুণ আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম নিজামের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠান যাইতে পারে কিম্বা যুদ্ধের সময়ে ছাড়া এবং নিজামের সম্মতি ব্যতীত সৈন্য মোতায়েন করা যাইতে পারে। এইরূপ ভাবে কোন সৈন্য মোতায়েন করা হইলে যুদ্ধশান্তির ছয়মাসের মধ্যে তাহা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(২) এই চুক্তি ভাল ভাবে কার্য্যকরী করার জন্ম নিজাম এবং ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্ট উভয়ে উভয়ের রাজধানীতে এজেণ্ট-জেনারেল নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহারা যাহাতে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন একজন্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিবেন।

(৩) এই চুক্তির কোন কিছু দ্বারা রাজচক্রবর্ত্তিত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হইল কিম্বা রাজচক্রবর্ত্তিত্বের কোন ক্ষমতা প্রবর্ত্তিত হইল ইহা বুঝাইবে না। এই চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরে, চুক্তি বিদ্যমান না থাকিলে যে পক্ষ যে অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিতেন তিনি তাহা প্রয়োগ

করার অধিকারী থাকিবেন। এই চুক্তির কোন সর্ত্ত কিম্বা তদনুসারে গৃহীত কোন ব্যবস্থা তাহার কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না।

(৪) এই চুক্তি হইতে উদ্ভূত কোন বিরোধের মীমাংসার ভার দুইজন সালিশের উপর অর্পণ করিতে হইবে। উভয় পক্ষ এক জন করিয়া সালিশ নিয়োগ করিবেন এবং তাহারা দুইজনে একজন মধ্যস্থ নিয়োগ করিবেন।

(৫) চুক্তিটি এখনই বলবৎ হইবে এবং এক বৎসর ইহার মেয়াদ থাকিবে।

চুক্তির মুখবন্ধে বলা হয় যে, "উভয়ের মঙ্গলের জন্য ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা এবং মতৈক্য বজায় রাখিয়া কাজ করাই ভারতীয় ডোমিনিয়ন এবং নিজামের নীতি এবং লক্ষ্য।"

এই চুক্তি সম্পর্কে ভারতীয় আইন সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সর্দ্দার প্যাটেল বলেন (২৯-১১-৪৭) নিজাম ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিলেই সদস্যগণ এবং জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইত। যাহা হউক এই চুক্তির ফলে একটি জিনিষ সুস্পষ্ট হইল যে, "হায়দরাবাদ পাকিস্তানে যোগদান করিবার অভিলাষী নহে।" ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা পোষণ করা ব্যতীত স্থিতাবস্থা চুক্তিকে দেশীয় রাজ্য সচিব এই চক্ষেই দেখিয়াছেন।

হায়দরাবাদের সহিত সুদীর্ঘ আলোচনা এবং অতঃপর অন্যান্য রাজ্যের চাইতে তাহার সহিত ভিন্নরূপ আচরণ জনসাধারণ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নাই। কাশ্মীর সমস্যার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার দরুণ ভারত রাষ্ট্রে যে অনিশ্চিত অবস্থা দেখা দিয়াছিল হায়দরাবাদ প্রতিনিধিদল পূর্ণ মাত্রায় তাহার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। তথাপি, হায়দরাবাদের জনগণ যখন নিজামের বিরোধী এবং তাহার সহিত সংগ্রাম রত ছিল তখন ইংরাজ

বড়লাটের প্রভাবে নিজামের সহিত এইরূপ এক চুক্তি করা খুব সমীচীন হইয়াছে অকুণ্ঠ-ভাবে একথা বলা যায় না। সর্দার বল্লভভাইও তাহা বলিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ নিজাম গবর্ণমেণ্টের ভারত বিরোধী মতি গতি যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি সংগ্রামশীল জনশক্তিকে সমর্থন ও সাহায্য করিতেন, কংগ্রেস সহ অন্যান্য সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান যদি হায়দরাবাদের যুদ্ধরত জনশক্তির সহায্যার্থ আগাইয়া আসিত তবে নিজামের সামন্ততান্ত্রিক দুর্গ তখনও চূর্ণ করা অসম্ভব হইত না। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের শাসন-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এবারেও তাহার প্রতিবাদী হইল এবং নিজামের সহিত চুক্তির আশায় বিরক্তিকর আলোচনা ও সলাপরামর্শের সূত্রপাত করিল।

স্বাধীনতার জন্য সমর-প্রস্তুতি

এদিকে হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরেও গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল। নিজামের স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্পে হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট যে ক্রমান্বয়েই চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল ছত্রীর নবাবের পদত্যাগে তাহা সুস্পষ্ট হইল। রাজাকর দলের আস্ফালন ও ঔদ্ধত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নিজাম গবর্ণমেণ্ট যে স্বাধীনতার প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে কালক্ষেপণের জন্য এই চুক্তি করিয়াছিলেন তাহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল পাকিস্তানকে গোপনে বিশ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ায়। কাশ্মীর আক্রমণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন পাকিস্তানকে প্রকাশ্যে অভিযুক্ত করিতেছেন, উভয় ডোমিনিয়নের মধ্যে কাশ্মীর লইয়া এক যুদ্ধ বাধিতে পারে বলিয়া যখন শঙ্কা করা হইতেছে সেই সময়ে নিজাম গবর্ণমেণ্ট ভারত আক্রমণ-কারীকে ঋণদান করিয়া অর্থ সাহায্য করিলেন;—স্থিতাবস্থা চুক্তি লঙ্ঘন করিয়া এক বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করিলেন।

নিজাম গবর্ণমেণ্ট দেশরক্ষা সম্পর্কিত চুক্তিও লঙ্ঘন করেন। ১৯৩৯ সালের ইণ্ডিয়ান ষ্টেট্‌স্ ফোর্স স্কীম অনুযায়ী ভারত সরকার হায়দরাবাদের সৈন্যদল নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং সেনাবাহিনীর শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদ ভারত সরকারের অনুমোদন ব্যতীত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল, অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিল; অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া গুপ্তভাবে তাহা আমদানী করিতে লাগিল এবং গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য সমগ্র ভারতে গুপ্তচর পাঠান হইল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, নিজাম রাজ্যে পূরাদস্তর যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়া গেল।

স্থিতাবস্থা চুক্তির পরে ভারত সরকার সদিচ্ছার দ্যোতক হিসাবে হায়দরাবাদ রাজ্য হইতে ভারতীয় ফৌজ অপসারণ করিলেও স্থিতাবস্থা চুক্তি কার্য্যকরী করার জন্য নিজাম গবর্ণমেণ্ট আদৌ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা বারম্বার অস্ত্র সরবরাহের তাগিদ দিয়াছেন।

এদিকে ইত্তেহাদ দলের প্রভাব প্রতিপত্তি আস্ফালন ও অত্যাচার-ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজাকর নেতা কাসিম রাজভী দিল্লীর লালকেল্লায় আসফিয়া পতাকা উত্তোলনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাজ্যের মধ্যে সশস্ত্র রাজাকর দল এমন নৃশংস অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করিল যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অবলুপ্ত হইল। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া এবং উৎপীড়নাশঙ্কায় হাজার হাজার হিন্দু নিজামরাজ্য ত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। দক্ষিণ ভারতে নূতন শরণাগত সমস্যা দেখা দিল। রাজাকর দলের উৎপাত কেবল রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল না। সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তাহারা ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে উৎপাত আরম্ভ করিল এবং লুঠতরাজ করিতে লাগিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চর

প্রেরণ করিয়া সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার অক্লান্ত চেষ্টা চলিতে লাগিল; এবং ভারতীয় ইউনিয়নের অনেক মুসলমানকে প্রলুব্ধ করিয়া হায়দরাবাদ লইয়া যাওয়া হইল। লীগভক্ত এই সব মুসলমানদের অনেকে রাজাকর দলে যোগ দিল; কেহ বা ভাগ্যান্বেষণে পরস্বাপহারীর ভূমিকা গ্রহণ করিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ভারত বিদ্বেষী প্রচারের ব্যবস্থাও করা হইল।

এই সব কাণ্ডের পর ভারত সরকার যখনই রাজাকরদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন নিজাম গবর্ণমেণ্ট টালবাহনা করিয়া তাহার কোন সদুত্তর দেন নাই এবং প্রকারান্তরে এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাজাকরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁহারা আদৌ ইচ্ছুক নহেন।

আপোষের শেষ চেষ্টা

নিজাম গবর্ণমেণ্ট এবং ইত্তেহাদ মনে করিয়াছিলেন যে, মুসলিম লীগের পন্থা অনুসরণ করিয়া হুমকি, অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতি বর্ব্বর আচরণ দ্বারা তাহারা হায়দরাবাদকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে এবং সমর-প্রস্তুতি দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবে যাহাতে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ঘাটাইতে সাহস করিবেন না। বস্তুতঃ রাজভী একথা বহু সভায় বলিয়াছেন যে, হায়দরাবাদ আক্রমণ করার মত শক্তি বা সাহস ভারত সরকারের নাই। কিন্তু রাজাকর উৎপীড়নে ভারতের জনমত ক্রমান্বয়েই বিক্ষুব্ধ এবং অধীর হইয়া পড়িতেছিল। চতুর্দ্দিক হইতে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠিতে লাগিল। ভারত সরকার ধৈর্য্য সহকারে অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেও ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ হায়দরাবাদ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিতেছিলেন। সর্দ্দার প্যাটেল তাঁহার জুনাগড় বক্তৃতায়

বলেন যে, নিজাম গবর্ণমেণ্ট মতি পরিবর্ত্তন না করিলে জুনাগড়ে যাহা ঘটিয়াছে হায়দরাবাদেও তাহাই ঘটিবে। নিজাম গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত সংযত সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেন নাই।

যাহাই হউক মার্চ্চ মাসে স্থায়ী সম্পর্ক নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইল। স্যার ওয়াল্টার মঙ্কটন সহ মীর লায়েক আলী নয়া দিল্লী আসিলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁহাকে জানান যে, রাজাকর দল শান্তি ও নিরাপত্তা হানির প্রবল শঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে সুতরাং দলটি নিষিদ্ধ করা দরকার। লায়েক আলী কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না। তিনি আশ্বাস দিলেন যে হায়দরাবাদ ফিরিয়া তিনি অধিকতর প্রতিনিধি-মূলক গবর্ণমেণ্ট গঠনের চেষ্টা করিবেন। অতঃপর সর্ব্ব দলের প্রতিনিধি লইয়া তিনি যে গোল টেবিল বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন রাজভীর বিরোধিতায় সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। ইহার কিছুদিন পরেই মীর লায়েক আলী ভারতের এজেণ্ট জেনারেল মুন্সীর নিকট দাবী করেন যে, পঁচিশ হাজার সৈন্য এবং পঁয়ত্রিশ হাজার পুলিশের উপযোগী আধুনিক অস্ত্র তাহাদের দিতে হইবে এবং নিজাম গবর্ণমেণ্ট যত অস্ত্র ক্রয় করিয়াছেন অবাধে তাহা হায়দরাবাদে আনিতে দিতে হইবে।

সীমান্ত অঞ্চলে রাজাকর দলের উৎপাত ইতিমধ্যে মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। ইত্তেহাদ এবং রাজাকর দলকে এখনই নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবী জানাইয়া প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল ৪ঠা মার্চ্চ (১৯৪৮) নিজাম গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র লেখেন। লায়েক আলী গবর্ণমেণ্ট রাজাকর দল ভাঙ্গিয়া দিবার প্রশ্ন বিবেচনা করার আশ্বাস দিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই লায়েক আলী দিল্লী আসিলেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য তাঁহাকে রাজাকর দলকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে,—তাহাদের সভা-সমিতি, মিছিল ও বিক্ষোভ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং ইহার সঙ্গে

সঙ্গে ষ্টেট কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে হইবে এবং প্রতিনিধিমূলক নূতন এক অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে। লায়েক আলী পণ্ডিতজীর কথা মানিয়া নিলেন; কিন্তু রাজ্যে ফিরিয়া কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন না।

অব্যাহত রাজাকর অত্যাচারে রাজ্যের ভিতরে ও সীমান্ত অঞ্চলে অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি হইল। জনসাধারণ ভারত সরকারের নিশ্চেষ্টতার কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিল। ভারত সরকারের ধৈর্য্য ও সংযম নিজাম গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বলতা বলিয়া গণ্য করিতেছেন ইহা উপলব্ধি করিয়া ১৫ই মে (১৯৪৮) ভারত সরকার এক পত্রযোগে রাজাকর প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে বে-আইনী ঘোষণা করার এবং ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী জানান। রাজাকর দল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যাহাতে উৎপাত সৃষ্টি করিতে না পারে এজন্য রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ভারতীয় ফৌজ মোতায়েন করা হইল। এবং প্রয়োজন বোধে এই হানাদার দস্যুদের অনুসরণ করিয়া রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ভারতের জনমত বহু পূর্ব্বেই এই পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইতেছিল। ভারত সরকার এতদিন পরে সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করায় বুঝা গেল যে, শঠের সঙ্গে সদাচরণ করিবার মোহ তাঁহাদের কাটিয়াছে।

যাহাই হউক, মাউণ্ট ব্যাটেনের ভারত ত্যাগের সময় আগাইয়া আসিতেছিল এবং ইহার পূর্ব্বেই হায়দরাবাদের সহিত একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করার জন্য তিনি আগ্রহী হইয়া পড়িলেন। হায়দরাবাদ প্রতিনিধিদল মে মাসে পুনরায় দিল্লী আসিল। লায়েক আলী প্রস্তাব করিলেন যে, ডোমিনিয়নে যোগদানের সর্ত্ত-পত্রের পরিবর্ত্তে স্থায়ী সহযোগিতার এক সর্ত্তপত্র স্থির করা হউক। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবেও রাজী হইলেন।

ভারতীয় আইনসভা পররাষ্ট্রিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা এবং যানবাহন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আইন প্রণয়ন করিবেন তাহা স্বাভাবিক নিয়মে হায়দরাবাদে প্রযুক্ত হইবে এই ভিত্তিতে সহযোগিতার এক সর্ত্তপত্রের খসড়া করা হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিজামের এক ফারমানের খসড়া করা হইল। স্থির হইল যে, যেদিন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে সেই দিনই নিজাম এই ঘোষণা প্রচার করিবেন। নিজামের এই ঘোষণায় রাজ্যে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের, তদুদ্দেশ্যে গণ-পরিষদ গঠনের এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা-ক্রমে অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রতিশ্রুতি সন্নিবিষ্ট ছিল। ভারতের সহিত চূড়ান্ত সম্পর্ক নিরূপণের বিষয়টি গণভোটের ফলাফলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

নিজাম প্রতিনিধিদল খসড়া সর্ত্তের নানারূপ সংশোধন ও পরি-বর্ত্তনের দাবী জানাইলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কয়েকটি সংশোধনের দাবী মানিতেও সম্মত হইলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারা এমন সংশোধন দাবী করিলেন যাহারা ফলে চুক্তির ভিত্তি ওলটপালট হইয়া যায়। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই দাবী পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ফলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের সর্ব্বশেষ চেষ্টা ফাঁসিয়া গেল। পণ্ডিত নেহরু এই খসড়া চুক্তির উল্লেখ করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, আমরা আর একপদ অগ্রসর হইতেও প্রস্তুত নহি। এই সর্ত্তপত্র পড়িয়া রহিল, নিজাম যখন ইচ্ছা ইহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন। নিজাম প্রতিনিধিদলের সহিত নূতন কোন আলোচনা যে করা হইবে না জওহরলাল তাহাও স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করেন।

মে-জুন মাসের আলোচনার ফলে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন চুক্তির যে খসড়া রচিত হয়, নিজাম গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন না করিয়া চরম বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। অন্যান্য

দেশীয় রাজ্যের তুলনায় তাহাদের যে সুবিধা দেওয়া হইতেছিল তাহার ফলে তাহারা আধা স্বাধীন এক মর্য্যাদা ভোগ করিতে পারিতেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার তাহাদের দেওয়া না হইলেও, বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অবাধ অধিকার তাহারা পাইয়াছিলেন। সর্ব্বভারতীয় তাৎপর্য্যের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাচ্যুত হইয়া নিজাম গবর্ণমেণ্ট আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রভূত কর্ত্তৃত্বের অধিকারী থাকিতেন। তবে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন চুক্তিসর্ত্ত অপছন্দ হওয়ার দরুণ নিজাম গবর্ণমেণ্ট বাঁকিয়া বসেন একথা মনে হয় না। তাঁহাদের মূল আপত্তির কারণ সম্ভবতঃ নিজামের প্রস্তাবিত ফরমানের মধ্যে নিহিত ছিল। রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার অর্থ তাঁহারা ভালভাবেই বুঝিতেন। ভারতের সহিত চূড়ান্ত সম্পর্ক গণভোট দ্বারা নিরূপিত হইবার অর্থও তাঁহারা অবগত ছিলেন। রাজাকর বিভীষিকা এবং নিজামী পুলিশের অত্যাচার-সন্ত্রস্ত হায়দরাবাদে ভোট গৃহীত হইলে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তকে অনিশ্চিত করা অসম্ভব নাও হইতে পারে। কিন্তু উপদ্রবমুক্ত হায়দরাবাদে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণভোট গৃহীত হইলে তাহার ফলাফল সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা পোষণের কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

মাউণ্টব্যাটেন নীতির অবসান

যাহাই হউক, এই আলোচনা ফাঁসিয়া যাওয়ায় জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের এই অনুচিত আনুকূল্য প্রদর্শনের চেষ্টা হায়দরাবাদের চরমপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দুর্ম্মতির ফলে যে ফলবতী হয় নাই ইহা

সৌভাগ্যের কথা। ঠিক এই কারণেই পণ্ডিত নেহরু-কথিত দ্বার খোলা রাখার নীতি নিন্দিত হইয়াছে। হায়দরাবাদ তড়িৎগতিতে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করিতেছে এই অভিযোগ করার পরে তাহার প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন অসঙ্গতিপূর্ণ বিপজ্জনক নীতি। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির প্রভাবে পড়িয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট উদারতা ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার নামে এই অসঙ্গতিপূর্ণ নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। এই ব্যক্তিটি যে ভারতের শেষ ইংরাজ বড়লাট লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেন বই আর কেহই নহেন তাঁহার ভারত ত্যাগের পরে কথাটা প্রকাশ পাইল সর্দ্দার প্যাটেলের মুখে। পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ইউনিয়নের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উপ-প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে বলেন,—আমি কোন কালেই বিশ্বাস করিতাম না যে, নিজাম গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্ভব। তথাপি বড়লাট এই সমস্যা সমাধানের আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা তাঁহাকে একটা সুযোগ দিয়াছিলাম। যাহা হউক, মাউণ্টব্যাটেন-নীতি তাঁহার ভারত ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। হায়দরাবাদকে এখন অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মতই ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে হইবে।

সর্দ্দার প্যাটেলের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দ্বারা সূচিত হইল যে, ভারত সরকার খোলা দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভারত যে "অস্ত্রোপচারের" জন্য প্রস্তুত হইতেছে উপ-প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া গেল। উপ-প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে গণদাবী প্রতিধ্বনিত হওয়ায় ভারতের জনমত সমস্বরে তাহাকে সাধুবাদ জানাইল। হায়দরাবাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারাও হয়ত উপলব্ধি করিলেন যে, জিন্না-নীতি অনুসরণে বারম্বার আলোচনার আসর জমাইয়া

অধিকন্তর সুবিধা আদায়ের যুগ অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাহা-দের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধাঁচের মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে।

ভারত সরকারের মনোভাব যে ক্রমান্বয়েই দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে হায়দরাবাদ সীমান্তাঞ্চলে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে তাহার আভাষ মিলিতে লাগিল। রাজাকরদের সহিত ভারতীয় ফৌজ অথবা ভারতীয় পুলিশের সংঘর্ষ দৈনিকপত্রে প্রাত্যহিক সংবাদ হইয়া উঠিল। অবস্থা সুবিধার নয় বুঝিয়া নিজাম গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদ অবরোধের ধূয়া তুলিলেন। বস্তুতঃ রাজাকর উৎপাত বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার যেদিন সীমান্ত অঞ্চলে পুলিশ প্রহরার বন্দোবস্ত করেন তদবধি নিজাম সরকার অর্থনৈতিক অবরোধের অভিযোগ করিতেছিলেন। অথচ আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। ভারত সরকার যখনই কৃতনিশ্চয় হইলেন যে, নিজাম গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধায়োজন করিতেছেন তদবধি তাঁহারা হায়দরাবাদে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ কিম্বা সমর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় মাল প্রেরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। খাদ্য, ঔষধ, ক্লোরিণ, নুন প্রভৃতি সাধারণের ব্যবহার্য্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ প্রেরণে কোনদিনই বাধা দেওয়া হয় নাই। যে অস্ত্র হায়দরাবাদের নিরীহ নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর নির্ব্বিচারে প্রযুক্ত হইবে, যাহা পরিণামে ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই উদ্যত হইবে তাহা তৈরী করার সুবিধা ভারত সরকার করিয়া দিবেন এবং হায়দরাবাদের ক্রয়-করা অস্ত্র নির্ব্বিবাদে ভারতের মধ্য দিয়া যাইতে দিবেন, এরূপ আশা একমাত্র বাতুলেই করিতে পারে।

অথচ এই ব্যাপার লইয়া নিজামের বিলাতী বন্ধুরা প্রচণ্ড হৈচৈ করিয়াছেন। টোরী দলের সংবাদপত্রে প্রতিদিন হায়দরাবাদের উপর জবরদস্তির সংবাদ পরিবেশিত হইতে লাগিল। নিজামের রক্ষণশীল বন্ধুগণ বিষয়টি কমন্স সভায় উত্থাপন করিয়া হায়দরাবাদকে শক্তিশালী "হিন্দু সাম্রাজ্যবাদীর" জবরদস্তির হাত হইতে রক্ষা করার

জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিবার দাবী জানাইলেন। নিজামের প্রতি দরদে টোরী মুখপাত্রদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে ভারত-বিদ্বেষের তুবড়ী ছুটিতে লাগিল। পাকিস্তানী রাষ্ট্র-নায়কেরাও কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিলেন। ইহাদের প্রচারকার্য্য দেখিয়া মনে হইল যেন নিজাম এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় সমর্থকই হায়দরাবাদ। সামন্ত স্বৈরাচারের বিরোধিতা করিয়া যাহারা নির্ম্মম উৎপীড়নের সম্মুখীন হইয়াছে তবু নতি স্বীকার করে নাই,—সশস্ত্র রাজাকর দস্যুদলের চরম পাশবিকতা যাহাদের মনোবল ভাঙ্গিতে পারে নাই—সেই সহস্র সহস্র উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত নর-নারী যেন হায়দরাবাদের কেহই নয়।

যাহা হউক, শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট রক্ষণশীল দরদীদের অভিলাষ পূরণ করিতে সম্মত হইলেন না। স্থিতাবস্থা চুক্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জানাইলেন যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে। ইতিমধ্যে সর্দ্দার প্যাটেলের দৃপ্তকণ্ঠে ভারতের জবাব ধ্বনিত হইল। চার্চ্চিলের বক্তৃতার সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন যে, 'ভারত তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বাহিরের কাহারও হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না।' নিজামের বিলাতী বন্ধুদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভারত বৃটেনের সহিত বন্ধুভাবেই বসবাস করিতে চাহে; কিন্তু ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে বিলাতের রাষ্ট্রনীতিকগণ যে মনোভাব অবলম্বন করিবেন, কমনওয়েলথ সম্পর্কে ভারতের সিদ্ধান্ত স্বভাবতই তাহা দ্বারা প্রভাবিত হইবে।'

শান্তি অভিযান

নিজাম গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় রাজাকর দলের হিংস্র উৎপীড়ন ইতিমধ্যে হায়দরাবাদ রাজ্যে এক অসহনীয় অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করিল। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এই লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নৃশংস

হত্যাকাণ্ড এবং নারীনিগ্রহ ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যত্র পাল্টা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তীব্রতর করিয়া তুলিল। এই অবস্থা অব্যাহত-ভাবে আর কিছুদিন চলিতে দিলে ভারতের শান্তি বিনষ্ট হইবার প্রবল শঙ্কা দেখা দিবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার অতি মাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। নিজাম গবর্ণমেণ্ট এই অরাজক অবস্থা দূর করার জন্য কোন প্রতিবিধান করিবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। বরং পাকিস্তান ও নিজামের বিলাতী মুরুব্বিদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লায়েক আলী গবর্ণমেণ্ট স্বস্তি পরিষদের কূটনৈতিক আসরে হায়দরাবাদ প্রসঙ্গ উত্থাপনের তোড়জোড় করিয়া নূতন জটিলতা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাইতেছেন বিভিন্ন সূত্রে তাহার আভাষ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইন সভায় ঘোষণা করিলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজামের নিকট শেষবারের মত রাজাকর দল এখনই ভাঙ্গিয়া দিবার দাবী জানাইয়াছেন এবং হায়দরাবাদে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যতটা সৈন্য প্রেরণ করা প্রয়োজন, সেকেন্দ্রাবাদে তত সৈন্য পাঠাইবার সুযোগ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু আরও বলেন, আমরা মনে করি যে, পূর্ব্বের ন্যায় সেকেন্দ্রাবাদে আমাদের সৈন্য মোতায়েন না করিলে হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে না।

বড়লাট রাজাজী ইতিপূর্ব্বেই নিজামকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু হায়দরাবাদের অবস্থা স্বাভাবিক এই যুক্তি দেখাইয়া নিজাম তাহার সৎপরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন।

নিজাম গবর্ণমেণ্ট ভারতের এই শেষ দাবীর কি জবাব দিবেন তাহা কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই ভারতবর্ষ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের

পরবর্ত্তী ব্যবস্থার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তিন দিন পরে (১০ই সেপ্টেম্বর) পণ্ডিত নেহরু চরম ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়া বলিলেন যে, নিজাম যদি সম্মত না হন তবে "আমরা অগ্রসর হইব। এজন্য দুঃখ বোধ করিলেও সেকেন্দ্রাবাদ আমরা দখল করিবই।"

নিজামের জবাব প্রতি দিনই আশা করা যাইতেছিল। ১১ই সেপ্টেম্বর মিঃ জিন্নার মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী শুনিল যে, স্থিতাবস্থা চুক্তিসর্ত্তে অজুহাত দেখাইয়া নিজাম গবর্ণমেণ্ট ভারতের দাবী প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ঘটনার গতি অতঃপর তড়িতবেগে ধাবিত হইল। নিজামের উত্তর অবগত হইয়া ভারত সরকার তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাদের দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় হায়দরাবাদে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা এখন যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ইহার পরদিনই জানা গেল যে ভারতীয় ফৌজ নিজাম রাজ্যে পঞ্চমুখী অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। ১৩ই সেপ্টেম্বরের এই অভিযান অতীত ইতিহাসের একটি ঘটনা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৭২৭ সালে ঠিক এইদিনেই পেশবা প্রথম বালজী বাজীরাও নিজামের শক্তি খর্ব্ব করার জন্য অভিযান আরম্ভ করেন।

ভারতীয় ফৌজের অভিযানকে পুলিশী ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন, দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়। কোন রাষ্ট্র তাহার সার্ব্বভৌমত্বের অন্তর্গত এলাকায় অজারকতা দমন করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করে না।

ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। ভারতীয় ফৌজ অব্যাহত গতিতে আগাইয়া চলিল এবং তিনদিনের মধ্যেই রাজাকর ও নিজামী প্রতিরোধ চূর্ণ করিয়া সেকেন্দ্রাবাদের ৬০ মাইলের মধ্যে উপনীত হইল। ভারতীয় ফৌজের অগ্রগতি রোধের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর নিজাম যুদ্ধ বিরতির আদেশ প্রচার করেন এবং

ভারতীয় ফৌজকে বিনাবাধায় সেকেন্দ্রাবাদ যাইতে দিবার নির্দ্দেশ দেন।

রাজভীর আস্ফালন এবং চতুর ওসমান আলীর স্বাধীন হইবার দিবা-স্বপ্ন-সাধ চিরকালের মত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সাত মাস পরে ভারতীয় ফৌজ ১৮ই আগষ্ট আবার সেকেন্দ্রাবাদে প্রবেশ করিল। হায়দরাবাদ আক্রমণ করা হইলে ভারতীয় ইউনিয়নে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিবে বলিয়া শঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজাকর দল ব্যাপক ভাবে গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহার প্রয়াসও পাইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল যে, ভারতের একটি মুসলমানও এই অভিযানে বিচলিত হইল না। পাকিস্তান নীরবে ইহা সহ্য করিবে না এমন কথাও বহুবার শুনা গিয়াছে। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের অধিবেশনে হায়দরাবাদের পক্ষে কিছুটা চেষ্টা তদ্বির করা ছাড়া হায়দরাবাদ সম্পর্কে পাকিস্তান কার্য্যকর কোন কিছু করিয়াছে বলিয়া টের পাওয়া যায় নাই। রাজভী-লায়েক আলীর জোঁটকে পাকিস্তান বরাবর ভারতীয় ইউনিয়ন বিরোধী কূটনৈতিক দ্যূতক্রীড়ার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। মুখে কিছুটা হুমকি দেওয়া ছাড়া এ সম্পর্কে কার্য্যকর কিছু করিবার মত সামর্থ্য যে তাহার নাই তাহা বরাবরই সে উপলব্ধি করিয়াছে—অন্ততঃ জুনাগড়ের দৃষ্টান্তের পর এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার কারণ ছিল না। তাই ভারতীয় অভিযানের সময়ে পাকিস্তানী প্রচার-যন্ত্রকে কেবল বন্ধ্যা বিদ্বেষবিষ উদ্গীরণ করিয়াই নিরস্ত হইতে হইয়াছে।

সামরিক শাসনে হায়দরাবাদ

১৭ই সেপ্টেম্বর নিজাম ভারতের বড়লাটের উদ্দেশ্যে যে বেতার ঘোষণা করেন তাহাতে অস্ত্রসম্বরণের আদেশ জারী করা ছাড়া আরও

কয়েকটি আদেশের কথা উল্লেখিত ছিল। তিনি জানান যে, তাঁহার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে এবং তিনি এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। জাতিসঙ্ঘে হায়দরাবাদের আবেদন সম্পর্কে পীড়াপীড়ি না করার নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছে, রাজাকর দলকে বে-আইনী করিয়া এখনই উহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ জারী করা হইয়াছে এবং পণ্ডিত রামানন্দ তীর্থ সহ অন্যান্য সমস্ত ষ্টেট্ কংগ্রেসের নেতাদের কারামুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এই নির্দ্দেশ অনুমোদন করিয়া ক্ষান্ত হওয়া এবং নিজাম ও তাহার নূতন মন্ত্রিসভার হস্তে হায়দরাবাদের শাসনভার ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। হায়দরাবাদে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই ব্যবস্থা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য নহে। কাজেই, হায়দরাবাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের পরে হায়দরাবাদে সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইল এবং মেজর জেনারেল জে, এন, চৌধুরী নিজাম রাজ্যের সামরিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। যে কারণে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সশস্ত্র বাহিনী নিয়োগ করিতে হইয়াছে তদনুযায়ী এইরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ঠিকই হইয়াছে। অনিচ্ছায় হউক, কিম্বা অসামর্থ্যের জন্য হউক, নিজাম ইতিপূর্ব্বে হায়দরাবাদের অরাজক অবস্থা দূর করার জন্য কার্য্যকর কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। অতএব, ভারতীয় বাহিনীর অভিযানের পরেও সে দায়িত্ব তাহার উপর অর্পণ করা যায় না।

হায়দরাবাদে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার পক্ষে কেবল মাত্র রাজাকর দলের দমনই যথেষ্ট নহে। এজন্য নিজামের গোটা শাসনযন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া গড়া আবশ্যক এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইউনিয়নের বিরোধিতার জন্য নিজাম গবর্ণমেণ্ট যত আয়োজন করিয়াছিলেন তাহা রদ করা প্রয়োজন। কাজেই সামরিক শাসন কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমেই রাজ্যের

যাবতীয় অস্ত্র সমর্পণের আদেশ দিলেন এবং রাজাকরদের গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজভী বন্দী হইল—লায়েক আলী মন্ত্রিসভার সদস্যগণও স্বগৃহে অন্তরীণ হইলেন। সাবেক শাসন-যন্ত্র সংস্কারের জন্য ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে কিছু অফিসার ও পুলিশ আমদানী করা হইল। অবশ্য গোটা শাসন-যন্ত্রকে বাতিল করিয়া দিলে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষকে যতটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, নূতন বিশ্বাসভাজন কর্ম্মচারীর বন্দোবস্ত করিয়া তাহার যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয় নাই। স্থানীয় জনশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলেও এ দায়িত্ব পালন সহজতর হইত। কিন্তু সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপকভাবে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। কাজেই, শাসন ব্যবস্থা যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসন-যন্ত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোক বিদায় করা হইতেছে। ইহার ফলে গোটা শাসন ব্যবস্থার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে এমন কথা বলা যায় না।

স্বস্তি পরিষদের নিকট ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া নিজাম গবর্ণমেণ্ট আর একটি আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই অহেতুক জটিলতা দূর করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। নিজাম অস্ত্র সম্বরণের যে আদেশ প্রচার করেন তাহার মধ্যেই স্বস্তি পরিষদের নিকট তাহার আবেদন প্রত্যাহারের ইঙ্গিত ছিল। আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরে (১৮ই সেপ্টেম্বর) নিজাম স্বস্তি পরিষদের নিকট আবেদন প্রত্যাহার করিয়া এক পত্র লেখেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের মারফতে এই পত্র প্রেরিত হয়। তথাপি স্বস্তি পরিষদে এই প্রসঙ্গে আলোচনা উঠিলে হায়দরাবাদ প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য বলেন যে, তাঁহারা নিজামের নিকট হইতে সরাসরি কোন নির্দ্দেশ পান নাই। প্রতিনিধি

দলপতি নবাব মঈন জঙ্গ এমন কথাও বলিয়াছেন যে, নিজাম চাপে পড়িয়া এই সব করিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্থিতাবস্থা অনুসারে নিজাম যে মর্য্যাদার অধিকারী তদনুযায়ী তিনি স্বস্তি পরিষদের নিকট সরাসরি নালিশ জানাইতে পারেন না। ভারতীয় প্রতিনিধি স্যার রামস্বামী মুদালিয়রও এই যুক্তির বলে নিজামের আবেদনের বিরোধিতা করেন এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ একটি ব্যাপারে স্বস্তি পরিষদকে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করেন। ইহার পরে নিজাম যখন স্বয়ং তাঁহার আবেদন প্রত্যাহার করিলেন তখন স্বস্তি পরিষদ অনায়াসেই আবেদনটি আলোচনা স্থচী হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু অন্তরাল হইতে যে সমস্ত কূটনৈতিক প্রভাব কাজ করে তাহার ফলেই হায়দরাবাদের নালিশ সম্পর্কে এযাবৎ কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হইলেও আবেদনটি অদ্যাপি স্বস্তি পরিষদের আলোচনা স্থচীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছে। পাকিস্তান বিষয়টিকে ভারত বিরোধী প্রচারের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। মুসলিম জাহানের দুই একটি রাজ্য, বিশেষতঃ সিরিয়া বিষয়টি সম্পর্কে একটা কিছু করিবার পক্ষপাতী। অথচ, নিজাম গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে বেতার বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি "মুসলিম জগত"কে অভিসন্ধিমূলক প্রচারে বিভ্রান্ত হইতে নিষেধ করেন এবং লায়েক আলী মন্ত্রিসভা বিদেশে যত প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিল তিনি তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন বলিয়াও জানান। যাহাই হউক, স্বার্থবান পক্ষের প্রভাবে স্বস্তি পরিষদের এই টাল বাহনা হায়দরাবাদের রাজনীতিকে প্রভাবিত করিবে এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ইহা অপরাধীদের শাস্তিবিধানের প্রশ্ন। বৎসরাধিককাল হায়দরাবাদে যাহারা নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, গৃহদাহ, অত্যাচার-উৎপীড়ন এবং বধ-বন্ধনের বিভীষিকা

চালাইয়াছে—যাহারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই পৈশাচিকতা সমর্থন করিয়াছে কিম্বা অত্যাচারীদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে আজ তাহারা ন্যায়ের দণ্ড এড়াইয়া যাইবে কি? পুত্রশোকাতুরা জননীর অশ্রুজল, স্বামীহারা ধর্ষিতার করুণ ক্রন্দন, পিতৃহারা অনাথের দীর্ঘশ্বাস, সর্ব্বস্বান্ত বাস্তুহারার আর্ত্ত আবেদন ব্যর্থ হইবে কি? পৈশাচিক হিংস্রতার উল্লাসে প্রমত্ত যে নর-পশুদল ঘৃণিত অত্যাচারের নতুন ইতিহাস রচনা করিয়াছে, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত যে শঠ ষড়যন্ত্রী দল নানাভাবে তাহাদের অত্যাচারের ইন্ধন জোগাইয়াছে তাহাদের কেহই মানবতার বিরুদ্ধে এতবড় গর্হিত অপরাধের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। কেবল রাজাকর দস্যুদলই অপরাধী নহে। হায়দরাবাদের সামন্ত শাসন ব্যবস্থার শীর্ষাধিষ্ঠিত স্বৈরাচারী নিজাম সহ হায়দরাবাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারাও এই ঘৃণ্য অপরাধের দায় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। নিজাম গত ২৩শে সেপ্টেম্বর যে বেতার বক্তৃতা দেন তাহাতে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত সমস্ত ঘটনার দায় রাজভী-লায়েক আলীর উপর চাপাইয়া নিজেকে অসহায় শাসক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর নিজামের এই সাফাই আত্মদোষক্ষালনের ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। তিনি স্বৈরাচারী শাসক—নিয়মানুগ নৃপতি নহেন। মন্ত্রিসভার কার্য্যাবলী অবাঞ্ছিত মনে করিলে তাহা বন্ধ করা তাঁহার পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য হইত না। যদি তিনি প্রকৃতই ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিতে চাহিতেন তবে এজন্য তিনি অনায়াসেই ভারত সরকারের সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারিতেন। কিন্তু স্বয়ংপ্রণোদিত হইয়া ইহা করা তো দূরের কথা— ভারত সরকার কর্ত্তৃক বারবার অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি অত্যাচারীদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মনোভাবের অর্থ সুস্পষ্ট। অথচ এ সম্পর্কে আজকাল তেমন উচ্চবাক্য শোনা

যাইতেছে না। অপরাধীদের বিচার করার প্রকৃত অধিকারী কে—তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাদের বিচার ও যথোচিত দণ্ডদানের আবশ্যকতা সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকা উচিত নহে।

ভবিষ্যতের আভাষ

নিজামের স্বপ্নসাধ ভারতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার যে বিপন্নতা সৃষ্টি করিয়াছিল দীর্ঘ তেরো মাসব্যাপী ক্লান্তিহীন বন্ধ্যা আলাপ আলোচনা, সলা পরামর্শ, পত্র বিনিময় এবং পরিশেষে সামরিক বল-প্রয়োগের ফলে তাহার শঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের সহিত হায়দরাবাদের স্থায়ী সম্পর্ক নিরূপণ, হায়দরাবাদী জনসাধারণের সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সর্ব্বোপরি সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া প্রকৃত গণমুক্তি সাধনের কাজ অদ্যাপি অসমাপ্ত। রাজভী-লায়েক আলীর বিভীষিকার রাজত্বের অবসান এবং হায়দরাবাদে ভারতীয় বাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই সব মৌলিক সমস্যা সমাধানের প্রচণ্ডতম বাধা অপসৃত হইয়াছে মাত্র। অবশ্য হায়দরাবাদের জনসাধারণই এই মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের মুখ্য অধিকারী। তাহারা অবাধে এবং নির্ব্বিবাদে এই অধিকার যাহাতে প্রয়োগ করিতে পারে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যত সত্বর সম্ভব তাহার সুব্যবস্থা করাই সামরিক শাসন ব্যবস্থার মুখ্য কাজ—তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারত সরকার সামরিক শাসনের মেয়াদ বর্দ্ধিত করিয়াছেন; মৌলিক রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রারম্ভিক ব্যবস্থা হিসাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠনের কাজও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই উদ্যোগ

আয়োজনে হায়দরাবাদের মৌলিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইবে কিনা তাহাই আসল প্রশ্ন।

এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রাজ্যটির অভ্যন্তরে ও বাহিরে তুমুল বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় আজিকার হায়দরাবাদকে গ্রথিত করা সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধ নাই। মতভেদ দেখা দিয়াছে রাজ্যটির রাজনৈতিক কাঠামো এবং সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার প্রশ্ন লইয়া। এক পক্ষ, নিজাম রাজ্যকে বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া সমভাষাভাষী সন্নিহিত প্রদেশসমূহের সহিত উহাকে যুক্ত করিয়া দিবার পক্ষপাতী। ইহাদের দাবী পূর্ণ হইলে বর্ত্তমান হায়দরাবাদ এবং তৎসহ নিজাম রাজবংশের রাজনৈতিক অস্তিত্ব লোপ পায়। অপর পক্ষ, এখনই হায়দরাবাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব লোপ করার পক্ষপাতী নহে—তাহারা রাজ্যটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং নিয়মানুগ শাসক হিসাবে নিজাম বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাহে। ভারত ও হায়দরাবাদের বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ প্রথমোক্ত দাবীর সমর্থক। 'স্বামী রামানন্দ তীর্থের নেতৃত্বাধীন হায়দরাবাদ ষ্টেট্ কংগ্রেস অদ্যাবধি এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ না করিলেও, ষ্টেট্ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দ্বিতীয় পন্থা অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। ষ্টেট্ কংগ্রেস এ পর্য্যন্ত যে কয়টি গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন তাহার লক্ষ্যও ছিল নিজামের অধীনে হায়দরাবাদে পূর্ণ দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন। কেবলমাত্র শেষ আন্দোলনে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হইবার দাবী মুখ্য হইয়া উঠে।

হায়দরাবাদের চরম অনগ্রসর সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কেও রাজ্যের অভ্যন্তরে মৌলিক মতবিরোধ বিদ্যমান। ষ্টেট্

কংগ্রেসের কর্ম্মসূচীর মধ্যে রাজনৈতিক পুনর্গঠনই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনে আস্থাবান ষ্টেট্ কংগ্রেস হায়দরাবাদের লক্ষ লক্ষ হৃতদরিদ্র, শোষণ-পিষ্ট কৃষকের অর্থনৈতিক সমুন্নতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলন করেন নাই। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বাধীনে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে অন্ধ্র মহাসভা। প্রচণ্ড বাধা ও পাশবিক নিপীড়নে ভ্রূক্ষেপহীন তেলেঙ্গানার কিষাণ কিষাণী অপূর্ব্ব সংগঠন এবং অটুট সঙ্কল্পের বলে নিজামী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন প্রতিরোধ চালাইয়া হায়দরাবাদের সহস্রাধিক গ্রামে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। সরকারী পীড়নযন্ত্র প্রয়োগ করিয়া এবং হিংস্র রাজাকর দস্যুদলকে লেলাইয়া দিয়া গ্রামের পর গ্রামে আগুন লাগাইয়া, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, পীড়ন ও বধ-বন্ধনের পাইকারী বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া স্বৈরাচারী নিজাম কিম্বা তাহার সামন্ত পার্শ্বদগণ এই জঙ্গী কিষাণ আন্দোলনের মেরুদণ্ড বক্র করিতে পারেন নাই। অত্যাচার সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করিয়াছে। তেলেঙ্গানা এখনও উন্নত শিরে বাঁচিয়া আছে। দক্ষিণাপথের এই বিদ্রোহী কিষাণ শক্তি কেবল নিজাম বংশের উচ্ছেদই চাহে না; তাহারা দাবী করে যে, তেলেঙ্গানার আদর্শে গোটা হায়দরাবাদকে গড়িয়া তোলা হউক— নিজামের সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত করিয়া হায়দরাবাদে পূর্ণ গণরাজ প্রতিষ্ঠিত করা হউক।

কিন্তু তেলেঙ্গানার এই নয়া গণতান্ত্রিক আদর্শ বাঁচিবে এবং পরিপুষ্টি লাভ করিবে এমন ভরসা করা যায় না। ভারত সরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যে অভিযান চালাইয়াছেন তাহা শাঁখের করাতের মত। একদিকে উহা যেমন হায়দরাবাদের মুসলিম সামন্ত শাসক-গোষ্ঠীর চক্রান্তজাল ছিন্নভিন্ন করিয়াছে; অপরদিকে এই শান্তি

অভিযান তেমনি হায়দরাবাদের কিষাণ আন্দোলনকে আঘাত করিতেছে। ভারত সরকারের শান্তি অভিযানের লক্ষ্য সাবেক স্বাভাবিক অবস্থাকে ফিরাইয়া আনা। কিন্তু নিজামী শক্তির বিরুদ্ধে লড়িয়া তেলেঙ্গানার চাষী যে নয়া সামাজিক বুনিয়াদ রচনা করিয়াছে ভারতীয় সামরিক শাসনে তাহা নিরাপদ থাকিবে বলিয়া আশ্বস্ত হইতে না পারিলে তাহারা নূতন শাসন ব্যবস্থারও প্রতিরোধ করিবে ইহা জানা কথা। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, ভারত সরকার যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন তদনুযায়ী তাঁহারা তেলেঙ্গানার এই বিপ্লবলব্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়া নিতে পারেন না। ইহার ফলে হায়দরাবাদের অন্যান্য অংশে ইতিমধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলেও তেলেঙ্গানার জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ঈপ্সিত শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতেছে না।

দেশীয় রাজ্য সচিব সর্দ্দার প্যাটেল অবশ্য বলিয়াছেন যে হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ হায়দরাবাদের জনসাধারণই স্থির করিবে। ইহা নীতির কথা। কিন্তু হায়দরাবাদে আজ যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে রাজ্যটির রাজনীতি যে জাতীয় সরকারের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হইবে ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। রাজ্যটির ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে তাঁহারা যে নিজাম রাজবংশের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করার দাবী সমর্থন করিবেন পণ্ডিত নেহরুর স্পষ্টোক্তি এবং জাতীয় সরকারের দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত নীতি অনুধাবন করিলে তাহাতে সংশয় থাকে না। প্রধান মন্ত্রী নেহরু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, হায়দরাবাদকে ভাঙ্গিয়া ফেলার কথা আপাততঃ চিন্তা করা যায় না। "হায়দরাবাদের অস্তিত্ব (স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব) লোপ পাইলে দক্ষিণ ভারতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।"

নেহরুজীর উক্তির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে ভারত সরকার এ পর্য্যন্ত যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তদনুযায়ী তাঁহারা হায়দরাবাদের মত বৃহৎ একটি রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে সম্মত হইতে পারেন না। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যত বৃহৎ রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন তাহার কোনটির শাসকবংশকে অপসৃত করা হয় নাই। কিম্বা ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত হইবার যোগ্য হইলেও তাহাদের ভাঙ্গিয়া লওয়া হয় নাই। কাজেই হায়দরাবাদ সম্পর্কে এই নীতির ব্যতিক্রম করা সম্ভব নহে। আজ যদি হায়দরাবাদকে ভাষার ভিত্তিতে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তবে তদনুযায়ী স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হিসাবে অনুমোদিত আরও কয়েকটি রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করা কিম্বা তাহাদের বিভক্ত করা প্রয়োজন হয়। এমনকি জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ক্রমে যে কয়েকটি ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে তাহাদেরও পুনর্ব্বার পুনর্গঠন করা দরকার। ভারত সরকার তাঁহাদের মূলনীতিকে এতটা পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইবেন না। দ্বিতীয়তঃ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রাংশ হইবার যোগ্য রাজ্যের পুনর্গঠন সম্পর্কে শাসক ও শাসিতের যুক্ত সম্মতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকারী নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে। স্বাধীনতালুব্ধ নিজাম হায়দরাবাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপে সম্মতি দিবেন কি?

প্রকৃত পক্ষে, ভারত সরকার নিজামকে বাঁচাইয়া যে পদ্ধতিতে অভিযান চালাইয়াছেন এবং হায়দরাবাদে ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও নিজাম ওসমান আলী যেভাবে গদীয়ান আছেন তাহাতে হায়দরাবাদকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পক্ষে নেহরু গবর্ণমেণ্টের সম্মতি কোন ক্রমেই আশা করা যায় না। অধিকন্তু, হায়দরাবাদকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দাবী ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রাংশ গঠনের দাবীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারত রাষ্ট্রের অন্যত্র এই ভিত্তিতে

রাষ্ট্রাংশ গঠন করিতে তাঁহারা যখন সম্মত হইতেছেন না তখন হায়দরাবাদে এই নীতি প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায় ?

অন্যান্য সমস্ত রাজ্যকে যে ছাঁচে ঢালা হইয়াছে হায়দরাবাদকেও আপাততঃ সেই ভাবেই পুনর্গঠন করা হইবে। মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি এবং বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ রক্ষিত সমভাষাভাষী এবং সম সংস্কৃতিবান ভারতবাসীর কৃত্রিম রাজনৈতিক বিশ্লিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই হায়দরাবাদের শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন হইবে। এই পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে ওসমান আলীর পক্ষে গদীয়ান থাকা এত ঘটনার পর সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু নিয়মানুগ শাসক হিসাবে লোকায়ত্ত শাসনব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করিবার মত বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন সুচতুর উত্তরাধিকারীর অভাব নিজাম বংশে হইবে বলিয়া মনে হয় না।

একাদশ অধ্যায়

কাশ্মীর

জুনাগড়ের মুক্তিফৌজ প্রসঙ্গে পাকিস্তান একাধিকবার অভিযোগ করিয়াছে যে, এই স্বেচ্ছাসৈনিকদল ছদ্মবেশী ভারতীয় ফৌজ। এই অভিযোগের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য তখনই সুস্পষ্ট হইল যখন ভারতবাসী অবাক বিস্ময়ে শুনিল যে পাকিস্তানী অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান এবং পাকিস্তানেরই যানবাহনে চড়িয়া শত শত ধর্ম্মোন্মাদ উপজাতীয় দস্যু পাকিস্তানী সেনানীদের পরিচালনায় প্লাবনের মত কাশ্মীরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে এবং হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও গৃহদাহের তাণ্ডবে নরক সৃষ্টি করিয়া হানাদাররূপী এই নরপশুদল সমগ্র কাশ্মীর গ্রাস করার অন্ধ নেশায় শ্রীনগর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। মহারাজার সৈন্যদল কোথাও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল কিম্বা প্রতিরোধ করিতে গিয়া কোথাও নিশ্চিহ্ন হইল। সমূহ বিপদ দেখিয়া মহারাজা সদলবলে সুরম্য কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য জম্মু সহরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অরক্ষিত কাশ্মীরবাসী কম্পিত বক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তে চরম বিপদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম কয়েকদিনের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া মনে হইয়াছে জুনাগড়ে হতমান পাকিস্তান কাশ্মীরে সত্যই বুঝিবা পাশবিক বলপ্রয়োগে কৃতকার্য্য হইবে। কায়েদে আজম জিন্না আগেই সব কিছু চুকাইয়া দুনিয়ার সমক্ষে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, কাশ্মীর রাজ্য পাকিস্তানে যোগদান করিয়াছে।

জুনাগড় সমস্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া উপজাতীয় হানাদাররূপে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণ কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। পণ্ডিত

জওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীর এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন (৬ই নভেম্বর, ১৯৪৭), "কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষকে জুনাগড় মংগ্রোল ও বাবরিয়াবাদের সমস্যা সমাধান করিতে হইয়াছে এবং যখন সে এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল তখন কাশ্মীর সমস্যা দেখা দেয়। কাশ্মীর সমস্যা আরও গুরুতর, এবং ইহা সুস্পষ্ট যে, ভারত সরকারের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং কাশ্মীর আক্রমণের জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল তাহা গোপন করার জন্য জুনাগড়কে ব্যবহার করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের ইহা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, গত কয়েকমাস ধরিয়াই কাশ্মীর আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন করা হইতেছিল।"

এই উদ্যোক্তা কাহারা এবং কেনই বা তাহারা শস্ত্রবলে কাশ্মীর করতলগত করার চেষ্টা করিয়াছে ?

হিমালয়ের বক্ষদেশে অবস্থিত নয়নাভিরাম কাশ্মীর সত্যই ভূস্বর্গ। প্রাকৃতিক দিক হইতে রাজ্যটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) তিব্বতী এবং আধা-তিব্বতী অঞ্চল—রুদখ্ এবং গিলগিট জিলা এই অঞ্চলে অবস্থিত ; (২) ঝিলাম উপত্যকা ; জগদ্বিখ্যাত হ্যাপী ভ্যালি ইহার অন্তর্ভুক্ত ; (৩) পাহাড়িয়া এবং আধা-পাহাড়িয়া অঞ্চল—রাজ্যটির শীত কালীন রাজধানী জম্মু এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। কাশ্মীরের সুরম্য পর্ব্বতমালা, ইহার নয়ন মুগ্ধকর স্রোতস্বতী, হ্রদ ও দৃশ্যাবলী কাশ্মীরকে পর্য্যটকদের মক্কার মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। কাশ্মীরের খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর বুকে নিহিত আছে বিস্ময়কর জল-বিদ্যুৎশক্তি। ইহার উর্ব্বর মাটিতে অফুরন্ত ফসল ও ফলফুল উৎপন্ন হইতে পারে, আর কাশ্মীরের পর্ব্বতগাত্রে বিরাজিত প্রচুর বনসম্পদ। স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরসহ খনিজ সম্পদেও কাশ্মীর ঐশ্বর্য্যশালিনী। অধিবাসীরা হতদরিদ্র কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী।

কারুশিল্পে সমগ্র এশিয়ায় কাশ্মীরীদের তুলনা মেলা না। যুদ্ধের পূর্ব্বে গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের হিসাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সাধারণ একজন কাশ্মীরীর আয় ভারতের অন্যান্য স্থানের গড়পড়তা আয়ের এক পঞ্চমাংশ মাত্র। সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের যুগ্ম শোষণই যে এই দুরবস্থার হেতু তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। ভারতের এই বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের (৮২,২৫৮ বর্গ মাইল) মোট অধিবাসী সংখ্যার (৪,০২১,৬১৬—১৯৪২ সালের আদমশুমারী) মধ্যে শতকরা ৭৬'৪ জন মুসলমান। সামন্ত শাসক হিন্দু,—শুধু তাহাই নহে, কাশ্মীরীর মতে বিদেশী। সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রভুত্বে বিশ্বাসী ডোগরা রাজবংশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষাশ্রয় করিয়া বিদেশী ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের সাহায্যে প্রায় একশত বৎসর কাশ্মীরী জনসাধারণকে শোষণ ও শাসন করিতেছে[১]। হায়দরাবাদের শাসন ব্যবস্থায় মুসলিম প্রভুত্বের যে চিত্র পরিলক্ষিত হয়, কাশ্মীরে হিন্দু প্রভুত্বের অবিকল সেই চিত্রই পাওয়া যাইত।

গণ-আন্দোলনের জন্ম

বর্ত্তমান শতাব্দীর চতুর্থপাদে সমগ্র ভারত যখন গণ-তান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের তরঙ্গাভিঘাতে আন্দোলিত হইতেছিল সেই সময়ে এক মুসলিম শাল ব্যবসায়ীর উচ্চশিক্ষিত পুত্র গণতন্ত্র ও জাতীয়তার আদর্শে কাশ্মীরে এক রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। শেখ আব্দুল্লা

(১) রাজ্যের স্বাভাবিক সৈন্য সংখ্যা (অতিরিক্ত সহ) ১০, ২৯৭। কেবলমাত্র ডোগরা, গুর্খা, কাঙ্গরা রাজপুত এবং পাঞ্জাবী জাঠ শিখ লইয়া ইহা গঠিত। ১৯৪৫-৪৬ সালে সেনাবাহিনীর জন্য প্রায় ১০২'৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সেনাবাহিনীতে কাশ্মীরী একরূপ নাই একথা অবগত হইয়া গান্ধীজী নাকি মহারাজাকে বলেন,—এখন বুঝিতেছি শেখ সাহেব কেন আপনাকে বিদেশী শাসক বলেন।"

প্রথমে মুসলিম স্বার্থের মুখপাত্র হিসাবেই রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সরকারী চাকুরীতে বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া শেখ সাহেব যে বিরোধী দল গঠন করেন অচিরেই তাহা স্থানীয় মুসলিম আলিম উলেমা এবং নবজাগ্রত শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। আন্দোলন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দলে দলে জনসাধারণ আসিয়া আব্দুল্লার সঙ্গে যোগ দেয়। মুসলিম জাগরণে সন্ত্রস্ত ডোগরা শাসক-গোষ্ঠি ১৯৩১ সালে আব্দুল্লাকে কারারুদ্ধ করেন এবং সরকারী উৎপীড়নে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত এক বিভীষিকাময় অবস্থা চলে। অতঃপর এক তদন্ত কমিশনের সুপারিশক্রমে শাসনব্যবস্থার সামান্য চুণকাম করা হয়। পূর্ব্বে শাসন পরিচালনায় জনপ্রতিনিধিত্বের বালাই ছিল না; কিন্তু এক্ষণে সামান্য প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইল এবং কয়েকটি চাকুরীর দ্বার মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত হইল। কারামুক্ত হইয়া শেখ সাহেব এবং তাহার সহকর্ম্মিগণ এই সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য চাপ দিবার উদ্দেশ্যে মোসলেম কনফারেন্স নামে একটি দল গঠন করেন।

তখনও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন গঠিত হয় নাই। এই নূতন ব্যবস্থায় কয়েকজন মুসলিম অফিসার নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু জনগণের দুর্দ্দশার বিন্দুমাত্র লাঘব হইল না। শেখ সাহেব ক্রমেই উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, স্বৈরাচারী ডোগরা শাসনের পরিবর্ত্তে লোকায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত না হইলে কাশ্মীরীদের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই অনুভূতি হইতেই অসাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের আদর্শবাদী কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের জন্ম। কাশ্মীরীদের দৃষ্টিতে গান্ধী-নেহরু এবং মহম্মদের প্রতীক শেখ আব্দুল্লার জীবনে ইহা এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। জাতীয়তাবাদী

হিসাবে রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করিয়া বহু ভারতবাসী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ক্ষেত্রে পসার জামাইয়াছেন। কিন্তু শেখ আব্দুল্লা এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। ভারতের রাজনীতিতে একমাত্র তিনিই বোধহয় সাম্প্রদায়িক মুখপাত্র হিসাবে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হইয়া জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হইয়াছেন এবং শত ঝাড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও নিজের বিশ্বাসে অটল আছেন।

এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শেখ আব্দুল্লা জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। কাশ্মীরী জনগণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই জনপ্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তি এবং সর্ব্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা সামন্ত প্রভু এবং বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী উভয়কেই সমান সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। ১৯৪৪ সালে জাতীয় সম্মেলন নয়া কাশ্মীর নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং ঐ পুস্তিকায় তাহারা কাশ্মীরকে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে পরিণত করার এবং উহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শোষণ বন্ধ করিয়া জনগণের জীবন যাত্রার মান সমুন্নত করার আহ্বান জানায়। শেখ সাহেব অকুণ্ঠভাবে সোবিয়েত সমাজ ব্যবস্থার প্রশংসাবাদও করিতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী আব্দুল্লার এই সোবিয়েত প্রীতি মহারাজার চাইতে বিলাতের-সাম্রাজ্যবাদী টোরী প্রভুদের আরও বেশী শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কাশ্মীর সীমান্তে মহাচীন এবং সোবিয়েত রাশিয়া এই দুইটি রাষ্ট্রের সীমান্ত মিলিত হইয়াছে। কাজেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং ষ্ট্রাটেজিষ্টগণ কাশ্মীরকে "নিরাপদ হস্তে" রাখার জন্য অতিমাত্রায় উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শঙ্কিত ডোগরা রাজ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রভু মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে বন্ধু খুঁজিয়া পাইলেন। ভারত

বিভাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলিম কনফারেন্সের নেতৃবৃন্দ বরাবর জাতীয় সম্মেলনের বিরুদ্ধে সামন্ত শাসককে সাহায্য করিয়াছে। পণ্ডিত রামচন্দ্র কাকের প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে মুসলিম লীগের সহিত ডোগরা শাসক গোষ্ঠীর মিতালী ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। লীগনেতৃত্ব মনে করিয়াছিলেন যে, জাতীয় সম্মেলনের ভয় দেখাইয়া ডোগরা শাসকগোষ্ঠীকে যদি হাতের মুঠোয় রাখা যায় তবে পাকিস্তান লাভের পরে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কাশ্মীর কুক্ষিগত করিতে আদৌ কষ্ট হইবে না। বলা বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদীরাও ভারতের এই অসামান্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল লীগ-কুক্ষিগত করাইতে পারিলে নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিতেন। এই কারণেই, ১৯৪৬ সালের মে মাসে জাতীয় সম্মেলনের সহিত যখন মহারাজার সংঘর্ষ দেখা দেয় তখন বিভীষিকাময় পীড়ন দ্বারা জাতীয় সম্মেলনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হইয়াছে। নয়াদিল্লীতে তখন ক্ষমতা হস্তান্তরের আলাপ আলোচনা চলিতেছে। কাজেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পূর্ব্বে জাতীয় সম্মেলনের মেরুদণ্ড যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া না যায় তবে কাশ্মীর নিরাপদ হস্তে থাকে না যে!

সাম্রাজ্যবাদীর অভীষ্ট সাধনে মুসলিম লীগের প্রধান সহায় ছিল রাজনৈতিক বিভাগের দালাল কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র কাক। ১৯৪৭ সালে ৯ই জুলাই জিন্নার সেক্রেটারী মিঃ খুরশীদ মুসলিম লীগের কাশ্মীর শাখার নেতা শওকৎ আলীকে যে পত্র লেখেন তাহা দ্বারা এই গোপন মিতালীর কথা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয়। মিঃ খুরশীদ লেখেন—"বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের একমাত্র মিত্র (অবশ্যই উদ্দেশ্য সাধনের বন্ধু) কাক। আপনি কাককে কাজ করার সুযোগ সুবিধা দিবেন, কেননা তিনিই আমাদের সঙ্গে যে কোন ব্যবস্থা করিবেন।"

ঘটনার গতি-পরিবর্ত্তন

কিন্তু ঘটনা প্রবাহে ভারত বিভাগের সম্ভাবনা যতই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল মহারাজা ততই অশ্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উলঙ্গ আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া হিন্দুপ্রভুত্ব এবং হিন্দুপ্রাধান্যে আস্থাবান ডোগরা শাসক গোষ্ঠী আর লীগের মিত্রতার উপর নির্ভর করা নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। মিঃ জিন্না মহারাজাকে স্বাধীন হইতে দিতেও সম্মত ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, এই প্রলোভন দিয়া মহারাজাকে যদি ভারতীয় ডোমিনিয়ন হইতে দূরে রাখা সম্ভব হয় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ক্ষেপাইয়া কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা কষ্টকর হইবে না। মহারাজা এই চালে প্রলুব্ধ হইতে সাহসী হইলেন না। কারণ একদিকে তিনি যেমন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরুদ্বেগ হইবার ভরসা পাইতেছিলেন না; অপর দিকে জাতীয়-সম্মেলনের মতামত উপেক্ষা করিয়া সরাসরি একটা কিছু করিবার মত সাহসও তাহার ছিল না। জাতীয় সম্মেলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অকুণ্ঠ সমর্থক। সামন্ত স্বৈরাচারকে তাহারা যেমন ঘৃণার চক্ষে দেখে, সাম্প্রদায়িকতাকেও তেমনি ঘৃণা করে। বৎসরাধিক কাল অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইয়া এবং শত শত কর্ম্মীকে কারারুদ্ধ করিয়াও মহারাজার গবর্ণমেণ্ট জাতীয় সম্মেলনের তৎপরতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই। প্রকাশ্য আন্দোলনের দ্বার রুদ্ধ হইলে গোপন তৎপরতার দ্বারা জাতীয় সম্মেলনে কর্ম্মিবৃন্দ দলীয় আদর্শ সমুড্ডীন রাখিয়াছে। অবশ্য জাতীয় সম্মেলনের নিকটও মহারাজার বিশেষ কোন আনুকূল্য লাভের আশা ছিল না। সম্মেলন প্রথমে "কাশ্মীর ছাড়ো" ধ্বনির যে অর্থ করিয়াছিল তদনুযায়ী ডোগরা শাসককে প্রকৃতই

কাশ্মীর ছাড়িতে হয়। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু কাশ্মীর সফরে গিয়া জাতীয় সম্মেলনকে এই ধ্বনির নূতন ব্যাখ্যা করার পরামর্শ দিয়াছিলেন যাহার ফলে নিয়মানুগ শাসক হিসাবে মহারাজার অস্তিত্ব রক্ষা হইতে পারে। কাশ্মীর ছাড়ো ধ্বনি পরে অবশ্য এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহারাজার পক্ষে এ এক উভয় সঙ্কট পরিস্থিতি। নিজের মূঢ়তা এবং হঠকারিতার ফলে উদ্ভূত এই বিভ্রান্তিকর অবস্থা হইতে ত্রাণ লাভের জন্য মহারাজা কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী এবং মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। কৃপালনী মে মাসে (১৯৪৭) সস্ত্রীক কাশ্মীরে যান। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি মহারাজার পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যে ওকালতী করেন এবং জাতীয় সম্মেলনের কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলনের যেরূপ সমালোচনা করেন তাহা কাশ্মীর এবং ভারতের জনমত হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আচার্য্য কৃপালনীর এই সমালোচনা এবং সরকারী মহলের সহিত তাঁহার দহরম মহরম জাতীয় সম্মেলনের কর্ম্মিবৃন্দের মনে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার করে। আগষ্ট মাসে গান্ধীজীর কাশ্মীর সফরে এই ক্ষোভ প্রশমিত হয়। গান্ধীজী কাশ্মীরে গিয়া জাতীয় আন্দোলনের কর্ম্মীদের সঙ্গে খোলা-খুলিভাবে আলাপ আলোচনা করেন। কৃপালনী মহারাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁহার শৈলাবাসে ছুটিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁহাদের ছুটিয়া আসিতে হয়। পণ্ডিত কাক ও মহারাজা উভয়েই গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা করেন। মহারাজা মিটমাটের আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তৎপূর্ব্বে শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে হইবে। উত্তরে গান্ধীজী বলেন—"আপনার প্রজারা যদি আপনাকে চাহে তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্ততঃ বলিব না যে, আপনি চলিয়া যান। আপনি যদি প্রজাদের হৃদয় জয় করিতে পারেন

তবে শেখ আবদুল্লা আপনাকে কাশ্মীর ছাড়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারিবেন না।"

পণ্ডিত কাক গান্ধীজী সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, কাশ্মীরে গণভোট গৃহীত হইলে কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগ দিবে কেননা অধিকাংশ কাশ্মীরীই মুসলমান। তদুত্তরে গান্ধীজী বলেন—"যোগ দেয় দিক্। জনগণ যদি পাকিস্তান চাহে, তবে অবশ্যই তাহাদের রায় মানিতে হইবে।" কাশ্মীর সফর শেষ করিয়া ওয়াতে (৫ই আগষ্ট ১৯৪৭) এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলেন যে, আইনের দৃষ্টিতে ১৫ই আগষ্ট কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য স্বাধীন হইবে। কিন্তু রাজ্যটি ঐ ভাবে বেশীদিন থাকিতে পারিবে না বলিয়াই তাঁহার স্থির বিশ্বাস। ভারতীয় ইউনিয়ন কিম্বা পাকিস্তান ইহার যে কোন একটির সহিত রাজ্যটিকে যোগদান করিতে হইবে। কাশ্মীর এবং জম্মুতে কাশ্মীরীদের মতামতই সর্ব্বোচ্চ আইন। তিনি ঘোষণা করেন যে, মহারাজা ও মহারাণী উভয়েই বিনা দ্বিধায় ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইয়াছেন। মহারাজার পক্ষ হইতে গান্ধীজীর এই উক্তির কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই।

গান্ধীজীর সফরে সুফল ফলিল। কাশ্মীর রাজনীতির চাকা আবার ঘুরিতে আরম্ভ করিল। গান্ধীজীর কাশ্মীর ত্যাগের তিনদিন পরেই পণ্ডিত কাক পদচ্যুত হইলেন। বহিষ্কৃত জাতীয় সম্মেলনের নেতা বক্সী গোলাম মহম্মদ রাজ্যে পুনঃ প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। শেখ সাহেবকে কারাগার হইতে শ্রীনগরে আনিয়া অন্তরীণ রাখা হইল। মাঝে মাঝে মহারাজার দূত নয়াদিল্লী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল।

জিন্না বুঝিলেন ঘটনার গতিক সুবিধার নয়। এই অবস্থায় কোনরূপ জনমত গৃহীত হইলে আবদুল্লার প্রভাব-মুগ্ধ কাশ্মীর যে পাকিস্তানে যোগ দিবে না ইহা সুনিশ্চিত। কাজেই তিনি ভিন্ন পথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জোর করিয়া কাশ্মীরকে কুক্ষিগত

করিবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। মোটর চলাচলের উপযোগী দুইটি সড়ক—ঝিলাম ভ্যালী রোড এবং বানিহাল কার্ট রোড দ্বারা কাশ্মীর অবিভক্ত ভারতের রেলপথের সহিত যুক্ত ছিল। দুইশত মাইল দীর্ঘ বানিহাল রোড রাজ্যটির গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর এবং শীতকালীন রাজধানী জম্মুকে যুক্ত করিয়াছে। ঝিলাম ভ্যালী রোডের ১৩২ মাইল রাস্তা রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে কাশ্মীর ভারত হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কাশ্মীর প্রবেশের প্রধান প্রধান সব কয়টি পথই পড়িল পাকিস্তানের এলাকায়। মহারাজা পাকিস্তানের সহিত সাময়িক ভাবে এক স্থিতাবস্থা চুক্তি করিলেন। কিন্তু ভৌগোলিক সুবিধা গ্রহণ করিয়া লীগ রাষ্ট্র-নায়কগণ স্থিতাবস্থা চুক্তি সর্ত্ত পালনে অসুবিধা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের এই আচরণের বিরুদ্ধে মহারাজার গবর্ণমেণ্ট তারযোগে প্রতিবাদ জানাইলেন। মহারাজার গবর্ণমেণ্ট জানাইলেন যে, স্থিতাবস্থা চুক্তির গুরুত্ব পূর্ণ সর্ত্ত পূরণে বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে এবং কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়া মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কান হইতেছে। তারে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের এই আচরণকে "কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য শত্রুতাচরণ বলিয়া গণ্য না করিলেও নিতান্ত অবন্ধুজনোচিত কাজ বলিয়া মনে করে।" এই তারে পুঞ্চের অমুসলমানদের উপর বহিরাগত আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলমানের অত্যাচারের কথাও উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত এই তারের জবাবে মিঃ জিন্না এক তারযোগে (২০-১০-৪৭) সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, স্থিতাবস্থা চুক্তি সর্ত্ত পূরণে যদি কোন অসুবিধা দেখা দিয়া থাকে তাহার জন্য পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট দায়ী নহে—দায়ী পশ্চিম পাঞ্জাবের বিশৃঙ্খল অবস্থা। বন্ধুভাবে আলোচনা করিয়া অসুবিধা দূর করার জন্য

মিঃ জিন্না কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীকে করাচী আসিবার আমন্ত্রণ করেন। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় কাকের মারফতে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের কুক্ষিগত করার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তানী রাষ্ট্র-পরিচালকগণ অর্থনৈতিক অবরোধ দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় ছিলেন। এই অবস্থায় মহারাজার প্রধানমন্ত্রী করাচী গেলে এবং পাকিস্তানের দাবী মানিতে অস্বীকার করিলে কোন সুরাহা হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

হানাদারদের আবির্ভাব

যাহা হউক, অচিরেই ঘটনার গতি ভিন্নরূপ ধারণ করিল। লীগ নেতারা বুঝিয়াছিলেন যে, হুমকি বা অর্থনৈতিক অবরোধ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি নাও হইতে পারে। তাই সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী বন্ধুদের পরামর্শে সামরিক বলপ্রয়োগ করিয়া চট্‌পট্‌ তাহারা অভীষ্ট লাভের পরিকল্পনা করিলেন। উভয় পাঞ্জাবের হত্যালীলা তখন তাহাদের খানিকটা সাহায্য করে। পশ্চিম পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর ফলে শত শত অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থী সন্নিহিত জম্মু প্রদেশে প্রবেশ করে এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের মূঢ় নেশায় জম্মু প্রদেশের মুসলমানদের উপর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদিগণ এবং নবাগত শরণাগতগণ যুক্তভাবে কিছু অত্যাচার করে। মহারাজার পুলিশ ও সৈন্যদলের মধ্যে কিছু লোকও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মূঢ় প্রতিশোধ গ্রহণে যোগ দেয়। এই ঘটনার ফলে এই অঞ্চলের কিছু কাশ্মীরী মুসলমান প্রাণ-ভয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। অনেকে উভয় পাঞ্জাবের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়াও বাস্তুত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। এই পলাতক কাশ্মীরীরা পাকিস্তানে গিয়া ডোগরা বাহিনীর অত্যাচারের অলীক কিম্বা অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা করিতে থাকে। পূর্ব্ব পাঞ্জাবের

ঘটনাবলীর অতিরঞ্জিত বিবরণ পশ্চিম-পাঞ্জাবের মুসলমানদের মস্তিষ্ক ইতিপূর্ব্বেই উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল; পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট স্বকীয় উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত্র হিসাবে এই পুঞ্জীভূত ক্রোধকে ব্যবহার করেন। কাশ্মীর আক্রমণ রাতারাতি "জেহাদ" আখ্যা লাভ করে। ২৫শে অক্টোবর মহারাজার সহকারী প্রধানমন্ত্রী মিঃ আর, এস বাঁটরা নয়াদিল্লী হইতে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান বাহিনীর বিদায়াভোগী একদল আফ্রিদি সৈন্য গত ২২শে অক্টোবর আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এক শত লরীযোগে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়াছে। এই হানাদার দলের মধ্যে ছিল লুণ্ঠনলুব্ধ সীমান্তের উপজাতীয়, পুঞ্চ ও পাকিস্তানের প্রাক্তন-সৈনিক, পাকিস্তানের বিদায়ীভোগী সৈন্য এবং কাশ্মীর ফৌজের পলাতক কিছু সৈন্য।

সীমান্ত অঞ্চলে শাসন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভীতিপ্রদর্শন এবং উৎকোচ প্রদানের দ্বৈত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামরিক রক্ষাব্যূহ রচনার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতীয় সর্দ্দারদের বকশিস্ এবং উপঢৌকন দ্বারা বশীভূত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এজন্য প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। দেশ বিভাগের পরে এই দায় পাকিস্তানের উপর বর্ত্তিল। কিন্তু তাহার পক্ষে এই ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করা সহজসাধ্য নহে। অতএব উপজাতীয়দের অসন্তুষ্ট না করিয়া দায় এড়াইবার জন্য কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হইল। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট ডুরাণ্ড লইনের ফটক উন্মুক্ত করিয়া দিলেন—উপজাতীয়দের পাকিস্তানের যতত্র বসবাসের অধিকারও দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে বকশিস এবং উপঢৌকন প্রথা বজায় রাখা হইবে বলিয়াও আশ্বাস দেওয়া হইল। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে উপজাতীয় অঞ্চলে দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা

দেয়। পাঞ্জাব ও সীমান্ত অঞ্চলের অশান্তি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা এই সঙ্কট তীব্রতর করে। আগষ্ট মাসে গোটা পশ্চিম পাকিস্তানে যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়। সেই সময়ে লুণ্ঠনলুব্ধ উপজাতীয়গণ দলে দলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে ঢুকিয়া পড়ে এবং এই দুর্দ্ধর্ষ উপজাতীয়দের যথেচ্ছ আচরণ এই অঞ্চলের মুসলিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। শোনা যায়, উপজাতীয়গণ একসময়ে লাহোর পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল। অপরিমিত লুণ্ঠনের আশায় প্রলুব্ধ করিয়া পাকিস্তানী রাষ্ট্রপরিচালকগণ জেহাদের নামে এই ধর্ম্মোন্মাদ, অশিক্ষিত, সরল বিশ্বাসী উপজাতীয়দের দৃষ্টি কাশ্মীরের প্রতি নিবদ্ধ করিলেন।

মজঃফরাবাদ ভস্মীভূত করিয়া পাকিস্তানী সেনানীদের পরিচালনাধীনে সর্ব্বপ্রকার আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হানাদারগণ প্লাবনের বেগে ডোমেল-বারামূলা রাস্তা ধরিয়া শ্রীনগর অভিমুখে ধাবিত হইল। ক্ষীণবল কাশ্মীরী ফৌজের প্রতিরোধ তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিতে পারিল না। সীমান্ত অতিক্রমের চারদিনের মধ্যেই হানাদার দস্যুগণ শ্রীনগরের পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী মাহুরা বিদ্যুৎ সরবরাহকেন্দ্র দখল করিল—রাজধানী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বারামূলা ও শ্রীনগর উভয় সহরই সমূহ বিপদের সম্মুখীন হইল।

মহারাজা প্রমাদ গণিলেন। সরকারী ফৌজ দ্বারা প্রবল শত্রুকে রুখিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। অপর পক্ষে, প্রজাদের সাহায্যে গণপ্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার মত প্রভাব প্রতিপত্তিও তাহার ছিল না। ডোগ্‌রা রাজের বিরুদ্ধে কাশ্মীরী জনগণের বিদ্বেষ কাশ্মীর ছাড়ো আন্দোলন দমনের উৎপীড়নে আরও বৃদ্ধি পায়। পুঞ্চ অঞ্চলের মুসলমানদের উপর ডোগরা সৈন্যদল যে অত্যাচার করে তাহার ফলেও মহারাজার প্রতি ঘৃণা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই অবস্থায়

সমূহ বিপদের মুখে ভারতীয় ইউনিয়নের শক্তিই ছিল তাহার একমাত্র ভরসা। মহারাজা কাশ্মীরের বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া ভারতের সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কাশ্মীর তখনও ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করে নাই; কাজেই ভারতের পক্ষে মহারাজার সাহয্যার্থে আগাইয়া আসা সম্ভব ছিল না। মহারাজা অবশ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতেও সম্মত হইলেন। তথাপি একমাত্র মহারাজার আবেদনের উপর নির্ভর করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিপদের ঝুঁকি লইতে রাজী হইলেন না। তখন কাশ্মীরকে বাচাইতে হইলে সুদৃঢ় গণপ্রতিরোধ সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। স্থলপথে ভারতের সহিত কাশ্মীরের নির্ভরযোগ্য যোগাযোগের পথ ছিল না। রাজ্যের মধ্যে যদি গণপ্রতিরোধ গড়িয়া তোলা না যায় তবে বিমান পথে সৈন্যরসদ প্রেরণ করিয়া পাকিস্তানের সাহায্যে বলীয়ান হানাদারদের বিতাড়িত করা সম্ভব নাও হইতে পারে। আর তাছাড়া জনসমর্থন ব্যতীত ভারতীয় ফৌজ যদি মহারাজার সমর্থনে আগাইয়া যাইত তবে উহা হিন্দু প্রভুত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা বলিয়া অভিহিত হইত এবং তাহার ফলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়া পাকিস্তানের পক্ষে উদ্দেশ্য সাধন করা সহজতর হইত। অতএব, একপক্ষে যেমন জনসমর্থন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন গণপ্রতিরোধ গড়িয়া তোলার জন্য গণ-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

ভারত রাষ্ট্রে যোগদান

মহারাজা ২৬শে অক্টোবর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি জানান যে, অবিলম্বে অন্তর্বর্ত্তী কালীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া এই জরুরী অবস্থায় তাহার প্রধানমন্ত্রীর সহযোগে শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য শেখ আব্দুল্লাকে তিনি আমন্ত্রণ

জানাইতেছেন। মহারাজার পত্রে ইহাও বলা হয় যে, ভৌগোলিক দিক হইতে আমার রাজ্য পাকিস্তান ও ভারত উভয় ডোমিনিয়নের সংলগ্ন। উভয়ের সঙ্গেই ইহার ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আছে। তাছাড়া আমার রাজ্যের সহিত সোবিয়েত সাধারণতন্ত্র এবং চীনের সীমান্তও মিলিত হইয়াছে। বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে পাকিস্তান বা ভারতীয় ডোমিনিয়ন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করিতে পারে না। আমি কোন ডোমিনিয়নে যোগ দিব স্থির করিবার জন্য কিছু সময় লইতে চাহিয়াছিলাম : কিম্বা কাহারও সহিত যোগ না দিয়া উভয়ের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া আমার পক্ষে স্বাধীন হওয়া উভয় ডোমিনিয়নের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে কিনা তাহা চিন্তা করিতেছিলাম। তদনুযায়ী আমি উভয় ডোমিনিয়নের সহিত স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদনের আবেদন করি। পাকিস্তান স্থিতাবস্থা চুক্তি করে : কিন্তু ভারত আমার গবর্ণমেণ্টের সহিত আরও আলোচনা চালাইতে চাহে। পরবর্ত্তী ঘটনাচক্রে আমার পক্ষে আর আলোচনা চালান সম্ভব হয় নাই।"

মহারাজা আরও বলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে ভারতীয় ইউনিয়নে যেগদান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই ; কেননা ইহা না করিলে কাশ্মীরকে লুণ্ঠনকারী দস্যুদলের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হয়।

ভারত সরকার মহারাজার আবেদনপত্র সর্ত্তাধীনে মঞ্জুর করিলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মহারাজার পত্রের জবাবে জানাইলেন—"আমার গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরের যোগদানের আবেদন মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে কোন রাজ্যের যোগদান সম্পর্কে মতদ্বৈধ দেখা দিলে জনগণের মতামত দ্বারা এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করা হইবে —আমার এই গবর্ণমেণ্টের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহারা

চাহেন যে, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং কাশ্মীর ভূখণ্ড হানাদারমুক্ত হইলে রাজ্যটির যোগদানের প্রশ্ন জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিয়া স্থির করিতে হইবে।" মহারাজার সামরিক সাহায্যের আবেদন অনুসারে ঐ দিনই ভারতীয় ফৌজ বিমান যোগে শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হইল।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলিম নির্ব্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরীদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় সম্মেলনও সমর্থন করিয়াছে। বস্তুতঃ মহারাজার গবর্ণমেণ্টের ন্যায় জাতীয় সম্মেলনের পক্ষ হইতে শেখ আবদুল্লাও ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরূপ আবেদন জানান। পাঞ্জাবে যখন সাম্প্রদায়িক দাবানল জ্বলিয়া ওঠে শেখ সাহেব তখন বন্দী। এই আগুন কাশ্মীরে যাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে জাতীয় সম্মেলন তাহার জন্য অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। বক্‌সী গোলাম মহম্মদ—"হিন্দু-মুসলিম ইত্তেহাদ কি জয়" ধ্বনি তুলিয়া শেখ সাহেবের মুক্তির দাবী জানাইলেন। শেখ সাহেবের বন্দীনিবাস হইতে যে গোপন পত্র পাওয়া গেল তাহাতে তিনিও এই বিপজ্জনক মুহূর্ত্তে বহিরে আসিবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন এবং মহারাজার সহিত আলোচনা করিতে সম্মত হইলেন। কাশ্মীরকে সাম্প্রদায়িক বহ্নিশিখা হইতে দূরে রাখার জন্য তিনি তখন অতি মাত্রায় উৎকণ্ঠিত। সেপ্টেম্বর মাসে শেখ সাহেব মুক্ত হইলেন।

কারামুক্ত হইয়া শেখ সাহেব ডোমিনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু হানাদারদের আক্রমণে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় সম্মেলন কেন কাশ্মীরের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান সমর্থন করিল শেখ আবদুল্লা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "আমাদের প্রিয় জন্মভূমি কাশ্মীর আজ চরম বিপদের সম্মুখীন। মুসলিম, হিন্দু ও শিখ নির্ব্বিশেষে আজ সমস্ত কাশ্মীরীর একমাত্র কর্ত্তব্য সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে জন্মভূমিকে রক্ষা করা। যাহারা এই রক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা ব্যর্থ হইয়াছে। কাজেই এ দায়িত্ব আজ জনগণকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আক্রমণকারী হানাদারগণ আমাদের দেশ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের অন্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করাইবার জন্য আসিয়াছে। এ এক নূতন ধরণের দাসত্ব। আমরা সর্ব্বশক্তি দিয়া ইহা প্রতিরোধ করিব।"

"কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন মহারাজার অধীনে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়িয়াছি এবং আশা করিয়াছি যে, নয়াব্যবস্থায় আমরা আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অন্য যে কোন প্রশ্ন সমাধানের পূর্ব্বে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে হইবে। আমরা এমন কথাও বলিয়াছি ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান কিম্বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্য যে কোন ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রাজ্যের শাসন-তান্ত্রিক কাঠামোর এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

"জাতীয় সম্মেলনের বহু প্রভাবশালী নেতা মনে করেন যে, ভারতের সহিত যোগদান আমাদের পক্ষে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে সুবিধাজনক হইবে। অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারতই পাকিস্তানের চাইতে কাশ্মীরী দ্রব্যের ভাল বিক্রয় কেন্দ্র। রাজনৈতিক দিক হইতে আমরা মনে করি যে, পাকিস্তানের চাইতে ভারত অনেক বেশী প্রগতিশীল রাষ্ট্র এবং ভারতের সহিত যুক্ত হইলে কাশ্মীর স্বাধীনভাবে সমুন্নতি সাধনের অনেক বেশী সুযোগ পাইবে। যাহাই হউক, কোন সিদ্ধান্তই করা হয় নাই। জাতীয় সম্মেলনের বহু নেতা কারারুদ্ধ থাকায় কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব ছিল না।"

"আমার কারাবাসের কালে দেশের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এমন বহু ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সযত্নে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া কাশ্মীরের পক্ষে কোনটা সুবিধাজনক, কাশ্মীরের জনগণই বা কি চাহে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এইজন্য আমি কাশ্মীরের জনগণকে বলিলাম যে, দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টের ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত ডোমিনিয়নে যোগদানের প্রশ্ন মীমাংসা করা উচিত হইবে না। ইহার পরে ভারত ও পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক নিরূপিত হইতে পারে।'

"কিন্তু ঘটনা প্রবাহ দ্রুত ভিন্নরূপ ধারণ করিল। কারামুক্ত হইয়া আমি কাশ্মীর আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজনের কথা শুনিলাম। দিল্লী হইতে শ্রীনগর ফিরিয়াই জানিলাম যে, সশস্ত্র হানাদারগণ এবোটাবাদ রোড ধরিয়া লরীযোগে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে। হানাদারগণ মজঃফরগড় লুণ্ঠন করিয়াছে। তাহারা শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহা সুপরিকল্পিত আক্রমণ ; এবং অস্ত্রশস্ত্র ও মোটর দিয়া এই আক্রমণকারীদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা হইয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, জোর জবরদস্তি করিয়া কাশ্মীরীদের পাকিস্তানে যোগদান করাইবার উদ্দেশ্যেই এই আক্রমণ করা হইয়াছে। কাশ্মীরীরা এই আকস্মিক আক্রমণে স্তম্ভিত—এই জবরদস্তির চেষ্টায় ক্ষুব্ধ। ভারত কিম্বা পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্ন এখন গৌণ। আক্রমণকারীর হাত হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করাই প্রত্যেক কাশ্মীরীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। এই পদ্ধতিতে তাহারা কিছুতেই পাকিস্তানে যোগ দিবে না।"

"বন্ধুদের সহিত আলোচনার উদ্দেশ্যে আমি কয়েক ঘণ্টার জন্য দিল্লী আসিলাম এবং জনগণের পক্ষ হইতে এই আক্রমণ প্রতিরোধের

জন্য তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিলাম। মহারাজার গবর্ণমেণ্টও ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরূপ আবেদন জানাইয়াছে।”

(নয়া দিল্লী—২৭-১০-৪৭)

সামন্ত রাজ্যসমূহের ডোমিনিয়নে যোগদান সম্পর্কে মিঃ জিন্না যে নীতি ঘোষণা করেন তদনুযায়ী মহারাজা হরি সিংহের সিদ্ধান্তই এ বিষয়ে চূড়ান্ত। তিনি যখন ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তখন জিন্না-নীতি অনুসারে পাকিস্তানের এ বিষয়ে আপত্তি করার কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিল। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে (৩০--১০-৪৭) বলা হইল যে, এই যোগদান “শাঠ্য ও ও জবরদস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কাজেই উহা অনুমোদন করা যায় না।” বিজ্ঞপ্তিতে পাঠান উপজাতীয়দের হানার কথা স্বীকার করিয়া বলা হইল যে, ইহার জন্য কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারই দায়ী। পুঞ্চে এবং জম্মুতে সরকারী সৈন্যদল মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করে তাহাতে উত্তেজিত হইয়া পাঠান উপজাতীয়গণ কাশ্মীর আক্রমণ করে। পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থনে বলা হয় যে—“পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পাঠানগণ পশ্চিম-পাঞ্জাবে ঢুকিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট অতি কষ্টে তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করেন। কিন্তু পুঞ্চের উপর আক্রমণ এবং জম্মুর হত্যাকাণ্ড তাহাদের আরও উৎক্ষিপ্ত করে এবং তাহার ফলে কাশ্মীর আক্রমণ অনিবার্য্য হইয়া ওঠে।” বিজ্ঞপ্তিতে এ ইঙ্গিতও করা হয় যে, ডোমিনিয়নে যোগ দানের পত্র আড়াল দিয়া ভারতীয় ফৌজের কাশ্মীর প্রবেশে পাঠানগণ আরও উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে ; কেন না তাহারা ইহাকে বিদ্রোহী কাশ্মীরী মুসলমানদের “হিন্দু দাসত্বে” আবদ্ধ রাখার চক্রান্ত বলিয়া মনে করে।

এই বিজ্ঞপ্তিতেই বুঝা গেল যে, পাকিস্তান আরও ব্যাপকতাকে কাশ্মীর আক্রমণের ব্যবস্থা করিবে। সীমান্তের লীগ প্রধানমন্ত্রী কোয়ায়ুম খানের জেহাদের হাঁকে পাকিস্তানের মতিগতি স্পষ্টতর হইতেছিল। প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিকায়ৎ আলী ৪ঠা নভেম্বর এক বেতার বক্তৃতায় এই দস্যুদলকে "মুক্তিযোদ্ধা" বলিয়া অভিহিত করিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, মুসলিম ধর্ম্মোন্মাদনাকে ক্ষেপাইয়া পাকিস্তান একটা হেস্তনেস্ত করিতে বদ্ধপরিকর।

কিন্তু এবারেও পাকিস্থান কূটনীতির চালে ভুল করিল। হিন্দু মহারাজার বিরুদ্ধে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে উৎক্ষিপ্ত করা যায়। ভারতীয় ফৌজকেও হিন্দু ফৌজ বলিয়া অজ্ঞ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা কষ্টকর না হইতে পারে। কিন্তু কাশ্মীরের প্রিয়তম নেতা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরীদের হিন্দু দাসত্বের নাগপাশে বাঁধিতে চাহেন একথা আর যাহারাই বিশ্বাস করুক কাশ্মীরীরা বিশ্বাস করিবে না। কাজেই তিনি এবং তাঁহার জাতীয় সম্মেলনের মুসলিম সহকর্ম্মিগণ যখন হানাদারদের প্রতিরোধের জন্য আগাইয়া আসিলেন তখনই পাকিস্তানী চক্রান্তের প্রথম পরাজয় ঘটিল। জরুরী শাসনব্যবস্থার শীর্ষাধিষ্ঠিত বাঘী আবদুল্লা এবং বক্সী গোলাম মহম্মদের আহ্বানে কাশ্মীরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে জন্মভূমি রক্ষার জন্য আগাইয়া আসিল। পাকিস্তানের তখন একমাত্র ভরসা ছিল লুণ্ঠন-ধর্ষণ ও ধর্ম্মোন্মাদনায় প্রমত্ত উন্নততর মারণাস্ত্র সজ্জিত হানাদার দস্যুদলের পশুবল এবং তাহাদের সরবরাহ জোগান দিবার অধিকতর সুযোগ। কিন্তু কাশ্মীরী জনগণের সহ-যোগিতায় এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর কৃতিত্বে তাহার এই সুবিধাও অচিরেই বিলুপ্ত হইল।

মুক্তি অভিযান

২৭শে সেপ্টেম্বর মাত্র তিন কোম্পানী ভারতীয় ফৌজ যখন শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করে তখন রাজধানীতে এক শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়াছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে সমগ্র সহর অন্ধকারাচ্ছন্ন, রাজধানীর শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত। ভীত ত্রস্ত নগরবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় প্রতি মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছে। ভারতের এই ক্ষুদ্র সৈন্যদল যখন শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হইল তখন তাহারা না জনিত শত্রুর সংখ্যা ও শক্তি, না জানিত তাহাদের অবস্থান—এমন কি শ্রীনগর বিমান ঘাঁটি তাহাদের করতলগত হইয়াছে কি না তাহাও পরিজ্ঞাত ছিল না। এ যেন অন্ধকারের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ার মত। অথচ এই ঝুঁকি না লইয়াও উপায় ছিল না। কারণ পাঠানকোট হইতে জম্মু পর্য্যন্ত আঁকাবাকা যে সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল তাহার মারফতে সৈন্য পাঠাইতে হইলে বিলম্ব ঘটে। ভারতীয় সেনানীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে, তিনি যেন বিমানঘাঁটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবতরণ করেন। সৌভাগ্য-বশতঃ বিমানঘাঁটিটি তখনও শত্রুর করতলগত হয় নাই। কিন্তু মাত্র তিন কোম্পানী সৈন্য অবতরণ করিয়াই বা কি করিবে? ভারতীয় ফৌজ বিমান ঘাঁটিতে অবতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল যে, শ্রীনগর উপত্যকার প্রবেশ দ্বার বারামূলায় পাঁচ সহস্রাধিক হানাদার সমুপস্থিত। এই প্রবেশ দ্বারে যদি তাহাদের রোধ করা না যায় তবে শ্রীনগরকে বাঁচান অসম্ভব। আরও সৈন্য আসিয়া পৌছান পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নাই দেখিয়া ভারতীয় সেনানী মাত্র দুই কোম্পানী সৈন্য লইয়া প্রধান শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই হতাহত হইল—ভারতীয় সেনানী নিহত হইলেন। কিন্তু এই সম্মুখরণে হানাদারগণ চমকিত এবং সন্ত্রস্ত হইল; তাহাদের সৈন্যদল বিশৃঙ্খল

হইয়া পড়িল। হানাদারগণ অগ্রগতি বন্ধ করিল। ইত্যবসরে ভারত হইতে আরও সৈন্য শ্রীনগরে পৌছিল।

এই সময়ে ভারতীয় বিমান অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। পূর্ব্ব পরিকল্পনা ব্যতীত ইতিপূর্ব্বে এই ভাবে কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি না সন্দেহ। কাল বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগরে সৈন্য ও রসদ প্রেরণের জন্য শতাধিক বে-সরকারী বিমান নিয়োজিত করা হইল এবং অবিরাম গতিতে শ্রীনগরে সৈন্য ও রসদ পৌছিতে লাগিল।

আক্রমণকারীরা যখন নিজেদের পুনঃ সংগঠিত করিল তাহার পূর্ব্বে শ্রীনগরে প্রয়োজনীয় সৈন্য পৌছিয়াছে। ইতিমধ্যে পাঠানকোট পথ ধরিয়া ভারতের গোলন্দাজ বাহিনী কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিল। ভারতীয় ফৌজ কাশ্মীরে পৌছিবার বারোদিন পরে, ৭ই নভেম্বর শ্রীনগরের মাত্র চার মাইল দূরে হানাদারদের সহিত ভারতীয় ফৌজের বারো ঘণ্টা ব্যাপী তীব্র সংগ্রাম হয়। পরাভূত হানাদার দল পশ্চাদপসরণ করে এবং ১৮ই নভেম্বর বারামূলা পুনরধিকার করা হয়। সাতদিন পরেই তাহাদের উরির পশ্চিমে বিতাড়িত করা হয়। শ্রীনগরের ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী এই সহর মুক্ত হওয়ায় শ্রীনগরের শঙ্কা তিরোহিত হয়।

ইতিমধ্যে হানাদারগণ পাকিস্তান সীমান্তস্থিত জম্মু প্রদেশের এক বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে। প্রতিরোধকারী কাশ্মীরী ফৌজ মীরপুর, কোটলি, পুঞ্চ, ঝানগড়, নৌশেরা, ভিমবর, রাজৌরী এবং বেরীপত্তনে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ভারতীয় ফৌজ জম্মুতে গিয়া অবরুদ্ধ সৈন্যদলকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টিত হইল এবং ক্রমে বেরীপত্তন, নৌশেরা, ঝানগড় ও কোটলির সৈন্যদলের সহিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিল। মীরপুরের সৈন্যদলের সহিত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা গেল না, কিন্তু তাহারা নিজেরাই যুদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে উরি হইতে একদল সৈন্য আসিয়া পুঞ্চের সৈন্যদলের সহিত যোগ দিল।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পক্ষে উরি রণক্ষেত্রই সব চাইতে দুর্গম। বারো মাসের যুদ্ধে এই অঞ্চলে উভয় পক্ষের অবস্থানের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে আক্রমণ করিবে তাহাকে রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ নয় হইতে বারো হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতমালার চড়াই উতরাই অতিক্রম করিতে হইবে। শীতকালে এই সব দুর্গম পর্ব্বত বরাফাস্তীর্ণ থাকে। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় ফৌজ এই অঞ্চলে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে। শত্রুকে উরি অতিক্রম করিতে দেয় নাই।

আক্রমণকারী হানাদারগণ ইতিমধ্যে সুদূর গিলগিট দখল করিয়া বসে। প্রবল শত্রুসেনাকে বাধা দিতে অসমর্থ হইয়া কাশ্মীরী ফৌজ যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করিয়া স্কার্দ্দু পৌছাইল। শ্রীনগর হইতে গিলগিটে যাইবার পথ ছয় মাস বন্ধ থাকে; অনুকূল আবহাওয়ায় কেবল মাত্র খচ্চরের পিঠে চড়িয়াই এই দুর্গম অঞ্চলে যাওয়া যায়। কাজেই কাশ্মীর ও জম্মুর যুদ্ধে ব্যাপৃত ভারতীয় ফৌজ গিলগিট উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিল না।

কাশ্মীরে বরফ জমাট বাঁধিলে জম্মুর যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী নৌশেরায় কাশ্মীর রণাঙ্গনের প্রচণ্ডতম সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। বিগ্রেডিয়ার ওসমান ভারতীয় ফৌজ পরিচালনা করেন। দুইদিন হাতাহাতি যুদ্ধের পর ১৯০০ নিহত সেনা পশ্চাতে ফেলিয়া শত্রুদল পলায়ন করে। এই সময়ে পাঠানকোট সরবরাহের রাস্তা নষ্ট করার জন্যও প্রবল চেষ্টা করা হয়। সীমান্তের ওপার হইতে হানাদারদল আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু ভারতীয় সেনার তৎপরতায় সীমান্ত অঞ্চলের উৎপাত এবং পাঠানকোট রাস্তায় বিপদ অচিরেই কাটিয়া যায়।

নৌশেরার বিজয়ের পরেই ভারতীয় সেনা ১৮ই মার্চ্চ ঝানগড় অধিকার করে এবং এই জয় লাভে শত্রুপক্ষের কোটলি ও মীরপুরের

যোগাযোগ বন্ধ হইয়া যায়। শত্রুপক্ষ এই সময়ে অবরুদ্ধ পুঞ্চ সেনাদলকে পরাভূত করার প্রবল চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় ফৌজের এই সাফল্যের পশ্চাতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কৃতিত্ব অনেকখানি। বোমা বর্ষণ করিয়া, রসদ জোগাইয়া এবং পর্য্যবেক্ষণ চালাইয়া তাহারা ভারতীয় ফৌজকে অশেষ সাহায্য করিয়াছে।

শীত কাটিয়া গেলে কাশ্মীর রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের নূতন তৎপরতা আরম্ভ হইল। ভারতীয় বাহিনী উরি অঞ্চলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জ্জন করিল। মজঃফরাবাদ হইতে মাত্র আঠারো মাইল দূরবর্ত্তী তিথোয়াল অধিকৃত হইল—উরি হইতে সোজা পশ্চিমে চাকোথি অভিমুখেও ভারতীয় ফৌজ আগাইয়া যাইতে লাগিল। ভারতীয় অভিযানের প্রাথমিক সাফল্য তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর ফৌজ এবং হানাদারদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দিল। ভারতীয় ফৌজ যদি ডোমেল পৌছিতে পারে তবে সমস্ত আয়োজনই পণ্ড হইবে। পাকিস্তান এতকাল অন্তরাল হইতে হানাদারদের সাহায্য করিতেছিল। এই সমূহ বিপদের মুখে এক্ষণে সে প্রকাশ্য ভাবে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। ভারতীয় বাহিনীর পশ্চিমমুখী অভিযান রোধ করার জন্য দলে দলে পাকিস্তানের রেগুলার ফৌজ আসিতে লাগিল। ভারতীয় ফৌজের অগ্রগতি মন্দীভূত হইল। অতঃপর এই অঞ্চলে এক অচল অবস্থা দেখা দেয়—গোলা-গুলী বিনিময় এবং টহলদারী ব্যতীত কোন পক্ষই অগ্রসর হইতে পারিল না।

উরি রণাঙ্গনে অচল অবস্থার উদ্ভব হইলেও জম্মু প্রদেশে ভারতীয় ফৌজ এই সময়ে ব্যাপক অঞ্চল শত্রুমুক্ত করে। চিঙ্গাস হইতে অগ্রসর হইয়া গত ১২ই এপ্রিল রাজৌরী পুনর্দখল করা হয়। ভারতীয় ফৌজ রাজৌরী পৌছিয়া অমুসলমানদের উপর হানাদারদের অত্যাচারের বীভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। পুঞ্চ এবং রাজৌরী হইতে আগুয়ান দুইটি

সেনাদল এই অঞ্চলের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান পুনরধিকার করিল। নৌশেরা অঞ্চলে সাদাবাদ এবং সামানি অধিকৃত হইল। জুলাই মাসে (৭ই) ঝানগড়ে শত্রুপক্ষের সহিত যে সম্মুখ সংগ্রাম হয় ব্রিগেডিয়ার ওসমান তাহাতে নিহত হইলেন।

কাশ্মীর ও জম্মু প্রদেশে ভারতীয় ফৌজের লৌহবেষ্টনী ভাঙ্গিতে অসমর্থ হইয়া হানাদারগণ উত্তর দিক হইতে কাশ্মীর উপত্যকার বিপদ সৃষ্টির জন্য গিলগিট হইতে বালতিস্থান প্রদেশ আক্রমণ করে। একদল শত্রু জোজিলা গিরিপথের দিকে অগ্রসর হয় এবং আর এক দল গুরিয়াস্ উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে। ভারতীয় ফৌজ উভয় রণাঙ্গনেই শত্রুদের বিতাড়িত করিয়া কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিল। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে আর একদল হানাদার আরও উত্তর পূর্ব্বে রুদথ্ উপত্যকায় প্রবেশ করে এবং বৌদ্ধ বিহার সমূহ লুণ্ঠন করিয়া লে অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু এখানকার সৈন্যদল, রুদখী মুসলমান ও বৌদ্ধ স্বেচ্ছাসৈনিকদের সহযোগিতায় কয়েকটি সংঘর্ষে হানাদারদের পরাভূত করিয়া রুদথ উপত্যকা নিরুপদ্রব করা হয়।

যে পনর মাস ধরিয়া অব্যাহত ভাবে কাশ্মীরের যুদ্ধ চলিয়াছে। তাহার মধ্যে ভারতীয় ফৌজ গোটা রাজ্যটিকে শত্রুকবল মুক্ত করিতে না পারিলেও সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা এবং পশ্চিমের সামান্য একটু অঞ্চল ব্যতীত জম্মু প্রদেশকে নিরুপদ্রব করিয়াছলি। কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরে কিছু পার্ব্বত্য অঞ্চল হানাদারদের অধিকারে থাকিয়া যায়। ভারতীয় ফৌজ যে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহার পশ্চাতে বহু কারণ আছে। প্রথমত, পাকিস্তানের তুলনায় ভারতবর্ষকে যোগাযোগের অসুবিধার মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইয়াছে। পাকিস্তান তাহার বিস্তীর্ণ সীমান্তের বহু স্থান দিয়া

অনায়াসে হানাদারদের রসদ জোগান দিতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ বিমান পথের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে। পাঠানকোটের রাস্তাটি সেদিন পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে মাত্র। তৎসত্ত্বেও, ঐ একটি পথই এখনও কাশ্মীরের সহিত ভারতের একমাত্র নির্ভরযোগ্য যোগসূত্র। ঐ পথেই কাশ্মীরের অসামরিক অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইয়াছে; আবার ঐ পথেই ভারতীয় বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ জোগান দিতে হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, কাশ্মীরের মত দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে চটপট করিয়া যুদ্ধ শেষ করা সম্ভব নহে। এখানকার যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইতে বাধ্য। তৃতীয় এবং প্রধান কারণ, ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরের মধ্যেই যুদ্ধ নিবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছেন। পাকিস্তান ইহার পশ্চাতে আছে এ সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হইয়াও ভারত সরকার কাশ্মীরের বাহিরে সাংগ্রাম পরিব্যপ্ত করিতে চাহেন নাই। না হইলে একদল ভারতীয় ফৌজ যেমন কাশ্মীর গিয়াছিল আর একদল যদি পাকিস্তানের এলাকা দিয়া মারী, রাওলপিণ্ডি এবং এবোটাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইত তবে কাশ্মীরের যুদ্ধ এতদিন হয়ত স্থায়ী হইত না। কিন্তু তাহাতে পাকিস্থানের সহিত অনিবার্য্য যুদ্ধ বাধিত। ভারত সরকার প্রথমাবধি এই বিপদজনক সম্ভাবনা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও আন্তর্জ্জাতিক আইন এবং জাতিসঙ্ঘের সনদ অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য পাকিস্তানস্থিত হানাদারদের মূল ঘাঁটি আক্রমণ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভারতের ছিল।

কাশ্মীরের কূটনৈতিক রণাঙ্গন

পাকিস্তানের সহিত ব্যাপক সংঘর্ষ এড়াইবার প্রচেষ্টা হইতেই কাশ্মীর যুদ্ধের দ্বিতীয় এক রণাঙ্গন সৃষ্টি হয় এবং এই রণাঙ্গনে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সুচতুর এক কূটনৈতিক চক্রান্তের সম্মুখীন হইতে হয়।

পাকিস্তান হানাদারদের প্রতিনিবৃত্ত করার কোন চেষ্টা করে নাই বরং পাকিস্তানের সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই আক্রমণের ষড়যন্ত্র করিয়াছে, হানাদারদের সর্ব্বপ্রকার যানবাহনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র জোগাইয়াছে—এমনকি নিজের সেনানীদের নেতৃত্বাধীনে ইহাদের রণাঙ্গনে পাঠাইয়াছে ঐ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া ভারত সরকার পাকিস্তানকে এই আক্রমণ বন্ধ করার অনুরোধ জানান। ২২শে ডিসেম্বর (১৯৪৭) পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর নিকট যে পত্র লেখা হয় তাহাতে অনুরোধ জানান হয় যে, পাকিস্তান যেন কাশ্মীর আক্রমণের জন্য তাহার ভূখণ্ড ব্যবহৃত হইতে না দেয়, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদ সংগ্রহ বন্ধ করে, পাকিস্তানী প্রজাদের আক্রমণে যোগদান করিতে নিষেধ করে এবং এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে এরূপ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করে।

কিন্তু এই অনুরোধের কোন জবাব না পাওয়ায় ভারত সরকার ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৪৭) জাতিসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদের নিকট আবেদন করেন যে, পাকিস্তান ভারত আক্রমণে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছে অতএব তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা হউক। ভারত অভিযোগ করে যে—(১) আক্রমণকারীদের পাকিস্থান এলাকা দিয়া যাইতে দেওয়া হইতেছে; (২) ইহাদের মধ্যে পাকিস্তানী প্রজাও আছে; (৩) ইহারা পাকিস্তানকে আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতেছে; (৪) পেট্রোলার সহ ইহাদের অধিকংশ অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদই পাকিস্তান হইতে সংগৃহীত হইতেছে এবং (৫) পাকিস্তানী অফিসারগণ হানাদারদের শিক্ষা দিতেছে, পরিচালনা করিতেছে এবং অন্যান্য ভাবে সাহায্য করিতেছে। পাকিস্তান ব্যতীত এমন কোন স্থান নাই যেখান হইতে এত আধুনিক যুদ্ধের সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পারে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে ভারতীয় উপমহাদেশের

শান্তি তথা আন্তর্জ্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইতে পারে। অতএব, ভারত গবর্ণমেণ্ট পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের উপর নিম্নোক্ত নির্দ্দেশ জারী করার অনুরোধ জানান :—(১) পাকিস্তানের সামরিক এবং দেওয়ানী কর্ম্মচারীদের কাশ্মীর আক্রমণে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে নিষেধ করা হউক ; (২) পাকিস্তানী প্রজা যাহাতে আক্রমণে কোন অংশ গ্রহণ না করে তাহার ব্যবস্থা করা হউক ; এবং (৩) পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট যেন আক্রমণকারীদের পাকিস্তান রাজ্য ব্যবহার করিতে না দেয়, সামরিক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য রসদ সরবরাহ না করে এবং এই সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে এমন সর্ব্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ করে।

ভারতের এই অভিযোগের মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। পাকিস্তানের সমর্থন, সহযোগিতা এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য ব্যতীত এই আক্রমণ কোনক্রমেই চলিতে পারে না। এই অবস্থায় স্বস্তিপরিষদ অনায়াসে এবং অনতিবিলম্বেই ভারতীয় উপ-মহাদেশের শান্তির বিঘ্নকর এই সমস্যা মীমাংসা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু বিশ্ব-জোড়া ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দ্বারা প্রভাবিত হইয়া স্বস্তি পরিষদের ইঙ্গ-মার্কিণ জোটের সদস্যগণ ভারতের অভিযোগ সম্পর্কে এক অদ্ভুত মনোভাব অবলম্বন করিলেন। দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা অবান্তর কুট তর্কের ধূম্রজালে আসল সমস্যা চাপা দিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। কাশ্মীর রণাঙ্গণে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ধ্বংসলীলা অব্যাহত-ভাবে চলিতে লাগিল।

ভারতের অভিযোগের সমর্থনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলপতি শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার যে বক্তৃতা দেন তাহার জবাবে পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার জাফরউল্লার বলিবার কিছুই ছিল না। আত্মদোষ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, কাশ্মীরের এই ঘটনার

সহিত পাকিস্তানের কোন সম্পর্ক নাই। মহারাজার গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহারই ফলে প্রজারা বিদ্রোহ করিয়াছে এবং উপজাতীয় মুসলমানগণ স্বধর্ম্মাবলম্বীদের রক্ষার জন্য তথায় গিয়াছে। জাফরউল্লার মতে কাশ্মীরের যুদ্ধ হিন্দু রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্য্যাতিত বিদ্রোহী প্রজাদের মুক্তিযুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে মুসলিম হত্যার অভি-যোগ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতীয় ফৌজ হিন্দু মহারাজার প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য তথায় গিয়াছে। স্যার জাফরউল্লা জুনাগড় সম্পর্কেও ভারতের বিরুদ্ধে নালিশ জানান।

এই সম্পর্কে স্বস্তিপরিষদে দীর্ঘকাল যে প্রকাশ্য এবং গোপন আলোচনা হইয়াছে তাহার বিরক্তিকর ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। মোট কথা, ভারতের অভিযোগের অভ্রান্ততা উপলব্ধি করিয়াও স্বস্তিপরিষদের ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ জগৎ জোড়া ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কথা চিন্তা করিয়া এমন কোন সিদ্ধান্ত করিাত চাহেন নাই যাহার ফলে আক্রমণকারী হইলেও পাকিস্তান ক্ষুন্ন ও ক্ষুব্ধ হইতে পারে। সোবিয়েত সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত এই অসামান্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের কর্ত্তৃত্ব পরিণামে কোন রাষ্ট্রের করায়ত্ত থাকিবে এবং তাহার সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের সম্পর্ক কিরূপ হইবে স্বস্তিপরিষদের সোবিয়েত বিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠ ইঙ্গ-মার্কিণ জোঁটের সদস্যগণ তাহারই পরিপ্রেক্ষিত সমস্যাটি বিচার করিতে থাকেন। সংঘর্ষেলিপ্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পাকিস্তান পশ্চিম এশিয়ার মুসলি রাষ্ট্রনিচয়ের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল তাহার কর্ত্তৃত্বাধীন। ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের সিদ্ধান্তে পাকিস্তান ক্ষুব্ধ হইলে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার শঙ্কা থাকে—মধ্য

প্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ কূটনীতি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে পারে। অপর পক্ষে, ভারত তখন বিশ্ব রাজনীতিতে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই নীতি আসল এবং পূর্ণ তাৎপর্য্য তখনও সন্দেহাতীতভাবে সুস্পষ্ট হয় নাই। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার এই নবীন রাষ্ট্রটিকে অসন্তুষ্ট করাও ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের স্বার্থসম্মত নহে। এই অবস্থায়, ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ প্রথমাবধি চেষ্টা করিয়াছেন যাহাতে উভয় পক্ষকে সম্মত করিয়া তাহাদের মধ্যস্থতায় কাশ্মীর বিরোধের এক মধ্যপন্থী আপোষ মীমাংসা করা যায়। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে ভারতের বিরুদ্ধে জুনাগড় এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে মুসলিম হত্যার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় তাহার ধূম্রজালে মুখ্য সমস্যা চাপা দিবার সুবিধা হয় এবং কাশ্মীরের আগুন প্রজ্বলিত রাখিয়া গোটা ভারত-পাকিস্তান বিরোধ মীমাংসার ছলে কাশ্মীর সম্পর্কে নিজেদের মনঃপূত সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিবার জন্য তাহারা নানা কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। কাশ্মীর বিভাগে ভারতের সম্মতি পাওয়া গেলে সাম্রাজ্যবাজী জোঁটের এই গোপন অভিপ্রায় সহজেই পূর্ণ হইত। বস্তুতঃ কাশ্মীরে সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পরে বিলাতের সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকাসমূহ মুরুব্বিয়ানা করিয়া নির্লজ্জের মত কাশ্মীর বিভাগকেই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা বলিয়া প্রচার করিতে থাকে। গান্ধীজী বহুপূর্ব্বে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেন—ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট। ভাগাভাগির প্রশ্ন আর তোলা উচিত হইবে না (নয়াদিল্লী ২৫-১২-৪৭)।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সরাসরি কাশ্মীর বিভাগের প্রস্তাবে রাজী হইবেন এরূপ কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাশ্মীরের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের সময়ে ভারত এই সর্ত্ত আরোপ করিয়াছিল যে, এই সম্পর্কে জনমত গ্রহণ

করিতে হইবে। স্বস্তি পরিষদের ইঙ্গ-মার্কিণ সদস্যগণ অতঃপর এই জনমত গ্রহণের প্রসঙ্গ ধরিয়াই কাশ্মীরে নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। গণভোট সম্পর্কে ভারতের আপত্তি করার কিছুই ছিল না। কিন্তু তাহার সর্ত্ত ছিল যে, এই গণভোট গ্রহণের পূর্ব্বে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার, রাজ্যটি হানাদার মুক্ত হওয়া আবশ্যক। এ সম্পর্কে পাকিস্তানকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং রাজ্যে যাহাতে পুনর্ব্বার উৎপাত দেখা না দিতে পারে তাহার সন্তোষজনক এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টই এই গণভোটের বন্দোবস্ত করিবেন;—জাতিসঙ্ঘ কমিশন পাঠাইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন যে, প্রকৃতই স্বাধীনভাবে ভোট গৃহীত হইতেছে কিনা। ভারত এ দাবীও করে যে, কাশ্মীর ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করায় রাজ্যটির রক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত দায়িত্ব ভারত গবর্ণমেণ্টের; কাজেই গণভোটের সিদ্ধান্ত পরিজ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজ্যটির শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় ফৌজ কাশ্মীরে থাকিবে।

কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের প্রশ্ন ভারতরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সমস্যা। কাজেই তাহার সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গণভোট গ্রহণের যে প্রস্তাব ভারতের পক্ষ হইতে করা হয় তাহার মধ্যে অন্যায় কিছুই ছিল না। জাতিসঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষকগণকে গণভোট গ্রহণের কালে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ দিতে সম্মত হইয়া সে নিরপেক্ষভাবে ভোট গ্রহণের নিশ্চয়তাও দিয়াছিল। কিন্তু পাকিস্তান তো দূরের কথা, ইঙ্গ-মার্কিণ দলের সদস্যগণও এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা ভারতীয় ফৌজের উপস্থিতি এবং আবদুল্লা গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কে আপত্তি জানাইলেন। গণভোট গ্রহণের কালে তাহারা কাশ্মীরে সর্ব্বদলীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা বলিতে লাগিলেন

—পাকিস্তানী কূটনীতির জারজ সৃষ্টি আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট এমন কি উপজাতীয় দস্যুদলের প্রতিনিধিদের লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠনের কথা উঠিতে লাগিল।

গণভোট সম্পর্কে ভারতের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব করা হয় ভারতীয় প্রতিনিধি তাহার কোনরূপ সংশোধন করিতে রাজী হইলেন না। অবশেষে, তিন মাস ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর স্বস্তি পরিষদ ২১শে এপ্রিল (১৯৪৮) কাশ্মীর সম্পর্কে বেলজিয়াম, কানাডা, চীন, কলম্বিয়া, বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র এই ছয়টি রাষ্ট্রের এক যুক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাবে পাঁচজন সদস্য লইয়া এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হয় এবং শান্তি স্থাপন ও গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে সুপারিশের আকারে কতকগুলি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি মোটামুটি ভাবে নিম্নোক্তরূপ :—

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিরোধ সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া ভারতের নালিশ সম্পর্কে ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তব্য এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধির জবাব ও পাল্টা অভিযোগ শ্রবণ করিয়া স্বস্তি পরিষদ এই দৃঢ় অভিমত পোষণ করেন যে, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে যত শীঘ্র সম্ভব শান্তি প্রতিষ্ঠা করা অত্যাবশ্যক এবং সর্ব্ব প্রকার যুদ্ধবন্ধ করার জন্য ভারত ও পাকিস্তান উভয়েরই যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। জম্মু এবং কাশ্মীরের ভারত কিম্বা পাকিস্তানে যোগদান স্বাধীন এবং পক্ষপাতহীন গণভোটের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্থির হইবে উভয় রাষ্ট্রের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া পরিষদ সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

গত ১৭ই জানুয়ারীর প্রস্তাব পুনরনুমোদন করিয়া পরিষদ কমিশনের সদস্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া পাঁচ জন করিতেছেন এবং কমিশনকে অবিলম্বে ভারতীয় উপমহাদেশে গিয়া শান্তি স্থাপন এবং গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের

সহযোগিতায় ইহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার নির্দ্দেশ দিতেছেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কমিশন যে ব্যবস্থা করেন স্বস্তি পরিষদকে যেন সে সম্পর্কে অবহিত রাখা হয়। যুদ্ধক্ষান্তি এবং স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন গণভোট গ্রহণের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এই অভিমত পোষণ করিয়া স্বস্তি পরিষদ ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের নিকট নিম্নোল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতেছেন :—

(ক) শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা :—

কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের প্রজা নহে এইরূপ যত উপজাতীয় এবং পাকিস্তানী প্রজা যুদ্ধার্থে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য পাকিস্তানকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং এইরূপ লোক যাহাতে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহাদের সাহায্য দান বন্ধ করিতে হইবে। সকলকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, রাজ্যটির যোগদান সম্পর্কে মতও পথ নির্ব্বিশেষে সকল প্রজা যাহাতে স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে; সুতরাং সকলেই যেন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে।

(২) উপজাতীয়গণ চলিয়া যাইতেছে এবং যুদ্ধক্ষান্তির ব্যবস্থাপত্র কার্য্যকরী হইয়াছে বলিয়া কমিশন (তদন্ত কমিশন) যখন মনে করিবেন তখন কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে ভারত গবর্ণমেণ্টকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে ন্যূনতম সৈন্যদল রাখিয়া বাকি সৈন্যদল ক্রমান্বয়ে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য হইতে সরাইয়া আনিতে হইবে। তাহাকে জানাইয়া দিতে হইবে যে, পর্য্যায়ক্রমে সৈন্য প্রত্যাহৃত হইতেছে এবং প্রতিটি প্রত্যাহারের সংবাদ তাহাকে ঘোষণা করিতে হইবে। ভারতীয়

সৈন্যদলের সংখ্যা যখন ন্যূনতম হইবে তখন ঐ সৈন্যদলকে কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে এরূপভাবে মোতায়েন করিতে হইবে যাহাতে ঐ সৈন্যদলের উপস্থিতি রাজ্যের প্রজাদের ভীতির কারণ বলিয়া প্রতিভাত না হয় এবং অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিতে যেন যত অল্প সংখ্যক সম্ভব সৈন্য থাকে এবং মোট সৈন্য দলের মধ্যে রিজার্ভ বলিয়া পরিগণিত সৈন্যদল যেন তাহাদের বর্ত্তমান পশ্চাৎ ঘাঁটিতে থাকে। (৩) গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপক যতক্ষণ (তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী) রাজ্যের পুলিশ ও সৈন্যদলের পরিচালনা এবং তদারকের ভার লইতে না পারিতেছেন ততক্ষণ তিনি যে এলাকায় বলিয়া দিবেন ভারত সরকারকে তথায় সৈন্য মোতায়েন করিতে সম্মত হইতে হইবে। (৪) (ভারতীয় সৈন্যদল প্রত্যাহারের পরে) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষণের জন্য প্রতিটি জিলায় সংগৃহীত স্থানীয় ফৌজ নিয়োগ করিতে হইবে ; যদি তাহাদের সংখ্যা গণভোটের ব্যবস্থাপক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা না করেন তবে তিনি আরও ফৌজ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। (৫) যদি এই স্থানীয় ফৌজ অপর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় তবে কমিশন ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট উভয়ের সম্মতিক্রমে এজন্য উভয় ডোমিনিয়নের যে কাহারও উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন। (৬) ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, গণ-ভোটের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইলে রাজ্যটির শাসনকার্য্য পরিচালনায় সমভাবে এবং পূরাপূরিভাবে অংশ গ্রহণের জন্য (মন্ত্রিপদে) প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আহ্বান করা হইবে। (৭) ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই নিশ্চয়তা দিতে হইবে যে, রাজ্যটির ভারত কিম্বা পাকিস্তানে যোগদান সম্পর্কে যত সত্বর সম্ভব গণভোট গ্রহণের জন্য এক গণ-ভোট-কর্ত্তৃপক্ষ গঠন করিতে হইবে। (৮) ভারত গবর্ণমেণ্টকে নিশ্চয়তা দিতে হইবে যে,

ন্যায়সঙ্গত এবং পক্ষপাতহীন গণভোট গ্রহণের জন্য এই কর্ত্তৃপক্ষ রাজ্যের সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশের পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানসহ অন্যান্য যে সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োজনীয় মনে করিবেন তাহাদের তাহা দেওয়া হইবে।

(৯) কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর যতটা সাহায্য এই কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিবেন—ভারত গবর্ণমেণ্টকে ততটা সাহায্য দিতে হইবে। (১০ ক) গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপক জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। (১০ খ) গণভোট গ্রহণের কর্ত্তা, জম্মু ও কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী হিসাবে কাজ করিলেও, গণভোট সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য সহকারী এবং অন্যান্য অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকারী হইবেন। এই কর্ম্মচারীদের নিয়োগ এবং নিয়মাবলী রীতিসম্মত পদ্ধতিতে জম্মু এবং কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষিত এবং প্রযুক্ত হইবে।

পক্ষপাতাহীন গণভোট গ্রহণকে গুরুতর ভাবে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ মামলার বিচারের জন্য কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টকে গণভোটের কর্ত্তা কর্ত্তৃক মনোনীত পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিতে হইবে।

গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপকের চাকুরীর সর্ত্তাবলী ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের মধ্যে স্বতন্ত্র চুক্তিদ্বারা নিরূপিত হইবে। গণভোটের ব্যবস্থাপক তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের নিয়োগের সর্ত্ত স্থির করিবেন।

গণভোটের কর্ত্তা সরাসরি কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট, ভারত গবর্ণমেণ্ট, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট, জাতি সঙ্ঘের কমিশন এবং উহার মারফতে স্বস্তি পরিষদের সহিত পত্রালাপ করিতে পারিবেন।

(১১) ভীতিপ্রদর্শন করিয়া, জবরদস্তি করিয়া, ঘুষ দিয়া এবং অন্যান্য অসঙ্গতভাবে গণভোটের ভোটারদের যাহাতে প্রভাবিত করা

না হয় ভারত গবর্ণমেণ্টকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ইহা প্রতিরোধের জন্য গণভোটের কর্ত্তার সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টকে সাধারণ্যে ঘোষণা করিতে হইবে যে, এই প্রতিশ্রুতি আন্তর্জ্জাতিক বাধ্যবাধকতা হিসাবে কাশ্মীর রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মচারী এবং কর্ত্তৃপক্ষের উপর প্রযোজ্য।

(১২) ভারত গবর্ণমেণ্টকে এবং কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টকে ঘোষণা করিতে হইবে যে রাজ্যটির (ভারত বা পাকিস্তানে) যোগদান সম্পর্কে মতামত প্রকাশের এবং ভোট দিবার অবাধ অধিকার মত ও পথ নির্ব্বিশেষে সকলেরই আছে এবং সকলের জীবনই নিরাপদ ; আর এই সম্পর্কে সভাসমিতি করার, বক্তৃতা দিবার, সফর করিয়া রাজ্যে প্রবেশ করিবার এবং বাহিরে যাইবার অবাধ অধিকারও সকলের আছে।

(১৩) ভারত গবর্ণমেণ্ট ও কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টকে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া এ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত ভারতীয় প্রজা কাশ্মীরে না থাকে কিম্বা যাহারা ১৫ই আগষ্টের (১৯৪৭) পরে এখানে আসিয়াছে তাহারা রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

(১৪) ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট যাহাতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয় ভারত গবর্ণমেণ্টকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (ক) হাঙ্গামার জন্য রাজ্যের যেসব প্রজা চলিয়া গিয়াছে তাহাদের যেন আমন্ত্রণ করা হয় তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনে যেন কোন বাধা দেওয়া হয় এবং তাহাদের যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে দেওয়া হয়। (খ) কাহাকেও যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। রাজ্যের সমস্ত অংশের সংখ্যালঘুদের জন্য যেন যথোচিত রক্ষাব্যবস্থা করা হয়।

(১৫) ন্যায়সঙ্গত এবং পক্ষপাতহীন গণভোট গৃহীত হইয়াছে কিনা গণভোটের পরে কমিশনকে স্বস্তি পরিষদের নিকট সে সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানাইতে হইবে।

(১৬) এই কার্য্য সম্পাদনে কমিশনকে সাহায্য করার জন্ত ভারত এবং পাকিস্থান উভয় গবর্ণমেণ্টকে একজন করিয়া প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্ত আমন্ত্রণ করিতে হইবে।

(১৭) এই প্রস্তাবে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্ত কমিশন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে পর্য্যবেক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(১৮) এই প্রস্তাবে উল্লেখিত কর্ত্তব্য স্বস্তি পরিষদের কমিশন সম্পাদন করিবেন।

প্রস্তাবের মূখ্যাংশ অনুধাবন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, গণভোটের নামে আবদুল্লা গবর্ণমেণ্টকে অপসৃত করিয়া পাকিস্তানী তাঁবেদারদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়া এবং অতঃপর জাতিসঙ্ঘের নামে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া গণভোটের মারফতে কাশ্মীর বিভাগের পথ প্রশস্ততর করাই ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য। প্রস্তাবকগণ আত্মপক্ষ সমর্থনে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সকলের প্রতি সুবিচার করিতে চাহেন। কিন্তু আক্রমণকারী ও আক্রান্তের প্রতি সমদর্শিতা ন্তায়বিচার নহে।

ভারত গমর্ণমেণ্ট ও পাকিস্তান উভয়েই এই প্রস্তাব মানিয়া নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তবে জাতিসঙ্ঘের কমিশন তদন্তে আসিলে ভারতের পক্ষ হইতে তাহাদের সহিত সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। পাকিস্তান ভিন্ন কারণে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই। সে কমিশনের হস্তে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দিতে চাহিয়াছে। পাকিস্তান চাহিয়াছে যে, কমিশনকে অস্ত্র সম্বরণের আদেশ দিবার অধিকার দেওয়া হউক; আজাদ কাশ্মীর আন্দোলনের কর্ত্তৃপক্ষ সহ সমস্ত দলের সহিত সমভাবে আলোচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক, গণভোট পরিচালনা করার এবং তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা দেওয়া হউক আর জুনাগড়, মুসলিম

হত্যা সহ গোটা ইন্দো-পাকিস্তান সম্পর্ক সম্বন্ধে তদন্তের ক্ষমতা দেওয়া হউক। তবে কমিশন ভারতীয় উপমহাদেশে আসিলে তাহার সহিত আলোচনা করিবার প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানও দেয়।

কমিশনের দৌত্য

চেকোস্লোভাকিয়া, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, বেলজিয়াম ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিশন গত জুলাই মাসে ভারতে আসিলেন এবং দিল্লী ও করাচীতে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। কমিশনের কতিপয় সদস্য রণাঙ্গনের উভয় পার্শ্বে সরেজমিন তদন্তও করিলেন। এই তদন্তের ফলে প্রতিপন্ন হইল যে, জাতিসঙ্ঘের নিকট পাকিস্তান এতকাল যাহা বলিয়া আসিয়াছে তাহার সব কিছুই "শাঠ্য ও প্রবঞ্চনা"র উপর প্রতিষ্ঠিত। কমিশন সরেজমিন তদন্ত করিয়া দেখিলেন, পাকিস্তানের রেগুলার সৈন্যদল কাশ্মীরে যুদ্ধরত আছে। ভারতের অভিযোগ সত্য প্রতিপন্ন হইল। পাকিস্তান কাশ্মীর যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নহে এই কাল্পনিক যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া স্বস্তি পরিষদ তাহার প্রস্তাব রচনা করেন; কিন্তু কমিশনের তদন্তলব্ধ অভিজ্ঞতায় এই ভিত্তি ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

অতঃপর দিল্লী ও করাচীতে আলাপ আলোচনা করিয়া তদন্তলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে (১৩ই আগষ্ট ১৯৪৮) তাহারা অস্ত্র সম্বরণের এক খসড়া প্রস্তাব রচনা করিয়া ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিলেন। ভারত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মানিতে স্বীকৃত হইল কিন্তু পাকিস্তানের অস্বীকৃতির ফলে জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধক্ষান্তির প্রথম চেষ্টা সফল হইতে পারিল না।

খসড়া প্রস্তাবে বলা হইল যে, কাশ্মীর পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশন ভারত এবং পাকিস্তান উভয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের মতামত সযত্নে

বিবেচনা করিয়াছেন এবং কমিশন মনে করেন যে, এই সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হইতে কমিশনকে সাহায্য করার জন্য ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টকে আন্তর্জ্জাতিক শান্তিহানির সম্ভাবনাপূর্ণ এই সংঘর্ষ অবিলম্বে বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য তাহারা ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট সমীপে যুগপৎ নিম্নোক্ত প্রস্তাব জানাইতেছেন:—

প্রথম অংশ:—(ক) ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের হাই কমাণ্ডকে স্বতন্ত্রভাবে এবং যুগপৎ তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কাশ্মীরে যুদ্ধরত সমস্ত সাংগ্রামিকদের অস্ত্রসম্বরণের নির্দ্দেশ দিতে হইবে। উভয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অনুমোদন করার চার দিনের মধ্যে যে কোন একদিন এই আদেশ জারী করিতে হইবে।

(খ) উভয় হাই কমাণ্ডের কেহ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না যাহার ফলে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যবাহিনীর সমরশক্তি বৃদ্ধি পায়। (তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্য বলিতে সংগঠিত, অসংগঠিত, যুদ্ধরত এবং সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করিতেছে এরূপ সমস্ত সৈন্যদলকে বুঝাইবে।)

(গ) অস্ত্র সম্বরণের জন্য বর্ত্তমান সৈন্য সংস্থাপনের প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য উভয় বাহিনীর প্রধান সেনাপতিদ্বয়কে আলোচনা করিতে হইবে।

(ঘ) ইচ্ছা করিলে এবং সম্ভব হইলে কমিশন, সামরিক পর্য্যবেক্ষক নিয়োগ করিবেন। ইহারা কমিশনের কর্ত্তৃত্বাধীনে এবং উভয় কমাণ্ডের সহযোগিতায় অস্ত্রসম্বরণের আদেশ কিরূপ পালিত হইতেছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবে।

(ঙ) আরও আলোচনার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য ভারত ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রজাদের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে।

দ্বিতীয় অংশ ঃ—অস্ত্রসম্বরণ সম্পর্কে উপরিউল্লিখিত প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে উভয় গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধ-ক্ষান্তির চুক্তির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহকে ভিত্তিহিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। কমিশন উভয় গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া ইহার বিস্তারিত বিষয় সমূহ স্থির করিবেন।

(ক ১) কাশ্মীর রাজ্যে পাকিস্তানী ফৌজদের উপস্থিতি স্বস্তি পরিষদের নিকট পাকিস্তান যাহা বলেন তাহা হইতে এক নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতেছে; পাকিস্তানকে তাহার ফৌজ সরাইয়া আনিতে হইবে।

(ক ২) যে সমস্ত উপজাতীয় এবং পাকিস্তানী প্রজা কাশ্মীরে স্বভাবতঃ বসবাস করে না এবং যুদ্ধের জন্য তথায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য পাকিস্তানকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

(ক ৩) চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানী ফৌজ অধিকৃত অঞ্চল কমিশনের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শাসন সংরক্ষণ করিবে।

(খ ১) কমিশন যখন ভারত সরকারকে জানাইবেন যে, উপজাতীয়গণ এবং পাকিস্তানী প্রজারা চলিয়া গিয়াছে এবং পাকিস্তানী ফৌজ প্রত্যাহৃত হইতেছে ভারত গবর্ণমেণ্টকে তখন পর্য্যায়ক্রমে কমিশনের সহিত আলোচনা করিয়া কাশ্মীর হইতে অধিকাংশ সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইবে। কেন না, ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বস্তি পরিষদকে জানান যে, উপজাতীয় এবং পাকিস্তানী প্রজাদের উপস্থিতির দরুণ যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহার জন্যই তাহারা কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহারা চলিয়া গেলে সে অবস্থা থাকিবে না।

(খ ২) চূড়ান্ত মীমাংসার সর্ত্ত মানিয়া না নেওয়া পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার বর্ত্তমান সৈন্য সংস্থাপনার চৌহদ্দির মধ্যে কমিশনের

সম্মতিক্রমে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যার্থ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম প্রয়োজনীয় সৈন্ম রাখিতে পারিবেন। কমিশন ইচ্ছামত স্থানে পর্য্যবেক্ষক মোতায়েন করিতে পারিবেন।

(খ ৩.) কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট যাহাতে সকলকে জানাইয়া দেন যে, শান্তি, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম তাহারা সাধ্যায়ত্ত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার রক্ষিত হইবে,— ভারতকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ১) স্বাক্ষরের পরে যুদ্ধক্ষান্তি চুক্তির পূর্ণ বিবরণী কিম্বা উহার মূলনীতি সম্পর্কে এক ইস্তাহার (উভয় গবর্ণমেণ্ট সম্মত হইলে) প্রকাশ করা হইবে।

তৃতীয় অংশ – ভারত গবর্ণমেণ্ট ও পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট পুনরায় তাহাদের অভিপ্রায় ঘোষণা করিতেছেন যে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ জনগণের অভিমত দ্বারা নিরূপিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ-ক্ষান্তি চুক্তির পরে যে পরিস্থিতিতে এই স্বাধীন মত প্রকাশ করা যায় তাহা নির্দ্ধারণের জন্ম কমিশনের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইতেছেন।

এই খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে জবাব দেন তাহাতে কয়েকটি বিশদ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং জাতিসঙ্ঘের নীতি ও সম্মান রক্ষার জন্ম ভারত সরকার প্রস্তাবটি মানিয়া লইতে সম্মত হন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ২০শে আগষ্ট (১৯৪৮) কমিশনের সভাপতি মিঃ জোসেফ করবেলকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এই বিশদ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে— (ক) পাকিস্তানী ফৌজ যে অঞ্চল ছাড়িয়া যাইবে তাহার উপর কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের সার্ব্বভৌমত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না। (খ) "আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট"কে কোনক্রমে অনুমোদন করা চলিবে না। (গ) পাকিস্তানী ফৌজ পরিত্যক্ত অঞ্চলকে এমনভাবে সংহত করা

চলিবে না যাহার ফলে ষ্টেটের কোন অসুবিধা দেখা দেয়। (ঘ) কাশ্মীর হইতে ভারতীয় ফৌজ প্রত্যাহার করিলেও তথায় এমন ফৌজ রাখিতে হইবে, যাহার দ্বারা তাহার আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন এবং বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। (ঙ) রাজ্যের ভবিষ্যৎ যদি গণভোটের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তবে সেই গণভোটের ব্যবস্থাপত্র কিম্বা পরিচালনায় অথবা তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে পাকিস্তান কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না। (চ) আপনাদের প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশের ক ৩ ধারা দ্বারা এমন অবস্থা সৃষ্টি করার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হয় নাই যাহার বিরুদ্ধে এই পত্রের গ'এ আপত্তি জানান হইয়াছে (মিঃ জোসেফ করবেল তাঁহার ২৫শে আগষ্ট তারিখের পত্রে স্বীকার করেন যে কমিশনের ব্যাখ্যার সহিত ইহার পার্থক্য নাই, তবে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিধিসম্মত রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের স্বাধীনতা দিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, পরিত্যক্ত অঞ্চল বলিতে কার্য্যকরীভাবে পাকিস্তান হাই কমাণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল বুঝাইবে)। কমিশন নিরাপত্তা ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। কাশ্মীর হইতে ভারতীয় ফৌজ প্রত্যাহার কখন আরম্ভ হইবে, কিভাবে পর্য্যায়ক্রমে সৈন্য অপসৃত হইবে; কত ভারতীয় ফৌজ রাজ্যে থাকিবে তাহা কেবলমাত্র ভারত সরকার ও কমিশনই স্থির করিবেন। কমিশনের সভাপতি স্বীকার করেন যে, প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশ দ্বারা গণভোটে পাকিস্তানের কোনভাবে অংশ গ্রহণ করার অধিকার স্বীকৃত হয় না।

পাকিস্তানের পক্ষ হইতে স্যার মহম্মদ জাফরউল্লা এই প্রস্তাবের যে জবাব দেন তাহাতে বলা হয় যে, পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের মতামত আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের উপর প্রযোজ্য নহে কিম্বা ইহা তাহাদের মতামত নহে। আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট যাহাতে এই প্রস্তাব

মানিয়া নেয় । জন্য পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতে প্রস্তুত থাকিলেও অস্ত্র সম্বরণের আদেশ জারী করার ক্ষমতা এবং যুদ্ধ বিরতির সর্ত্ত নির্দ্ধারণের অধিকার কেবলমাত্র আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টরই আছে। স্যার জাফরউল্লা আরও বলেন যে, আজাদ কাশ্মীর বাহিনী যে অঞ্চল অধিকার করিয়া আছে যুদ্ধবিরতিকালে সে অঞ্চল তাহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীন রাখিতে হইবে এবং আজাদ কাশ্মীর ফৌজকে যথাযথভাবে বজায় রাখিতে হইবে। ভারতীয় ফৌজের উপস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতীয় ফৌজ থাকিলে পক্ষপাতহীন গণ-ভোটের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে না। পাকিস্তানের জবাবে এই সর্ত্ত আরোপ করা হয় যে, কমিশন তাহাদের নিকট কিম্বা ভারত গবর্ণমেণ্টর নিকট যে সব বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উভয়েরই গ্রহণ যোগ্য হওয়া আবশ্যক, আর ভারত গবর্ণমেণ্টকে স্বস্তি-পরিষদের এপ্রিল মাসের প্রস্তাব অনুযায়ী গণ-ভোট গ্রহণে স্বীকৃত হইতে হইবে।

পাকিস্তান ভারতীয় ডোমিনিয়ন আক্রমণ করিয়াছে এই বাস্তব সত্য প্রমাণিত হইবার পরে অস্ত্র সম্বরণ, যুদ্ধবিরতি এবং তৎপরবর্ত্তী জনমত গ্রহণ সম্পর্কে যে বিশদ ব্যাখ্যা দাবী করে জাতিসঙ্ঘের কমিশন তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন নাই। কিন্তু পাকিস্তানের প্রবঞ্চনা ধরা পড়িবার পরে আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টকে শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া পাকিস্তান আত্মদোষ ক্ষালনের যে প্রয়াস পায় কমিশনের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। আজাদ কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট এবং তাহার ফৌজ আসলে যে কি, কমিশনের সভাপতি কর্ত্তৃক স্যার জাফরউল্লার নিকট লিখিত ১৯শে আগষ্টের পত্রে তাহা সুপ্রকাশ। পাকিস্তানের জিজ্ঞাসার জবাবে এই পত্রের এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, "কমিশন ৪ঠা আগষ্ট (১৯৪৮) পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের নিকট যে প্রশ্নপত্র পেশ করিয়াছিলেন তাহার জবাবে পররাষ্ট্র সচিব জানান যে, পাকিস্তান

গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আজাদ কাশ্মীর ফৌজকে পরিচালনার দায়িত্ব বহন করিতেছে।......পাকিস্তান বাহিনীর হাই কমাণ্ড ৮ই আগষ্ট জানাইয়াছেন যে, আজাদ কাশ্মীর ফৌজ সৈন্য চালনার দিক্ হইতে (অপারেশনালী) পাকিস্তান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অবস্থায় আজাদ কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপে কমিশনের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট তাহা উপলব্ধি করেন বলিয়াই কমিশনের বিশ্বাস।"

যাহা হউক জোসেফ করবেলের ভাষায়, পাকিস্তান সর্ত্তাধীনে ছাড়া ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় অস্ত্রসম্বরণের আদেশ এখনই কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব নহে, গত ৬ই সেপ্টেম্বর এই কথা ঘোষণা করিয়া জাতিসঙ্ঘের কমিশন স্বস্তি পরিষদের নিকট রিপোর্ট দিবার উদ্দেশ্যে ভারত ভূমি ত্যাগ করেন। প্যারীতে ফিরিয়া কমিশন এক কিস্তি রিপোর্ট দিলেন। উহাতে কাশ্মীর রাজ্যে পাকিস্তানী সৈন্যদলের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হইলেও, এই অবস্থায় স্বস্তি পরিষদের কি করা উচিত সে সম্পর্কে কোনও সুপারিশ করা হয় নাই।

কিন্তু স্বস্তি পরিষদের ইঙ্গ-মার্কিণ সদস্যগণ প্রথমাবধি যে অপ্রিয় বাস্তব সত্য এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন কমিশনের রিপোর্টের পরে তাহা উপেক্ষা করা কষ্টকর হইয়া পড়িল। এই রিপোর্টে দুইটি জিনিষ প্রতিপন্ন হয়,—(১) পাকিস্তান স্বস্তিপরিষদকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে; (২) সে প্রকৃতই আক্রমণকারী। পাকিস্তানকে যদি আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় তবে কয়েকটি জিনিষ অনিবার্য্য হইয়া ওঠে—কাল্পনিক সমদর্শিতার ভিত্তির উপর উপর দাঁড়াইয়া কাশ্মীর সমস্যা মিটাইবার চেষ্টা করা নিতান্তই বিসদৃশ হইয়া পড়ে।

এই অবস্থায় জাতিসঙ্ঘের কমিশন ব্যর্থ দৌত্যের সূত্র ধরিয়া পুনরায় ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। জাতিসঙ্ঘের প্যারী অধিবেশন কালেই এই নূতন আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং আলোচনা খানিকটা অগ্রসর হইলে কমিশনের সদস্য ডাঃ লোজানো গণভোটের মূলনীতি সংক্রান্ত নিম্নোক্ত খসড়া প্রস্তাব লইয়া পুনরায় ভারতে আসিলেন। প্রস্তাবটি কমিশনের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাবের সম্পূরক।

(১) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারত বা পাকিস্তানে যোগদান অবাধ এবং পক্ষপাতহীন গণভোট দ্বারা স্থির হইবে।

(২) ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাবে অস্ত্রসম্বরণ এবং যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা কার্য্যকরী হইবার পর কমিশন যখন দেখিবেন গণভোট সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র গৃহীত হইয়াছে তখনই গণভোট নেওয়া হইবে।

(৩) (ক) জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল কমিশনের সহিত একমত হইয়া গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থাপক (এড্‌মিনিষ্ট্রেটর) নিয়োগ করিবেন এবং ইনি উচ্চ আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং সাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তি হইবেন। কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট রীতিসম্মত পদ্ধতিতে তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন।

(৩) (খ) গণভোটের প্রধান ব্যবস্থাপক এই গণভোট সংগঠন, পরিচালনা এবং ইহার পক্ষপাতহীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যতটা ক্ষমতা পাওয়া প্রয়োজন মনে করেন কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টকে ততটা ক্ষমতা তাহাকে দিতে হইবে।

(৩) (গ) প্রধান ব্যবস্থাপক নিজের প্রয়োজন অনুসারে কর্ম্মচারী ও পর্য্যবেক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) (ক) কমিশনের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাবের অস্ত্র সম্বরণ এবং যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত অংশ প্রযুক্ত হইবার পরে কমিশন যখন বুঝিবেন যে, রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে তখন কমিশন এবং গণ-ভোটের ব্যাবস্থাপক ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতীয় ফৌজের চূড়ান্ত সংস্থিতি নির্দ্ধারণ করিবেন। রাজ্যের নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং গণভোটের স্বাধীনতা এই দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া এই ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

(৪) (খ) পাকিস্তান হাইকমাণ্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের সৈন্য সংস্থান কমিশন ও গণভোট ব্যবস্থাপক স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে স্থির করিবেন।

(৫) গণভোটের ব্যবস্থাপত্র এবং উহা গ্রহণের জন্য রাজ্যের সমস্ত দেওয়ানী ও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহকে গণভোট ব্যবস্থাপকের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

(৬) (ক) হাঙ্গামার জন্য যে সমস্ত প্রজা রাজ্য ছাড়িয়া গিয়াছে তাহাদের ফিরিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং তাহাদের নাগরিক অধিকার ভোগ করিতে দিতে হইবে। ইহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের সৌকর্য্যের জন্য ভারত কর্ত্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি এবং পাকিস্থান-মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া একটি কমিশন গঠন করিতে হইবে। কমিশন দুইটি, গণভোট ব্যবস্থাপকের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবে। এই বিধানটি কার্য্যকরী করার জন্য ভারত, পাকিস্তান এবং কাশ্মীর রাজ্যের সমস্ত কর্ত্তৃপক্ষকে ব্যবস্থাপকের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে।

(৬) (খ) রাজ্যের প্রজা ব্যতীত অপর যত লোক ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পরে আইনসঙ্গত কাজে ছাড়া রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের চলিয়া যাইতে হইবে।

(৭) কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সমস্ত কর্ত্তৃপক্ষকে গণভোট ব্যবস্থাপকের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে যাহাতে (ক) ভোটারদের ভয় দেখান, তাহাদের উপর জবরদস্তি করা, ঘুষ দেওয়া কিম্বা অসঙ্গত প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব না হয়; (খ) রাজ্যের মধ্যে বিধিসম্মত রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত না হয়; মতবাদ ও দল নির্ব্বিশেষে সকল প্রজা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিতে পারে; সংবাদপত্র, বক্তৃতা এবং সভাসমিতি, রাজ্যে আইনসম্মত ভাবে প্রবেশ ও বহির্গমনের স্বাধীনতা সহ সর্ব্বত্র চলাচলের সুযোগ থাকে; (গ) সমস্ত রাজবন্দী মুক্তি পায়; (ঘ) সংখ্যা-লঘুদের অধিকার যথোচিত রক্ষিত হয়, এবং (ঙ) কাহাকেও শাস্তিবিধান করা না হয়।

(৮) প্রয়োজন মনে করিলে ব্যবস্থাপক কমিশনের সাহায্য চাহিতে পারিবেন এবং কমিশন তাহাদের উপর অর্পিত যে কোন কাজ করার ভার ব্যবস্থাপকের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৯) গণভোটের পরে ব্যবস্থাপক কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট এবং কমিশনকে উহার ফলাফল জানাইবেন। অতঃপর কমিশন স্বস্তি পরিষদের নিকট রিপোর্ট দিবেন গণভোট অবাধ এবং পক্ষপাতহীন ভাবে গৃহীত হইয়াছে কিনা।

(১০) যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পরে উপরিউক্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। গণভোটের ব্যবস্থাপক পুরাপুরিভাবে এই আলোচনায় যোগ দিতে পারিবেন।

ডাঃ লোজানো এবং জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ কোলবান এই প্রস্তাব লইয়া নয়াদিল্লী ও করাচীতে আলোচনা আরম্ভ করেন এবং তাহাদের এই দৌত্য সফল হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ২৩শে ডিসেম্বরের পত্রে এবং পাকিস্তান ২৫শে ডিসেম্বর

তারিখে লিখিত এক পত্রে এই মূলনীতি মানিয়া নেন। অতঃপর ডাঃ লোজানোর এই মিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে কমিশন কোন সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বেই ভারত অস্ত্র সম্বরণের সিদ্ধান্ত করে। ভারত সরকারের নির্দ্দেশ পাইয়া ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল রয় বুশার পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতিকে জানান যে, ভারতীয় ফৌজ অস্ত্রসম্বরণ করিতে রাজী আছে যদি পাকিস্তানী ফৌজ যুগপৎ অস্ত্রসম্বরণে সম্মত হয়। ভারতীয় সেনানীর প্রস্তাবে পাকিস্তানের সেনাপতি সম্মত হইলেন এবং খ্রীষ্টীয় নববর্ষের প্রথম দিবসে রাত্রি বারোটার এক মিনিট পূর্ব্বে চৌদ্দমাস যুদ্ধের পরে উভয় পক্ষ অস্ত্র সম্বরণ করিল।

জাতিসঙ্ঘের কমিশনের প্রস্তাব অনুসারে অস্ত্রসম্বরণে সম্মত হইয়া পাকিস্তান তাহার কূটনীতির চরম পরাভব মানিয়া লইল। জোর জবরদস্তি করিয়া কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের যে চেষ্টা সে করে চৌদ্দমাস পরে তাহা ব্যর্থ হইল,—কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাশ্মীরীদের রায় মানিয়া নিতে তাহাকে বাধ্য হইতে হইল। ভারত অবশ্য বরাবরই এই নীতি অনুসরণ করিয়াছে যে, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ কাশ্মীরী জনগণের মতামত দ্বারা নিরূপিত হইবে। তবে কাশ্মীরী জনগণের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের ব্যাপারে বাহিরের কাহাকেও, বিশেষভাবে আক্রমণকারী পাকিস্তানকে, প্রভাব বিস্তারের কোন সুযোগ দিতে সে কোন কালেই সম্মত হয় নাই। স্বস্তি পরিষদ এপ্রিল মাসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহাতে এই প্রভাব বিস্তারের প্রচুর সুযোগ ছিল। তাই ভারত গবর্ণমেণ্ট উহা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের কমিশন যুদ্ধবিরতি এবং জনমত গ্রহণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার মধ্যে ভারতের বহু দাবীর ন্যায্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। গণভোট সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু এবং ডাঃ লোজানোর মধ্যে গত ডিসেম্বর

মাসে যে আলোচনা হয় তাহার বিবরণীতে দেখা যায় যে, কমিশন গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে ভারত সরকারের বহু দাবী মানিয়া লইয়াছেন। নিরপেক্ষ তদারকীতে গণভোট গ্রহণে ভারত কোন কালেই আপত্তি করে নাই কিন্তু গণভোট ভোট-কর্ত্তৃপক্ষকে কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের উপর কর্ত্তৃত্ব করার অধিকার দিতে সে প্রস্তুত ছিল না। এক্ষণে ডাঃ লোজানো স্বীকার করিয়াছেন যে, জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের মনোনীত ব্যবস্থাপক গণভোট গ্রহণ করিলেও, তিনি স্বাভাবিক শাসন কার্য্য পরিচালনায় কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের অধিকার হরণ করিবেন না। গণ-ভোটের ব্যবস্থাপত্র করা এবং উহা যাহাতে পক্ষপাতহীন হয় তাহার বন্দোবস্ত করাই তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইবে। আজাদ কাশ্মীর ফৌজরূপী পাকিস্তানের চরগণ যাহাতে ভীতি প্রদর্শন করিয়া গণ-ভোটকে প্রভাবিত করিতে না পারে এজন্য কমিশন "ব্যাপকভাবে তাহাদের নিরস্ত্র করার" প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। ইহাদের অধিকৃত অঞ্চলে কর্ত্তৃত্বের প্রশ্ন পূর্ব্বেই ভারতের দাবীর অনুকূলে মীমাংসিত হইয়াছে। গণভোটের পূর্ব্বে পাকিস্তান বাহিরের লোক পাঠাইয়া যাহাতে ভুয়াভোট সংগ্রহ করিতে না পারে এজন্য রাজ্যে প্রবেশ সম্পর্কে পারমিট ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকৃত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক ধ্বনি তুলিয়া পাকিস্তান যাহাতে কাশ্মীরীদের প্রভাবিত করিতে না পারে, তাহার জন্য ভারতের দাবী অনুযায়ী ডাঃ লোজানো স্বীকার করিয়াছেন যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা হানির সম্ভাবনাপূর্ণ কার্য্যাবলী বিধিসঙ্গত রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের আওতায় পড়িবে না। রাজ্যে ভারতীয় ফৌজের অবস্থিতি সম্পর্কে স্বস্তি পরিষদের নির্দ্দেশ সংশোধন করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট গণভোট গ্রহণের কালে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য রাখিতে পারিবে; পক্ষান্তরে পাকিস্তানের সমস্ত ফৌজ এবং তাহার

অধীনস্থ সমস্ত ফৌজ প্রত্যাহার করিতে হইবে। তবে ইহাদের মধ্যে যাহারা কাশ্মীরের স্থায়ী বসিন্দা তাহারা নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিতে পারিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাতি সঙ্ঘের কমিশন মোটামুটিভাবে ভারতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দাবী অনুমোদন করিয়াই গণভোটের ব্যবস্থা করিলেন।

তবে এসত্ত্বেও অগৌণে কাশ্মীরে গণভোট গৃহীত হইবে এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। যুদ্ধবিরতি হইলেই গণভোট গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কাশ্মীরের যত প্রজা রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাদের পুনর্ব্বসতির বন্দোবস্ত না করিয়া গণভোট গ্রহণ করা কষ্টকর। এ ছাড়া এই সম্পর্কে এমন কতগুলি অবস্থা দেখা দিতে পারে যাহার ফলে গণভোট গ্রহণ অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় নেহরু লোজানো আলোচনায় স্থির করা হইয়াছে যে, "জাতি সঙ্ঘের নিযুক্ত গণভোট ব্যাবস্থাপক কাশ্মীর রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় গণভোট গ্রহণ আদৌ সম্ভব কিনা তাহা পূরাপূরিভাবে পর্য্যালোচনা করার পরে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে গণভোট গৃহীত হইতে পারিবে। কিন্তু তিনি যদি গণভোট গ্রহণ অসম্ভব বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনগণের স্বাধীন মতামত নির্ণয়কল্পে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচিত হইতে পারিবে।"

সমস্ত সিদ্ধান্ত ও বিধিবিধানের মধ্যে এই সিদ্ধান্তটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়। এই সিদ্ধান্তের মধ্যেই কাশ্মীর বিভাগের বীজ নিহিত আছে কিনা আজও তাহা সুস্পষ্ট নহে। স্বস্তি পরিষদের ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ প্রথমাবধি পাকিস্তানকে তুষ্ট করার জন্য যে কূট কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহার ভিত্তিতে তাহাদের এপ্রিল মাসের প্রস্তাব গৃহীত হয়, অবস্থাচক্রে সরাসরিভাবে তাহা পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। এই বিধানে জাতি সঙ্ঘের সেক্রেটারী

জেনারেল কর্তৃক মনোনীত এবং স্বভাবতঃই ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের আস্থাভাজন গণভোট ব্যবস্থাপককে যে ক্ষমতা দেওয়া হইল তাহার মারফতে আন্তঃ ডোমিনিয়ন মৈত্রীর ধ্বনি তুলিয়া সুকৌশলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইবে না হলপ করিয়া একথা বলা কষ্টকর। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণ করা যে একরূপ অসম্ভব একথা সকলেই স্বীকার করিবে। আর সব ব্যবস্থাপত্র করা সম্ভব হইলেও দুই চারি মাসের মধ্যে বাস্তুত্যাগীদের পুনর্ব্বসতির বন্দোবস্ত করা সম্ভব হইবে না। শেখ মহম্মদ আবদুল্লা সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক সভায় (২৫-১-৪৯) কাশ্মীর বিভাগের বিরুদ্ধে যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহার মধ্যে হয়ত এই শঙ্কার ইঙ্গিতই রহিয়াছে। উভয় পক্ষ কমিশনের প্রস্তাব মানিয়া লইবার পরেও শেখ সাহেব কেন বলিলেন—"কাশ্মীর ভাগ করিয়া কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান করা যাইবে না। গোটা কাশ্মীর ভারতের সহিত যুক্ত হইবে, না পকিস্তানের সহিত যুক্ত হইবে ইহাই আসল প্রশ্ন। কাশ্মীরকে বিভক্ত করা চলিবে না—এ রায় অধিকাংশ কাশ্মীরী ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছে।"

তাছাড়া কাশ্মীরে স্বাধীন ভাবে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাবে পাকিস্তানও আজ বিশেষ উৎসাহ বোধ করিবে বলিয়া মনে হয় না। আজিকার কাশ্মীর যদি শুধু ডোগরা রাজ হরিসিংহের কাশ্মীর হইত তবে তাহার তত দুশ্চিন্তা হইত না। কিন্তু গত ১লা মার্চ্চ (১৯৪৭) হইতে উহা শেখ আবদুল্লার কাশ্মীরে—কাশ্মীরীদের কাশ্মীরে রূপান্তরিত হইয়াছে। কাশ্মীরে লোকায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন এবং ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয়পরিষদ গঠনের ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া মহারাজা যেদিন সরিয়া দাঁড়াইলেন সেই দিনই এক নূতন কাশ্মীর জন্মলাভ করিল। এই যুদ্ধকালেই পুরানো কাশ্মীর এক নিঃশব্দ বিপ্লবের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। নয়া কাশ্মীরের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ শেখ

আবদুল্লা এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ সামন্ত স্বৈরাচারে প্রপীড়িত হৃতদরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য যে সমস্ত সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেছেন এবং তাহার ফলে যে নূতন কাশ্মীরের বুনিয়াদ রচিত হইতেছে সাম্প্রদায়িকতাবাদী পাকিস্তান তাহার নিকট কোন প্রত্যাশাই করিতে পারে না। হানাদারদের পৈশাচিক অত্যাচারের বর্ব্বরতা পাকিস্তান সম্পর্কে কাশ্মীরীদের মনে সঞ্চারিত করিয়াছে কেবলমাত্র পুঞ্জীভূত ঘৃণা।

অতএব, চৌদ্দ মাস ব্যাপী কঠোর সংগ্রামের পরে বিধ্বস্ত কাশ্মীরের বুকে শান্তি ফিরিয়া আসিলেও তাহার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি হইবে এখনও তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

পরিশিষ্ট

(১) ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদানের সর্ত্তপত্র

………(রাজ্যের নাম) যোগদানের সর্ত্তপত্র

যেহেতু ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান ইনডিপেডেন্স এ্যাক্ট অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে "ইণ্ডিয়া" নামে একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বড়লাটের আদেশ অনুযায়ী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত অথবা সংশোধিত আকারে ভারতীয় ডোমিনিয়ন সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে;

এবং যেহেতু ১৯৩৫ সালের এবম্বিধ পরিবর্ত্তিত ভারত শাসন আইনে বিধান আছে যে, রাজ্যের শাসক যোগদানের সর্ত্তপত্রে সহি করিলে যে কোন ভারতীয় রাজ্য ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিতে পারে;

অতএব, আমি……(শাসকের নাম)……(রাজ্যের নাম) রাজ্যের শাসনকর্ত্তা উক্ত রাজ্যের উপর আমার সার্ব্বভৌমত্বের ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা আমার যোগদানের সর্ত্তপত্র স্বাক্ষর করিতেছি এবং

(১) আমি এতদ্দ্বারা ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতেছি এবং ভারতের বড়লাট, ডোমিনিয়ন আইন সভা, ফেডারেল কোর্ট এবং ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অন্যান্য যে কোন ডোমিনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষ এই সর্ত্তপত্র অনুসারে কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় ইহার সর্ত্ত অনুযায়ী এবং একমাত্র ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে আমার রাজ্য সম্পর্কে ১৯৪৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এই পরিশিষ্টে মূল চুক্তিসর্ত্তসমূহের মর্ম্মানুবাদ দেওয়া হইল।

সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভারতীয় ডোমিনিয়নে বলবৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা তাহাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) আমি এতদ্বারা এই আইনের বিধান আমার রাজ্যে কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি; অবশ্য উহা যতটা আমার যোগদানের সর্ত্তপত্র অনুসারে প্রযোজ্য।

(৩) আমি মানিয়া লইতেছি যে, ডোমিনিয়ন আইন সভা আমার রাজ্য সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তপশীলে বর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৪) আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি, আমি এই প্রতিশ্রুতির পর ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিতেছি যে, বড়লাট ও রাজ্যের শাসনকর্ত্তার মধ্যে যদি এইরূপ কোন চুক্তি হয় যাহার ফলে ডোমিনিয়ন আইন সভার কোন আইন রাজ্যের মধ্যে কার্য্যকরী করিবার অধিকার রাজ্যের শাসনকর্ত্তা প্রাপ্ত হন তবে ঐ চুক্তি এই সর্ত্তপত্রের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুযায়ী কার্য্যকর হইবে।

(৫) ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স এ্যাক্ট অথবা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে কার্য্যকরী ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কোন সংশোধনের দরুণ আমার যোগদানের সর্ত্তপত্র পরিবর্ত্তিত হইবে না যদি আমি উক্ত সংশোধন এই যোগদানের সর্ত্তপত্রের এক ক্রোড়পত্রে স্বীকার করিয়া না নেই।

(৬) এই সর্ত্তপত্র অনুসারে ডোমিনিয়ন আইন সভা কোনও কারণে আমার রাজ্যে বাধ্যতামূলকভাবে কোন জমি দখল করার অধিকারী হইবেন না; তবে আমি এতদ্বারা অঙ্গীকার করিতেছি যে, এই রাজ্য সম্পর্কে প্রযোজ্য কোন ডোমিনিয়ন আইনের জন্য ডোমিনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষের যদি কোন জমি দখল করার প্রয়োজন হয় তবে আমি তাহাদের

অনুরোধক্রমে এবং তাহাদের ব্যয়ে প্রয়োজনীয় জমি দখল করিয়া দিব। উক্ত জমি যদি আমার খাসে থাকে তবে আমি আপোষ-চুক্তিসর্ত্ত মতে উহা হস্তান্তরিত করিব; আপোষ-চুক্তি সম্ভব না হইলে ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত সালিশের সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য থাকিব।

(৭) এই সর্ত্তপত্রের কোন কিছুর দরুণ আমি কোনরূপে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কিছু মানিয়া লইতেছি ইহা বুঝাইবে না; অথবা ইহা দ্বারা আমি ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত কোনরূপ চুক্তি করা না করার অধিকারচ্যুত হইব না।

(৮) এই সর্ত্তপত্রের কোন কিছু রাজ্যের উপর আমার সার্ব্বভৌমত্ব কোনরূপে ক্ষুণ্ণ করিবে না; কিম্বা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হিসাবে আমি এক্ষণে যে কর্ত্তৃত্ব, ক্ষমতা বা অধিকার ভোগ করিতেছি এবং রাজ্যে এক্ষণে যে সমস্ত আইন বলবৎ আছে, যোগদানের সর্ত্তপত্রের বিধানের বাহিরে তাহার প্রয়োগও কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

(৯) এতদ্দ্বারা আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি রাজ্যের পক্ষ হইতে এই সর্ত্তপত্রে সহি করিতেছি এবং এই সর্ত্তপত্রে আমার সম্পর্কে কিম্বা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা আমার উত্তরাধিকারীদেরও বুঝাইবে।

১৯৪৭ সালের……আগষ্ট তারিখে আমার হস্তে অর্পিত হইল।

আমি এতদ্দ্বারা যোগদানের সর্ত্তপত্র অনুমোদন করিতেছি।

১৯৪৭ সালের………আগষ্ট

ভারতের গবর্ণর জেনারেল

সংশ্লিষ্ট তপশীল

যোগদানের সর্তপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট এই তপশীলে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কে ডোমিনিয়ন আইন সভা যোগদানকারী রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন :—

(ক) দেশরক্ষা :

(১) ডোমিনিয়নের নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনী। ডোমিনিয়ন কর্তৃক সংগৃহীত এবং পোষিত অন্য যে কোন সশস্ত্র বাহিনী। যোগদানকারী রাজ্য কর্তৃক সংগৃহীত ও পোষিত সৈন্যদল সহ ডোমিনিয়নের যে কোন সশস্ত্র বাহিনীর সহিত সংযুক্ত অথবা অভিযানে নিযুক্ত যে কোন সশস্ত্র বাহিনী।

(২) মিলিটারী, নৌ ও বিমান বাহিনীর কারখানা; ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায় শাসন সংরক্ষণ।

(৩) অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

(৪) বিস্ফোরক।

(খ) পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক :

(১) পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক; অন্যান্য দেশের সহিত নিষ্পন্ন সন্ধি ও চুক্তির প্রয়োগ; অপরাধী প্রত্যর্পণ—ভারত ব্যতীত রাজার অন্যান্য ডোমিনিয়নে অপরাধী ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্পণ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(২) ভারতে প্রবেশের অনুমতি, দেশত্যাগ ও বহিষ্কার। যাহারা ভারতে বসবাসকারী বৃটিশ প্রজা নহে অথবা যোগদানকারী রাজ্যের প্রজা নহে তাহাদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ ইহার অন্তর্ভুক্ত; ভারতের বাহিরে তীর্থযাত্রা।

(৩) বসবাসের দ্বারা প্রজাধিকার লাভ।

(গ) যোগাযোগ ব্যবস্থা :

(১) ডাক ও তার ব্যবস্থা—টেলিফোন, বেতার, ব্রডকাষ্টিং এবং এই জাতীয় অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ।

(২) ফেডারেল রেলওয়ে : ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেল পথ ছাড়া সমস্ত রেল-পথের নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বনিম্ন ভাড়া ও মাশুল নির্দ্ধারণ, ষ্টেশন ব্যবস্থা, গাড়ীর পারস্পরিক পরিবর্ত্তন, মাল ও যাত্রী বহন সম্পর্কে রেল পথ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব। মাল ও যাত্রী বহন সম্পর্কে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেলপথের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং পরিচালনার দায়িত্ব।

(৩) বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল। নৌ-বিভাগের একতেয়ার।

(৪) বন্দরসমূহে ক্যারেন্টিন ব্যবস্থা।

(৫) প্রধান প্রধান বন্দর—অর্থাৎ কোন্ কোন্ বন্দর এইরূপ তাহা নিরূপণ এবং তাহার সীমা নির্দ্ধারণ। বন্দর কর্ত্তৃপক্ষ গঠন ব্যবস্থা ও তাহাদের ক্ষমতা নিরূপণ।

(৬) বিমান ও বিমান চলাচল ; বিমান ঘাঁটির ব্যবস্থা, বিমান ঘাঁটি ও বিমান চলাচলের ব্যবস্থা।

(৭) লাইট হাউস। জাহাজ ও বিমানের নিরাপত্তা সম্পর্কিত অন্যান্য যাবতীয় আলোকব্যবস্থা ইহার অন্তর্গত।

(৮) সমুদ্রপথে অথবা বিমান পথে যাত্রী ও মাল বহন।

(৯) কোন রেলওয়ে এলাকার পুলিশ দলের উক্ত এলাকার বাহিরে ক্ষমতা ও একতেয়ার বৃদ্ধি।

(ঘ) অধীনস্থ বিষয় :

(১) ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টে বলবৎ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং সেই আইন অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ অনুসারে ডোমিনিয়ন আইন সভার নির্ব্বাচন।

(২) উপরিউক্ত বিষয়ের যে কোনটি সম্পর্কে আইন ভঙ্গের অপরাধ।

. (৩) উপরিউক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে তদন্ত ও তথ্যাদি নিরূপণ।

(৪) উপরিউক্ত যে কোন বিষয় সম্পর্কে সমস্ত ধর্ম্মাধিকরণের ক্ষমতা ও একতেয়ার ; তবে যে সমস্ত ধর্ম্মাধিকরণ যোগদানকারী রাজ্য সম্পর্কে এই অধিকার প্রয়োগ করিতেছেন তদ্ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মাধিকরণকে রাজ্যের শাসনকর্ত্তার সম্মতি ব্যতীত কোন ক্ষমতা বা একতেয়ার দেওয়া যাইবে না।

---

(২) স্থিতাবস্থা চুক্তি ঃ

ভারতীয় ডোমিনিয়ন এবং…রাজ্যের মধ্যে চুক্তি ঃ

নূতন কোন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্বার্থমূলক বিষয়ে বর্ত্তমান চুক্তি এবং বন্দোবস্তসমূহ বহাল রাখা ভারতীয় ডোমিনিয়ন এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহ উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক বিধায়, উহা সাময়িকভাবে ভারতীয় ডোমিনিয়ন কিম্বা তাহার কোন অংশ এবং ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে বলবৎ থাকিবে।

অতএব, ভারতীয় ডোমিনিয়ন এবং…রাজ্যের মধ্যে চুক্তি করা হইল যে,—

(১) (ক) নূতন কোন চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, বৃটিশ রাজশক্তি এবং যে কোন ভারতীয় রাজ্যের মধ্যে যত চুক্তি ও বন্দোবস্ত বিদ্যমান ছিল তাহা ভারতীয় ডোমিনিয়ন, তাহার অংশ এবং এই রাজ্যের মধ্যে (যতটা প্রযোজ্য) বলবৎ থাকিবে।

(খ) বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট তপশীলে উল্লেখিত বিষয়সমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। তবে উহা দ্বারা "ক" উপধারার সাধারণ বিধানের কোন অপহ্নব হইবে না।

(২) এই চুক্তি সম্পর্কে কিম্বা ইহা দ্বারা যে সমস্ত চুক্তি এবং বন্দোবস্ত বলবৎ রাখা হইল তৎসম্পর্কে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে তাহা যথাসম্ভব ১৮৯৯ সালে ইণ্ডিয়ান আরবিট্রেশন এ্যাকট অনুসারে মীমাংসিত হইবে। বড়লাট কিম্বা গবর্ণর ব্যতীত অপর কোন কর্তৃপক্ষ দ্বারা মীমাংসার সুস্পষ্ট বিধান থাকিলে এই সর্ত্ত প্রযোজ্য হইবে না।

তপশীল

(১) বিমান চলাচল; (২) অস্ত্র শস্ত্র; (৩) দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ; (৪) মুদ্রা ব্যবস্থা; (৫) শুল্ক ব্যবস্থা; (৬) ভারতীয় রাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী; (৭) বৈদেশিক সম্পর্ক; (৮) অপরাধী প্রত্যর্পণ; (৯) আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ; (১০) সেচ এবং বৈদ্যুতিক শক্তি; (১১) মোটর যান; (১২) জাতীয় পথ; (১৩) আফিম; (১৪) ডাক, তার ও টেলিফোন; (১৫) রেলওয়ে (রেলওয়ের জমিতে পুলিশ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা সহ); (১৬) লবণ (১৭) কেন্দ্রীয় অন্তঃ শুল্ক, দুইবার আয়কর হইতে অব্যাহতি এবং ট্যাক্স সম্পর্কে অন্যান্য ব্যবস্থা; (১৮) বেতার।

(৩) কাথিয়াবাড় যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি :—

কাথিয়াবাড়ের জনগণের মঙ্গল সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মারফতে যুক্তরাজ্যের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সঙ্কল্প করিয়া ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে কাথিয়াবাড়ের ষ্টেট, এষ্টেট এবং তালুকার রাজন্যবর্গ নিম্নোক্ত চুক্তি করেন :—

১ম ধারা :—চুক্তিবদ্ধ রাজ্য, চুক্তিবদ্ধ স্যালুট ষ্টেট্, চুক্তিবদ্ধ নন-স্যালুট ষ্টেট্ এবং শাসক বলিতে কি বুঝায় প্রথম ধারায় তাহা উল্লেখিত হইয়াছে।

২য় ধারা :—চুক্তিবদ্ধ রাজ্যসমূহের শাসকগণ স্থির করিতেছেন যে, তাঁহারা কাথিয়াবাড় যুক্তরাজ্য নামে একটি রাষ্ট্রাংশে তাঁহাদের রাজ্যসমূহকে সংযুক্ত করিবেন এবং উহার জন্য একটি আইন সভা ও বিচার বিভাগ এবং শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে অপর যে রাজ্য, তালুক বা এষ্টেট যুক্তরাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে সম্মত হইবে তাহারাও যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এইরূপ অন্তর্নিবেশের চুক্তির সমস্ত সর্ত্ত যুক্তরাজ্যের উপর প্রযোজ্য হইবে এবং উহা এই চুক্তির অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩য় ধারা :—চুক্তিবদ্ধ স্যালুট ষ্টেটগুলির শাসকদের লইয়া একটি রাজন্য পরিষদ গঠন করা হইবে। ইহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত ন্যূনপক্ষে ২১ বৎসর বয়স্ক পাঁচজন শাসক লইয়া একটি সভাপতি-মণ্ডলী গঠন করা হইবে। নবনগর ও ভবনগরের রাজা সভাপতি-মণ্ডলীর স্থায়ী সদস্য হইবেন; একজন সদস্য নন-স্যালুট্ ষ্টেটগুলির শাসকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন; বাকী দুইজন সদস্য নবনগর ও ভবনগরের শাসক ছাড়া রাজন্য পরিষদের অন্যান্য শাসক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সভাপতি মণ্ডলীর একজন রাজন্য পরিষদ কর্ত্তৃক সভাপতি

পদে এবং আর একজন সহকারী সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইবেন। সভাপতি রাজপ্রমুখ নামে অভিহিত হইবেন। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যগণ এবং সহ সভাপতি পাঁচ বৎসর উহার সদস্য থাকিতে পারিবেন। (নবনগরের জামসাহেব সভাপতি, ভবনগরের রাজা সহসভাপতি এবং ধাড়ঙ্গধর, পলিতানা ও কোটাসাঙ্গনীর রাজা প্রথম সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন।)

৪র্থ ধারা :—বোম্বাইয়ের গবর্ণর ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী যে ভাতা, মাহিনা ও সুযোগ সুবিধা পাইবার অধিকারী রাজপ্রমুখ তৎসমুদয় পাইবেন। রাজপ্রমুখ অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে সহসভাপতি তাহার কাজ করিবেন এবং ঐ সময়ের জন্য রাজপ্রমুখের ভাতা, মাহিনা প্রভৃতি পাইবেন।

৫ম ধারা :—সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে রাজপ্রমুখকে পরামর্শ দিবার জন্য এবং সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকিবে। রাজপ্রমুখ মন্ত্রী মনোনয়ন করিবেন এবং মন্ত্রিদের স্বপদে বহাল থাকা না থাকা রাজপ্রমুখের উপর নির্ভর করিবে। প্রথম মন্ত্রীপরিষদ গঠনের জন্য ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে যে নির্ব্বাচক মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে কচ্ছ, ইদর এবং রাধনপুরের সদস্যগণ বাদে রাজপ্রমুখকে ২০শে ফেব্রুয়ারীর (১৯৪৮) পূর্ব্বে উহার এক সভা আহ্বান করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ ধারা :—১৫ই এপ্রিলের পূর্ব্বে সমস্ত চুক্তিবদ্ধ রাজ্যসমূহের শাসকদের রাজপ্রমুখের হস্তে তাঁহাদের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে। অতঃপর রাজ্যসমূহের যাবতীয় ক্ষমতা, অধিকার, দায়, সম্পত্তি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যুক্তরাজ্যের উপর বর্ত্তিবে।

৭ম ধারা :—প্রত্যেকটি চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের মিলিটারী যুক্তরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনী হইবে। ভারতে সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে সৈন্যদল গঠন এবং উহার শাসন সংরক্ষণের ক্ষমতা কেবলমাত্র রাজপ্রমুখেরই থাকিবে। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে এ সম্পর্কে মন্ত্রিসভা কিম্বা সভাপতিমণ্ডলীর সহিত আলোচনা করিতে পারিবেন।

৮ম ধারা :—এই চুক্তি এবং তদনুযায়ী প্রণীত শাসনতন্ত্রের সর্ত্তাধীনে যুক্তরাজ্যের শাসন ক্ষমতা রাজপ্রমুখেরই থাকিবে; তিনি নিজে কিম্বা অফিসারের মারফতে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৯ম ধারা :—দ্বিতীয় তপশীলে উল্লেখিত পদ্ধতিতে যত সত্বর সম্ভব একটি শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠন করিতে হইবে। ভারতের শাসনতন্ত্র এবং রাজন্যসমাজের চুক্তির গণ্ডীর মধ্যে ইহাকে যুক্তরাজ্যের জন্য এক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে এবং আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাজ প্রমুখের সম্মতি পাইয়া শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজপ্রমুখ আইন প্রণয়নের ক্ষমতাবান হইবেন। রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং উহার সুশাসনের জন্য তিনি অর্ডিনান্সও জারী করিতে পারিবেন এবং উহা আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত আইনের মর্য্যাদা লাভ করিবে।

১০ম ধারা :—প্রথম তপশীলে উল্লেখিত পদ্ধতিতে চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের রাজন্যবর্গ যুক্তরাজ্যের রাজস্ব হইতে বাৎসরিক ভাতা পাইবেন। উহা দ্বারা তাহাদের যাবতীয় ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। চার কিস্তিতে রাজপ্রমুখ এই টাকা দিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং এই ভাতা কোনরূপ ট্যাক্সের আওতায় পড়িবে না, সে ট্যাক্স ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধার্য্য হউক কিম্বা যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধার্য্য হউক।

১১শ ধারা :—শাসকগণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে শাসন ক্ষমতা ত্যাগের এক মাসের মধ্যে তাহাদের রাজপ্রমুখের নিকট এক হিসাব দাখিল করিতে হইবে। এ সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির রায় চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে।

১২শ ও ১৩শ ধারা :—রাজা কিম্বা রাজ পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে যে ব্যক্তিগত সম্মান ও সুযোগসুবিধা পাইতেন তাহা অব্যাহত থাকিবে। উত্তরাধিকার সম্পর্কে প্রচলিত প্রথা বজায় থাকিবে। এ সম্পর্কে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে কাথিয়াবাড়ের হাইকোর্টের সহিত আলোচনা করিয়া রাজন্য পরিষদ উহার মীমাংসা করিবেন।

১৪শ ধারা :—চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের রাজন্যবর্গ তাহাদের শাসনকালে ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা অন্যভাবে যাহা করিয়াছেন তাহার কোন কিছুর জন্য যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট কিম্বা উহার পক্ষ হইতে কোনরূপ তদন্ত করা চলিবে না কিম্বা রাজ্যের কোন আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে এজন্য কোন নালিশ করা চলিবে না।

১৫শ ধারা :—ভারত সরকার ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনাক্রমে কাথিয়াবাড় গবর্ণমেণ্ট সমস্বার্থমূলক বিষয়ে তদন্ত ও আলোচনার জন্য বোম্বাই ও কাথিয়াবাড়ের মন্ত্রিদের লইয়া একটি যুক্ত উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবেন।

১৬শ ধারা :—কাথিয়াবাড়ের যুক্তরাজ্য গবর্ণমেণ্ট চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদের চাকুরী বজায় রাখার কিম্বা ক্ষতিপূরণ সহ তাহাদের বিদায় দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেছে। পূর্ব্বে তাহারা যে যে পদে বহাল ছিলেন তদপেক্ষা অসুবিধাকর কোন পদে বা সর্ত্তে তাহাদের নিয়োগ করা হইবে না। বিদায় দেওয়া হইলে ইহাদের সঙ্গত

ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। পেন্সন এবং ছুটি সম্পর্কে চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ ইতিপূর্ব্বে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বহাল রাখা হইবে।

১৭শ ধারা :—রাজপ্রমুখের অনুমতি ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের কোন সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কর্ত্তব্য হিসাবে সম্পাদিত তাহার পূর্ব্বের কার্য্যের জন্য কোন ফৌজদারী কিম্বা দেওয়ানী মামলা দায়ের করা চলিবে না।

১৮শ ধারা :—এই চুক্তিসর্ত্ত সত্ত্বেও অন্যান্য গুজরাটি ভাষাভাষী অঞ্চলের সহিত কাথিয়াবাড় ইউনিয়ন গঠনের জন্য আলোচনা করা চলিবে; তবে উহার সর্ত্ত রাজন্যপরিষদ এবং কাথিয়াবাড় যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিপরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম তপশীল :

স্যালুট ষ্টেটের শাসকদের ভাতা

(১) নবনগর—১০,০০,০০০৲
(২) ভবনগর—১০,০০,০০০৲
(৩) পোর বন্দর—৩,৮০,০০০৲
(৪) ধারাঙ্গধর—৩,৮০,০০০৲
(৫) মোরভি—৮,০০,০০০৲
(৬) গোণ্ডাল—৮,০০,০০০৲
(৭) জাফরাবাদ—১৬,০০০৲
(৮) বাঙ্কানের—১,৮০,০০০৲
(৯) পলিতানা—১,৮০,০০০৲
(১০) ধ্রল—১,১০,০০০৲

(১১) লিম্বদি—১,৯৫,০০০৲

(১২) রাজকোট—২,৮৫,০০০৲

(১৩) ওয়াধবান—১,৪২,০০০৲

এই তপশীলে ১৭টি নন-স্যালুট ষ্টেটের শাসকদের জন্যও ভাতা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। উহার পরিমাণ একুনে ১১,৫৭,৭৫০৲।

দ্বিতীয় তপশীল :—শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদের বিধান

(১) প্রতি একলক্ষ অধিবাসীতে একজন সদস্য এই ভিত্তিতে অনধিক ৪৫ জন সদস্য লইয়া পরিষদ গঠিত হইবে। তবে চুক্তিবদ্ধ প্রত্যেকটি স্যালুট ষ্টেটের অধিবাসীদের অন্ততঃ একজন সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার দিতে হইবে—জনসংখ্যা তাহার যাহাই হউক না কেন।

(২) কাথিয়াবাড় রাজ্যকে আঞ্চলিক নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভাগ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন অনুসারে উহাকে এক বা একাধিক সদস্য প্রেরণের অধিকারী নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভাগ করিতে হইবে। নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি যাহাতে চুক্তিবদ্ধ বিভিন্ন রাজ্যের সীমান্তসমূহ অতিক্রম না করে যথা-সম্ভব তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) বোম্বাই'র আইন পরিষদের সদস্য পদপ্রার্থী হইবার জন্য যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন এই পরিষদের সদস্য পদপ্রার্থীদের তাহা থাকিতে হইবে। ভোটার তালিকাও বোম্বাইতে যে ভিত্তির উপর প্রণীত হয় তদনুরূপ ভাবে প্রণীত হইবে। উভয় ব্যবস্থাই প্রয়োজনীয় সংশোধনের সর্ত্তাধীন। তবে কেহ চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের শাসক কিম্বা তালুকদার এই যুক্তিবলে তাহাকে ভোটার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না কিম্বা তাহাকে সদস্য পদপ্রার্থী হইতে বাধা দেওয়া চলিবে না।

(৪) রাজপ্রমুখ এই নির্ব্বাচন সম্পর্কে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ঘোষণা করিবেন।

---

(৪) মাৎস্য যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি ঃ

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত মাৎস্য যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটিভাবে কাথিয়াবাড় যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তির অনুরূপ :—

(১) রাজন্য পরিষদ চুক্তিবদ্ধ সমস্ত কয়টি রাজ্যের শাসকদের লইয়াই গঠিত হইবে। তবে শাসকদের বয়স ন্যূনপক্ষে একুশ বৎসর হওয়া আবশ্যক। সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচনে আলোয়াড়ের শাসকের ৬টি, ভরতপুরের ৪টি, ঢোলপুরের ২টি এবং করাউলীর শাসকের একটি ভোট থাকিবে।

(২) রাজপ্রমুখের মাহিনা এবং রাজন্যবর্গের ভাতা চুক্তির মধ্যে উল্লেখিত নাই। চুক্তিবদ্ধ শাসকদের ১৫ই মার্চ্চের পূর্ব্বে (১৯৪৮) রাজপ্রমুখের হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া দিতে হইবে।

(৩) প্রতি লক্ষজন অধিবাসীতে একজন প্রতিনিধি এই ভিত্তিতে অনধিক ২০ জন নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠিত হইবে এবং রাজপ্রমুখ বিশেষ বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের জন্য অনধিক তিনজন প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবেন। পরিষদের সদস্য এবং ভোটারের যোগ্যতা প্রয়োজনীয় সংশোধনের সর্ত্তাধীনে যুক্তপ্রদেশের আইন পরিষদের অনুরূপ হইবে।

(৫) বিন্ধ্য প্রদেশ যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি ঃ

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত বিন্ধ্য প্রদেশ যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটিভাবে কাথিয়াবাড়ের অনুরূপ :—

(১) চুক্তিবদ্ধ সমস্ত স্যালুট ষ্টেট্, সারিলা, আলীপুরা, শোহাবল, কোথীর শাসক এবং নন-স্যালুট ষ্টেটের শাসকদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত দুইজন শাসক লইয়া রাজন্য-পরিষদ গঠিত হইবে।

(২) রাজপ্রমুখের নির্ব্বাচনে রেওয়ার শাসকের ১৫টি এবং অন্যান্য সকলের এক একটি ভোট থাকিবে।

(৩) রাজপ্রমুখ বৎসরে ৬০ হাজার টাকা মাহিনা পাইবেন। ১৯৪৮ সালের ১লা মে'র পূর্ব্বে চুক্তিবদ্ধ শাসকদের রাজপ্রমুখের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে।

(৪) স্যালুট ষ্টেটের শাসকদের বাৎসরিক ভাতা :

(১)	অজয়গড়	—	৭৪,৭০০৲	(২)	বাওনী	—	৪৬,৮৫০৲
(৩)	বরউন্ধা	—	১৪,৫০০৲	(৪)	বিজাবর	—	৭০,৭০০৲
(৫)	ছত্তরপুর	—	১,০০,৩৫০৲	(৬)	চরখারি	—	৯৫,৯০০৲
(৭)	দাতিয়া	—	১,৫৪,৩০০৲	(৮)	মইহার	—	৫৬,৫০০৲
(৯)	নাগোদ	—	৫৫,৪০০৲	(১০)	অর্কা	—	১,৮৫,৩০০৲
(১১)	পান্না	—	১,৪৭,৩০০৲	(১২)	রেওয়া	—	১০,০০,০০০৲
(১৩)	সমথর	—	৫১,৮০০৲				

বাকী ২২টি নন-স্যালুট্ ষ্টেটের শাসকদের ভাতার পরিমাণ একুনে ২,২১,৯০০৲।

(৫) অনধিক ৩৬ জন নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠিত হইবে। সদস্য পদপ্রার্থী এবং ভোটারের যোগ্যতা যুক্ত-প্রদেশের আইন পরিষদ সম্পর্কিত বিধানের অনুরূপ হইবে। প্রয়োজন বোধে উহা সংশোধন করাও চলিবে।

---

(৬) রাজস্থান যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি ঃ

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত এই যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তিসর্ত্ত মোটামুটিভাবে অন্যান্য যুক্তরাজ্যের অনুরূপ :—

(১) সমস্ত চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের শাসকদের লইয়া রাজন্য-পরিষদ গঠিত হইবে। মেবারের মহারাণা পরিষদের আজীবন সভাপতি হইবেন। কোটার রাজা সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং বুন্দি ও ডুঙ্গরপুরের রাজা উভয়েই জুনিয়র ভাইস প্রেসিডেণ্ট হইবেন। ভাইস-প্রেসিডেণ্টগণ পাঁচ বৎসর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। কোন পদ শূন্য হইলে উহা রাজন্য-পরিষদ কর্ত্তৃক ভোট দ্বারা পূরণ করা হইবে এবং তখন ঐ শূন্য পদের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না।

(২) রাজপ্রমুখ বাৎসরিক নীট্ পাঁচ লক্ষ টাকা পাইবেন। রাজপ্রমুখের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র উপরাজপ্রমুখ তাঁহার কার্য্য করিবেন এবং ঐ সময়ের জন্য রাজপ্রমুখের ভাতা পাইবেন।

(৩) চুক্তিবদ্ধ শাসকদের বাৎসরিক ভাতা :

(১)	বাঁশবরা	১,২৬,০০০৲	(২)	বুন্দি	২,৮১,০০০৲
(৩)	ডুঙ্গরপুর	১,৯৮,০০০৲	(৪)	ঝালোয়ার	১,৩৬ ০০০৲
(৫)	কিষেণগড়	১,৩৬,০০০৲	(৬)	কোটা	৭,০০,০০০৲
(৭)	মেবার	১০,০০,০০০৲	(৮)	প্রতাপগড়	১,০২,০০০৲
(৯)	শাহপুরা	৯০,০০০৲	(১০)	টঙ্ক	২,৭৮,০০০৲

(৪) অনধিক ৪৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠিত হইবে এবং রাজপ্রমুখ বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে অনধিক আর ৬ জন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। সদস্যপদ

প্রার্থী এবং ভোটারের যোগ্যতা যুক্তপ্রদেশের আইন পরিষদের নির্ব্বাচনে যেরূপ আছে তদনুরূপ হইবে—তবে প্রয়োজনবোধে উহা সংশোধন করাও চলিবে।

(৫) ১লা মে'র (১৯৪৮) পূর্ব্বে রাজপ্রমুখের হস্তে চুক্তিবদ্ধ শাসকদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে।

---

(৭) মধ্য-ভারত যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি :

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত এই যুক্তরাজ্য গঠনের চুক্তি অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটিভাবে অন্যান্য যুক্তরাজ্যের অনুরূপ :—

(১) চুক্তিবদ্ধ স্যালুট ষ্টেটের শাসক, কুরবাইর শাসক এবং কুরবাই ব্যতীত চুক্তিবদ্ধ নন-স্যালুট ষ্টেটের শাসকদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত একজন শাসক লইয়া রাজন্য-পরিষদ গঠিত হইবে। রাজন্য-পরিষদ একজন সভাপতি, একজন সিনিয়র সহকারী সভাপতি এবং দুইজন জুনিয়র সহ-সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। জুনিয়র সহ-সভাপতির নির্ব্বাচনে চুক্তিবদ্ধ প্রধান রাজ্যের শাসকগণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই নির্ব্বাচনে গত লোকগণনা অনুসারে যে রাজ্যে যত লক্ষ অধিবাসী (অর্দ্ধ লক্ষের বেশী সংখ্যা একলক্ষ বলিয়া গৃহীত হইবে) সেই রাজ্যের শাসকের ততটি ভোট থাকিবে। ন্যূনপক্ষে সকলেরই অন্ততঃ একটি ভোট থাকিবে। রাজপ্রমুখ বাৎসরিক ২,৫০,০০০৲ এবং সিনিয়র উপ-রাজপ্রমুখ ২,৫০,০০০ টাকা ভাতা পাইবেন। জুনিয়র সহ-সভাপতিদ্বয়ের ভাতা রাজপ্রমুখ স্থির করিবেন। রাজপ্রমুখের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র উপ-রাজপ্রমুখ তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন।

(২) যুক্তরাজ্যের আইন সভায় কোনরূপ আইন প্রণীত না হওয়া পর্য্যন্ত জায়গীরের উত্তরাধিকার প্রভৃতি স্থির করার ভার একমাত্র রাজপ্রমুখের থাকিবে। ১লা জুলাই'র (১৯৪৮) পূর্ব্বে চুক্তিবদ্ধ শাসকদের রাজপ্রমুখের হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে।

(৩) রাজপ্রমুখকে চতুর্থ তপশীলে বর্ণিত পদ্ধতিতে ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্টের পূর্ব্বে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন আইন পরিষদ গঠন করিতে হইবে। শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠিত হইলে এই আইন সভা বাতিল হইয়া যাইবে এবং উহা আইন পরিষদের কার্য্য করিবে। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজপ্রমুখ অনধিক ছয় মাসের জন্য অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। তবে অন্তর্ব্বর্ত্তী আইন সভা কিম্বা আইন সভা রূপী শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ এইরূপ অর্ডিন্যান্স আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিম্বা বাতিল করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) চুক্তির মধ্যে রাজন্যবর্গের ভাতা নির্দ্দিষ্ট নাই—কেবল গোয়ালিয়রের ভাতা ২৫,০০,০০০৲ এবং ইন্দোরের রাজার ভাতা ১৫,০০,০০০৲ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

(৫) অনধিক ৭৫ জন নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ গঠিত হইবে। প্রত্যেকটি চুক্তিবদ্ধ স্যালুট ষ্টেট এবং কুরবাইর অন্ততঃ একজন সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিতে হইবে। পরিষদ উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করিতে পারিবেন। তাঁহারা আলোচনায় অংশ গ্রহণের অধিকারী হইলেও ভোট দিতে পারিবেন না। সদস্যপদপ্রার্থী এবং ভোটারের যোগ্যতা যুক্তপ্রদেশের আইন পরিষদের নির্ব্বাচনে অনুসৃত যোগ্যতার অনুরূপ হইবে (প্রয়োজন অনুসারে উহা সংশোধন করিয়া লওয়া হইবে)।

(৪) গোয়ালিয়রের আইন পরিষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৪০ জন সদস্য, ইন্দোরের আইন সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ২৫ জন সদস্য এবং ভারত সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর ব্যতীত অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ রাজ্য হইতে গঠিত নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিশজন সদস্য লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী আইন পরিষদ গঠিত হইবে। একক পরিবর্ত্তনযোগ্য ভোটে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে এই নির্ব্বাচন হইবে।

(৮) পাতিয়ালা ও পূর্ব্বপাঞ্জাব ষ্টেটস্ ইউনিয়ন গঠনের চুক্তি ঃ

নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত এই ইউনিয়ন গঠনের চুক্তিসর্ত্ত অন্যান্য বিষয়ে অপরাপর ইউনিয়ন গঠনের অনুরূপ :—

(১) শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ ইউনিয়নের নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে।

(২) চুক্তিবদ্ধ স্যালুট ষ্টেটের শাসক এবং নন-স্যালুট ষ্টেটের একজন শাসক লইয়া রাজন্য-পরিষদ গঠিত হইবে। চুক্তিবদ্ধ দুইটি নন-স্যালুট ষ্টেটের শাসক পালাক্রমে ৫ বৎসরের জন্য রাজন্য-পরিষদের সদস্য হইবেন। রাজন্য-পরিষদ চুক্তিসর্ত্ত দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা এবং ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র অপর কোন কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিলে তাহাও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) রাজপ্রমুখ ও সহ-সভাপতি নির্ব্বাচনে যে রাজ্যের জনসংখ্যা গত আদমশুমারী অনুসারে যত লক্ষ তাহার ততটি ভোট থাকিবে (অর্দ্ধলক্ষের বেশী জনসংখ্যা লক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে)। তবে প্রত্যেক

সদস্যেরই অন্ততঃ একটি ভোট থাকিবে। রাজপ্রমুখের ভাতা ভারত সরকার স্থির করিয়া দিবেন। চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের শাসকদের ১৯৪৮ সালের ২০শে আগষ্টের পূর্ব্বে রাজপ্রমুখের হস্তে অবশ্যই রাজ্য শাসনের ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে।

(৪) রাজপ্রমুখকে ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ৩০শে আগষ্টের (১৯৪৮) পূর্ব্বে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ষষ্ঠ ধারা অনুযায়ী এক যোগদানের সর্ত্তপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং এই সর্ত্ত-পত্রে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ডোমিনিয়ন আইন সভা ইউনিয়ন সম্পর্কে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সপ্তম্ তপশীলের প্রথম ও তৃতীয় তালিকা অনুসারে (ট্যাক্স ধার্য্য করা বাদে) ইউনিয়নের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৫) শাসকদের ভাতা স্থির করিতে গিয়া যদি দেখা যায় যে পাতিয়ালার শাসকের বাৎসরিক ভাতা দশ লক্ষের বেশী হইতেছে তবে উহা বর্ত্তমান শাসকই পাইবেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের জন্য পরে ব্যবস্থা করা হইবে। অন্যান্যের ভাতা সম্পর্কে চুক্তিতে কোন উল্লেখ নাই।

(৬) শাসনতন্ত্র রচয়িতা পরিষদ প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় এক জন প্রতিনিধি এই ভিত্তিতে গঠিত হইবে। তবে প্রত্যেকটি চুক্তিবদ্ধ রাজ্য যাহাতে অন্ততঃ একজন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিষদ গঠনের পদ্ধতি ভারত সরকারের সহিত আলোচনাক্রমে রাজপ্রমুখ স্থির করিবেন। পরিষদ বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা কো-অপ্ট করিতে পারিবে। তাহারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু ভোট দিবার অধিকারী হইবেন না।

(৯) যুক্তরাজ্যের পক্ষে ডোমিনিয়নে যোগদানের নূতন সর্ত্তপত্র :

যেহেতু ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে নিষ্পন্ন যোগদানের সর্ত্তপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তপশীলে উল্লেখিত রাজ্যের শাসকগণ ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিয়াছেন ;

এবং যেহেতু ১৯৪৮ সালের········মাসে নিষ্পন্ন চুক্তি অনুসারে উক্ত শাসকবর্গ ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যকে········যুক্তরাজ্য নামে একটি রাষ্ট্রাংশে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে সম্মত হইয়াছেন ;

এবং যেহেতু ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে শাসকগণ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন সর্ত্তপত্রের পরিবর্ত্তে যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে উহার স্থানে নূতন এক যোগদানের সর্ত্তপত্র নিষ্পন্ন করা সমীচীন ; এবং ডোমিনিয়ন আইন সভা যাহাতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সপ্তম তপশীলের প্রথম ও তৃতীয় তালিকা অনুসারে কর ধার্য্যকরণ সংক্রান্ত বিষয় বাদে যুক্তরাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারেন এই সর্ত্তপত্রে তাহা মানিয়া লওয়া আবশ্যক ;

সেইহেতু, এক্ষণে আমি············(রাজপ্রমুখের নাম)········· (যুক্তরাজ্যের নাম) রাজপ্রমুখ হিসাবে এতদ্দ্বারা যুক্তরাজ্যের পক্ষ হইতে এই যোগদানের সর্ত্তপত্র নিষ্পন্ন করিতেছি এবং

(১) আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিতেছি এবং ভারতের বড়লাট, ডোমিনিয়ন আইন সভা, ফেডারেল কোর্ট এবং ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অপর যে কোন ডোমিনিয়ন কর্ত্তৃপক্ষ এই সর্ত্তপত্র অনুযায়ী কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় ইহার সর্ত্ত অনুসারে এবং একমাত্র

ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতীয় ডোমিনিয়নে যখন যেরূপ ভাবে বলবৎ থাকিবে তদনুযায়ী যুক্তরাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধানসমূহ যুক্তরাজ্যে যাহাতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয় (অবশ্য যোগদানের সর্ত্তপত্র অনুযায়ী উহা যতটা প্রযোজ্য) আমি তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।

(৩) আমি মানিয়া লইতেছি যে ডোমিনিয়ন আইন সভা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সপ্তম তপশীলের প্রথম ও তৃতীয় তালিকায় উল্লেখিত সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যুক্তরাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

তবে ঐ তালিকাদ্বয়ে কিম্বা ঐ আইনের অপর কোন বিধানে উল্লেখিত কোন বিষয়ের জন্য ডোমিনিয়ন আইন সভা যুক্তরাজ্যে কোন ট্যাক্স বা কর। ধার্য্য করিতে পারিবেন না কিম্বা যুক্তরাজ্যের আইন সভা কোন কর ধার্য্য করিলে তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না।

অধিকন্তু, তৃতীয় তালিকায় উল্লেখিত কোন বিষয়ে যুক্তরাজ্যের কোন আইনে যদি এরূপ বিধান থাকে যাহা ডোমিনিয়নের পূর্ব্বেকার কোন আইনের বিধানের পরিপন্থী কিম্বা উহার মধ্যে যদি বর্ত্তমান সময়ের কোন আইনের বিরোধী কিছু থাকে তাহা হইলে যুক্তরাজ্যের আইন গবর্ণর জেনারেলের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইয়া যদি তাঁহার অনুমোদন লাভ করে সেক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের আইনই যুক্তরাজ্যে বলবৎ হইবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও ডোমিনিয়ন আইনসভা একই বিষয়ে আরও আইন পাশ করিতে পারিবেন।

বড়লাটের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত যুক্তরাজ্যের কোন আইন তাঁহার অনুমোদন লাভ করিলে ঐ আইনের কোন বিধানের

বিরোধী কোন বিল বা সংশোধন প্রস্তাব বড়লাটের অনুমোদন ব্যতীত ডোমিনিয়ন আইন সভায় উত্থাপন করা চলিবে না।

(৪) আমি এই প্রতিশ্রুতির উপর ডোমিনিয়নে যোগদান করিতেছি যে, বড়লাট এবং যুক্তরাজ্যের রাজপ্রমুখের মধ্যে কোন চুক্তির ফলে ডোমিনিয়ন আইন সভার কোন আইনের বিধান যুক্তরাজ্যে কার্য্যকরী করার দায়িত্ব যদি রাজপ্রমুখের উপর প্রদত্ত হয় তবে ঐ চুক্তি এই সর্ত্তপত্রের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, জল সরবরাহে হস্তক্ষেপ করা সম্পর্কে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ষষ্ঠ অংশের (Part VI) বিধানসমূহ যুক্তরাজ্যে প্রযোজ্য হইবে।

(৬) এই সর্ত্তপত্রের বিধানসমূহ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কিম্বা ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেনস্ এ্যাক্টের কোন সংশোধন দ্বারা পরিবর্ত্তন করা চলিবে না যদি ঐ সংশোধন যুক্তরাজ্যের রাজপ্রমুখ এই সর্ত্তপত্রের এক ক্রোড়পত্রে অনুমোদন না করেন।

(৭) এই সর্ত্তপত্রের কোন কিছুর দরুণ ডোমিনিয়ন আইন সভা যুক্তরাজ্যে কোন কারণে বাধ্যতামূলকভাবে জমি দখলের অধিকার দিয়া আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ডোমিনিয়নের কোন আইনের জন্য যদি জমি দখল করা প্রয়োজন হয় তবে ডোমিনিয়ন আইন সভার অনুরোধক্রমে এবং তাহাদের ব্যয়ে রাজপ্রমুখ প্রয়োজনীয় জমি দখল করিয়া দিবেন; আর ঐ জমি যদি যুক্তরাজ্যের খাসদখলে থাকে তবে উহা চুক্তিমতে হস্তান্তরিত করা হইবে। চুক্তি যদি সম্ভব না হয় তবে হস্তান্তরের সর্ত্ত ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক মনোনীত একজন সালিশ স্থির করিয়া দিবেন।

(৮) এই সর্ত্তপত্রের কোন কিছুর দরুণ বুঝাইবে না যে—যুক্তরাজ্য ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতেছে; কিম্বা ইহা দ্বারা

যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট ভাবী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত ভারত সরকারের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করা-না-করার স্বাধীনতাচ্যুত হইবেন না।

(৯) সর্ত্তপত্রের বিধান ব্যতীত ইহা দ্বারা রাজপ্রমুখের কোন ক্ষমতা, অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব, কিম্বা যুক্তরাজ্যে অথবা উহার কোন অংশে বলবৎ কোন আইন কোনরূপে প্রভাবিত হইবে না।

(১০) তপশীলে উল্লেখিত রাজ্যের শাসকগণ ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে যোগদানের যে সর্ত্তপত্র স্বাক্ষর করেন তাহা এতদ্দ্বারা এখন হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

[এই সর্ত্তপত্রের তপশীলে যুক্তরাজ্যে অন্তর্নিবিষ্ট সমস্ত রাজ্যের নাম সন্নিবিষ্ট থাকিবে]

—